সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রয়াত তৃপ্তি মিত্র স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার সর্বোত্তমা অভিনেত্রী হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে আরও নানারকম 'হয়ে-ওঠার' একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল তা তাঁর প্রবন্ধ, ছোটগল্প বা এই নাটকগুলি পড়লে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বস্তুতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শিক্ষিত নাগরিক বাঙালি মেয়েদের একটি অংশ তাঁদের ওই প্রথাগত দাঁড়ের ময়না হয়ে থাকার ভূমিকা বর্জন করতে চেয়েছে। রেনেসাঁসের দূরবিচ্ছুরিত আলোক তাঁদের এসে ছুঁয়েছিল, উদ্দীপিত করেছিল পুরুষশাসিত সমাজ-সংগঠন ও নিয়ন্ত্রণের খাঁচা ভেঙে বেরিয়ে এসে নিজের একটি পৃথক ব্যক্তিত্ব, একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি খুঁজে নিতে। এ কাজে যে শুধু স্বর্ণকুমারী দেবী বা কামিনী রায়ের মতো উচ্চবিত্ত ও সম্ভ্রান্ত মহিলাদের এগিয়ে আসতে দেখি তা নয়, অভিনেত্রী বিনোদিনী বা তারাসুন্দরীও আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কবিতায় বা জীবনবৃত্তান্তে। এ থেকে বুঝতে পারি, তাঁদের মনুষ্যত্বের সম্ভাব্য বিস্তারকে প্রতিহত রাখবার চেষ্টাগুলি অন্তত আংশিকভাবে বিকল হতে আরম্ভ করেছে! এই চেষ্টার সবই যে স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ, পীড়নমূলক ছিল তা নয়। তা কখনও এসেছে সামাজিক উন্নাসিকতার চেহারা নিয়ে, কখনও দেখা দিয়েছে অসচেতন উদাসীনতার রূপ ধরে! কিন্তু এইসব মনস্তাত্ত্বিক প্রাচীর ভেঙে অনেকেই বেরিয়ে আসতে পেরেছিলেন ; এই দেয়ালগুলি ভাঙতেই অবশ্য অনেকটা শক্তি ও উদ্যম ক্ষয় হয়েছিল তাঁদের, অনেকেই যথাযথ প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের সময় পাননি, ফলে তাঁদের রচনা অনেক সময় যেখানে পৌঁছোতে পারত সেখানে পৌঁছোয়নি। ফলে সাহিত্যসমালোচনার বাঁধা মানদণ্ডে তাঁদের রচনার বিচার করলে তাঁদের প্রতি অন্যায় করা হবে। কিন্তু এমন অনেক সময়ই ঘটে যে, এই অবিচারের সম্ভাবনা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে তাঁদের সৃষ্টি আমাদের সামনে একটি আলাদা সজীবতা নিয়ে শোরগোল তৈরি করে, যেমন হয়েছে বিনোদিনীর 'আমার জীবন'এর ক্ষেত্রে। তখন তাঁদের ভুলে থাকবার উপায় থাকে না!

এই শতাব্দীতে নাগরিকতা অনেক বিস্তারিত হয়েছে, ভারতবর্ষের জীবনে রেনেসাঁসের উদ্ভাস ছড়িয়ে গেছে তার সঙ্গে সঙ্গে। নাগরিকতার বাইরে যে বৃহৎ অন্ধকারময় ভূমি পড়ে ছিল তার কথা আপাতত না তুলেও বলা যায় যে, শুধু রেনেসাঁস নয়, পরপর দুটি মহাযুদ্ধ, অর্থনৈতিক মন্দা, দুর্ভিক্ষ, জাতীয় মুক্তির জন্য কিংবা পীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য আন্দোলন ইত্যাদি এসে মেয়েদের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ইত্যাদি নানা ভূমিকার আরও খানিকটা বিস্তার ঘটিয়েছে। তৃপ্তি মিত্র এখান থেকেই তাঁর যাত্রা শুরু করেন। এ-আর-পি-র চাকরি থেকে অভিনয়ে এসে পড়া, অভিনয়ে অত্যুজ্জ্বল বিভা সৃষ্টির পর নাট্যনির্দেশনা, নাট্যবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, গল্প ও নিবন্ধ রচনা, নাটক রচনা, নাট্যরূপ দান—নাটক সংক্রান্ত এবং নাট্যাতিরিক্ত এইসব বিচিত্র কর্মের মধ্যে তিনি নিজেকে স্ফূর্ত করতে পেরে-

ছিলেন। এমন হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, অভিনয়ের ক্ষেত্রটাই তাঁর সবচেয়ে বেশি ব্যাপ্ত ও প্রতিষ্ঠিত, সেখানেই প্রতিটি আবির্ভাবে তিনি তাঁর আগের গরিমাকে অতিক্রম করে গেছেন, তার ফলে তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির এলাকাগুলি আমাদের চোখের আড়ালে থেকে গেছে খানিকটা।

এখন সাধারণের দৃষ্টির পরিধি থেকে অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র অন্তর্হিত, নির্দেশক তৃপ্তি মিত্রও প্রায় অন্তরালে। ভিডিয়ো ফিল্মে তাঁর দুধরনের কাজেরই ছিটেফোঁটা রক্ষিত হয়েছে মাত্র—তা তো সকলের দেখার সুযোগ নেই। আমাদের জন্য রয়ে গেছে তাঁর লেখাগুলি—অগ্রন্থিত একাধিক প্রবন্ধ, একটি গল্পের বই এবং এই সংকলনের ছোট বড় মিলিয়ে ছটি নাটক। নাটকগুলির মধ্য দিয়ে তৃপ্তি মিত্রের নাট্যবোধের ক্রমপরিণতির ধারাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যিনি অভিনয় ও নাট্যকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তাঁর লেখা নাটক সাধারণ নাট্যকারের নাটকের থেকে সবচেয়ে বেশি করে আলাদা হয়ে যায় দুটি জায়গায়—নাটকের সংগঠিত ঘটনাবিন্যাসে আর সংলাপে। এই ধরনের নাট্য-কর্মীরা নাটক লেখার সময় পুরো নাটকটার একটা অভিনীত চেহারা মনের সামনে দাঁড় করান, ফলে কোথায় তার গতি শ্লথ হয়ে পড়ছে, কোথায় অবান্তর ঘটনা শূন্যে ঝুলে থাকছে, কোথায় বাগ্‌বিস্তার নাটককে থামিয়ে রাখছে—এ সবই তাঁদের চোখে পড়ে। তাঁদের নাটক লেখা একই সঙ্গে রচনা ও সম্পাদনা—নাট্যনির্দেশকের কাটছাঁট করার কাজটিও তাঁরা লেখার সঙ্গে সঙ্গেই সেরে ফ্যালেন। ফলে তাঁদের নাটক, আর যাই হোক, চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায় না কোথাও।

তৃপ্তি মিত্রের সবগুলি নাটকেই এই অবিশ্রান্ত গতির উত্তেজনা লক্ষ্য করি আমরা। প্রথমে 'বলি' নামক একাঙ্কটির কথাই ধরা যাক। এখানে নাটকটি যেভাবে শুরু হচ্ছে তাতেই নাট্যচেতনার চমৎকার দখল বেরিয়ে আসে—মফশ্‌শল শহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী অস্থিরভাবে পায়চারি করছে, স্বামীর খেতে আসার সময় নেই, থানার হাজত থেকে এক 'চাষা খ্যাপানে ভদ্দরনোক' খুনী পালিয়ে গেছে, তাই নিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তার কেরিয়ারে এক দারুণ সংকটের সামনে এসে পৌঁছেছেন। ক্রমে এই উন্মোচনটুকু ঘটে, হয়তো খানিকটা ব্যবহৃত প্রথা মেনেই ঘটে যে, পলাতক আসামী ডেপুটিসাহেবের স্ত্রীর প্রাক্তন প্রেমিক, প্রায় আকস্মিক একটি দুর্যোগে তাঁদের বিয়ে হয়নি, এবং সে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কোয়ার্টারটাই সবচেয়ে নিরাপদ ভেবে পালিয়ে সেখানে এসে হাজির হয়। বলা বাহুল্য, আহত অতীত এবং বিভ্রান্ত বর্তমানের যে সাক্ষাৎকার ঘটে তা যথেষ্ট নাটকীয়, শেষ পর্যন্ত নায়িকার আত্মঘাতনে সে নাটকের চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে।

কিন্তু তৃপ্তি মিত্র নাটকের মানুষ ছিলেন বলেই শুধু ওই মৃত্যুর মধ্যে নাটক শেষ করেন না। তারপরেও স্বামী আর প্রেমিককে মুখোমুখি বসান, আর একটা প্রস্তুয়মান নাটকের মধ্যে আমাদের ছেড়ে দেন, কিন্তু সে নাটক শেষ করেন না। এইখানেই নাট্যকাহিনী তার মামুলি কাঠামো অতিক্রম করে যায়।

পরবর্তী নাটিকা 'ইঁদুর' থেকে তৃপ্তি মিত্রের প্রিয় একটি বিষয় ক্রমশ ফুটে ওঠে,—'ঘটনাচক্র বা মানবিক অবিচারের শিকার হিসেবে নারী'—এই বিষয়টি। 'বলি'-তে ঊর্মিলা অতীত-বর্তমানকে মেলাতে পারেনি বলে আত্মহনন বেছে নিয়েছিল, কিন্তু 'ইঁদুর'-এ শিবানী লড়াই করেছে। জাঁতাকলে পড়া ইঁদুরেরই মতো তাকে নখদন্ত দিয়ে বাঁচবার জন্য লড়াই করতে হয়েছে, —এ লড়াইয়ে কোনো সৌজন্য বা শৃঙ্খলার বালাই নেই, এ লড়াই মৃত্যুর গভীর খাদের কিনারা থেকে ফিরে আসবার লড়াই। এই যুদ্ধে শিবানী জিতেছে। অন্তত হারানো ভালোবাসাকে সে পুনরুজ্জীবিত করেছে একটি মানুষের মধ্যে, তাতেই সে অনিশ্চিত ভবিষ্যের পথে একলা চলার পাথেয় পেয়েছে।

এ নাটকটিও তীব্রগতিসম্পন্ন, প্রায় শ্বাসরোধকর পরম্পরায় টেনশন তৈরি করে যান রচয়িত্রী। তারই মধ্য দিয়ে তাঁর বিশদ মানবিক মমতা প্রকাশিত হয় বস্তিবাসী হালিম আর খালেক চরিত্রের নির্মাণে—তিনি খুব সার্থকভাবেই এটা বুঝিয়ে দেন যে, যাকে আমরা আজকাল 'সাম্প্রদায়িকতা' বলি তার আদি উৎস তথাকথিত 'ভদ্রলোকদের' ভণ্ডামি। এই সংলাপগুলি যেমন বাস্তব, তেমনই তাৎপর্যময়—

১ম ভদ্রলোক—(বস্তিবাসীদের)...আর তোরাই বা কি? মুসলমানদের সঙ্গে এক বস্তিতে থাকিস!

হরি — জায়গা কোথায় পাব বাবু?

২য় ভদ্র — তাই ব'লে এইসব পাকিস্তানীদের সঙ্গে!

হালিম — হাম পাকিস্তানী নেহী হ্যায় বাবুজী।

খালেক — বরং আমরা ব'লে দিইচি যে যাদের মন পাকিস্তানে পড়ে আছে, তারা সব চলে যাও পাকিস্তানে।

হালিম—হাঁ, ইহাঁ গড়বড় মত কর। হম হিন্দুস্তানী হ্যায় বাবুজী।

১ম ভদ্র — ওঃ, কথা আছে খুব।

২য় ভদ্র — ওইতেই চালাচ্ছে।

এই বিষয়টি নাটকের মূল প্রসঙ্গ নয়। তবু আমরা এই কথাগুলি তুলে আনছি, তার কারণ তৃপ্তি মিত্র দু'একটি ব্যক্তির নাটক তৈরি করতে গিয়ে, তার সাময়িক ও সামাজিক পরিমণ্ডলটির আভাসও তৈরি করে দ্যান, ফলে তাঁর নাটক, সংগতভাবেই, কেবল ব্যক্তির ঘটনা থাকে না আর—ব্যক্তি যে তার

পরিপার্শ্বের সঙ্গে জটিল ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সূত্রেই ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ায় তা তিনি বুঝিয়ে দিতে ভোলেন না।

পরবর্তী নাটক স্টাইনবেকের **of Mice and Men** উপন্যাসের বঙ্গীয় এবং নাট্যিক রূপ 'সুতরাং'-এ একটি পুরুষচরিত্রকে বাঙালি মেয়ে সুব্রতার চরিত্রে রূপান্তরের মধ্যে সংগ্রামী নারীত্বের প্রতি তাঁর মনোযোগ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁর নায়িকারা দীর্ঘদিন অন্যদের সিদ্ধান্তের দায় বহন করে, বিপর্যস্ত হয়, কিন্তু শেষ সিদ্ধান্ত নেয় তারা নিজেরা—মরবার সিদ্ধান্ত, মারবার সিদ্ধান্ত, বাঁচবার সিদ্ধান্ত। এই নাটকেও তৈরি হয়েছে অবিশ্রান্ত গতি, এবং এই নাটকেও পশ্চিম বাংলা ও কলকাতার তৎকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক আবহ, তার সন্ত্রাসের মধ্যে এবং লোভ কামনা ও ভয়ের টানাপোড়েনের মধ্যে আটকে পড়া একটি স্নেহময়ী দিদি এবং আর-একটি জড়বুদ্ধি ভাইয়ের জীবনকে অনুসরণ করেছেন তৃপ্তি মিত্র—একই সঙ্গে ইতিহাস ও আখ্যান রচনার দায় স্বীকার করে।

আমার কাছে অবশ্য পরের নাটক 'প্রহর শেষে' একেবারে উজ্জ্বলরূপে আলাদা হয়ে আসে। শুধু গঠনের দিক থেকে নয়, প্রজন্ম-বিচ্ছেদের এই কাহিনীর বিন্যাস ও বয়ন এমন নির্মম সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন তিনি যে, সমসময়ের উপর তা একটি তীব্র ধিক্কারের মতো আঘাত করে। ছেলেমেয়েদের প্রতিষ্ঠিত সচ্ছল সংসারে বৃদ্ধ বাপ-মার জায়গা হয় কেবল তাদের ব্যবহার-যোগ্যতার কারণে, সে ব্যবহারযোগ্যতা না থাকলে তাদের উৎখাত হতে হয়, প্রজন্মের সঙ্গে প্রজন্মের কোনো অচ্ছেদ্য বন্ধন নেই, আছে কেবল স্বার্থের শৃঙ্খল, আর যে প্রজন্ম অশক্ত, উপার্জনহীন ও অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়ল তাকে পরিত্যক্ত জীর্ণবস্ত্রের মতো ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে—এই ছবি সর্বাঙ্গীণ না হলেও অসত্য যে নয় তা আমরা সকলেই জানি। উপসংহারে উত্তরবঙ্গের কয়েকবছর আগেকার হঠাৎ-বন্যাকে চমৎকার ব্যবহার করেছেন তৃপ্তি মিত্র। বিজন ভট্টাচার্য 'নবান্ন' নাটকে ব্যবহার করেছিলেন মেদিনীপুরের প্লাবনকে, কিন্তু তা আকস্মিকতার গণ্ডী পেরিয়ে কোনো বড় নাট্যিক তাৎপর্য তৈরি করতে পারেনি। তৃপ্তি মিত্র বন্যার সেই নিয়তিসুলভ অমোঘতা তৈরি করে দিয়েছেন। এই নাটকে বুড়ো-বুড়ির চরিত্র প্রায় ট্র্যাজিক মহত্ত্বকে ছোঁয় , তার একটি বড় কারণ এই যে, চরিত্রদুটিকে প্রচলিত নাটকীয়তার ছকে ফেলে রচনা করেননি নাট্যরচয়িত্রী। তাদের আছে অসামান্য আত্মপরিহাসের ক্ষমতা, আছে স্থৈর্য ও জীবনে বাতিল হয়ে থাকা এক ধরনের মৃত্যুর ধাপ থেকে আসন্ন মৃত্যুকে গ্রহণ করার দুর্জয় মানসিক শান্তি। আমার মতে 'প্রহর শেষে' বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যে বিশেষ এক সম্মানের স্থান দাবি করতে পারে।

ষাটের শেষদিকের বছরগুলিতে লেখা 'কে বাঁচে ? কে ?' সে তুলনায় একটু

দুর্বল নাটক। তার অর্থ এই নয় যে, নাটকীয়তা তৈরিতে তৃপ্তি মিত্র ব্যর্থ, বরং সে ব্যাপারে তাঁর অনায়াস-পটুত্বের পরিচয় সবখানেই দেখতে পাই আমরা। এর দুর্বলতা হল একটু আবেগপ্রবণতার আতিশয্য, যাতে ছাত্রজীবনের দ্বন্দ্ব ও স্বার্থপরতার ছবিটি বড় বেশি একপেশে মনে হয়। তবু শ্রীশ চরিত্রটি তার ওই হিউমারের জন্য একটু আলাদা হয়ে যায়। কিন্তু এ নাটকেও আভাসিত হয় কিছু প্রাচীন অথচ চিরকালীন মূল্যবোধের ক্ষয় দেখে লেখিকার অন্তর্গত হাহাকার, যেমন আছে 'প্রহর শেষে' নাটকে। স্নেহ মমতা নিষ্ঠা সত্যবদ্ধতার প্রকোষ্ঠগুলি একে একে ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে—তারই ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি মিত্র একটির পর একটি নাটকে আমাদের প্রশ্নের পর প্রশ্নের আঘাত করছেন।

'বিদ্রোহিণী' ঐতিহাসিক নাটক, ঝাঁসির রানি এর নায়িকা। এই নাটক রচনাতেই তৃপ্তি মিত্রের নাট্যবোধ সবচেয়ে দুরূহ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়। ঝাঁসির রানির আখ্যানে আছে প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধের 'স্পেকটাকল'— উপন্যাসে ইতিহাসে কাব্যে ফিল্মে তা আখ্যানকে ঐশ্বর্য দেয়। কিন্তু ন্যারেশন থেকে অভিনীত নাটকে যখন সে আখ্যানকে আধারিত করবার কথা ওঠে, তখন প্রায় সব স্পেকটাকলই বাদ দিতে হয়, কারণ স্টেজে বৃহৎ যুদ্ধবিগ্রহ দেখানোর কোনো উপায়ই প্রায় নেই। ফলে নাট্যকারের হাতে থাকে শেষ পর্যন্ত কয়েকটি মানুষের ব্যক্তিগত নাটক এবং তারই জটিল বুনোট। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাইকে নায়িকা হিসেবে বেছে নেওয়ার মধ্যে নিশ্চয়ই সংগ্রামী নারীত্ব সম্বন্ধে একটি আদর্শবোধ কাজ করেছে তৃপ্তি মিত্রের মধ্যে। অবশ্য একথা বলতে গিয়ে আমরা এমন বলি না যে, নারীত্বের একটি শ্রদ্ধেয় আদল তৈরি করতে গিয়ে তিনি চতুষ্পার্শ্বের বাস্তবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তাঁর নাটকে কুটিল স্বার্থপর আর মিথ্যাচারিনী নারীচরিত্রের অভাব নেই— 'ইঁদুর'-এ ডাক্তারের মা, 'প্রহর শেষে'-তে বুড়ো-বুড়ির ছেলের বউ আর মেয়ে, কিংবা 'কে বাঁচে কে?'-তে 'শকুন্তলা' তার দৃষ্টান্ত। এই টাইপগুলি কখনোই শিবানী ('ইঁদুর') বা বুড়ো-বুড়ির ('প্রহর শেষে') জটিলতা পায় না, কিন্তু এগুলি থেকেই বুঝতে পারি যে, নারীত্বের সংগ্রামী কাঠামোর সন্ধান করতে গিয়ে তিনি দৈনন্দিত প্রত্যক্ষতাকে কখনোই অস্বীকার করেন না।

ঝাঁসির রানির বীর্যবত্তার রূপটি তৃপ্তি মিত্র যেমন স্বচ্ছন্দে অ-নাটকীয় সংযমে গড়ে তোলেন তা থেকে নাটক নামক মিডিয়ামটির ওপর তাঁর দখল খুবই উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়। আর এই নাটকেই দেখতে পাই, কী চমৎকার আত্মবিশ্বাস নিয়েই না তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল—ভূপেন বন্দ্যোপাধ্যায়—শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—মন্মথ রায়-এর ধারাটিকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। সংলাপে অযথা বাগাড়ম্বর নেই, কল্পনাময় কাব্যিকতার অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস নেই, আছে কথ্য সংলাপভঙ্গির সহজ নাট্যনির্মাণ—

রানী—আরও একটা দিন কেটে গেল। সারা হিন্দুস্থান আজ অস্থির। কেউ জানে না কাল কী হবে? সিপাহীরা জানে না কাল কী হবে! ইংরেজ জানে না কাল কী হবে! আমি, আমিও জানি না কাল কী হবে! —আট বছরের মেয়ে এসেছিলাম বিঠুর থেকে ঝাঁসি। সামান্য পুরোহিতের মেয়ে রানী হবে! কত দিনের কথা! একদিন বিঠুরে নানাসাহেব হাতিতে করে যাচ্ছিলেন। আঠাশ উনত্রিশ বছরের যুবক। আমি ছোট্ট মেয়ে আব্দার ধরলাম 'আমিও চড়ব'। নানাজি বললেন—'যা যা, পুরুতের মেয়েকে আর হাতি চড়তে হয় না।' রেগে সেদিন বলেছিলাম, 'কপালে থাকে দশটা হাতি চড়ব।' রাণী হলাম, হাতি ঘোড়া তাঞ্জাম কত কী চাপলাম, হাঃ! নানা ধুন্দুপন্থ। আমাদের দুজনেরই গর্ব চূর্ণ হয়েছে। তুমিও পেশওয়া হতে পারনি, আজ আমিও আর রানী নই! দাবা খেলছে ইংরেজ। আমরা কেবল দাবার ঘুঁটি!—ও আমার ভাগ্যদেবী, বল তো ইংরেজ থাকবে না যাবে? আমার এ পথ কোথায় গিয়ে শেষ হবে? কোথায়?

ছোট ছোট বাক্যের এই সংলাপ বাংলা ঐতিহাসিক নাটকের বাঁধা ছককে কত সহজে উপহাস করে নতুন এক নাট্যিকতার সৃষ্টি করে, তা বিস্মিত হয়ে লক্ষ করবার মতো।

আমাদের দুঃখ, এইসব নাটক যাঁর রচনা, তিনি আরও কেন রইলেন না আমাদের মধ্যে, কেন আরও লিখলেন না নাটক। নাটকের আয়ুধ তাঁর হাতে ক্রমশই শাণিত হয়ে উঠছিল।

পবিত্র সরকার

বলি

নাটক সমগ্র—১

॥ চরিত্রলিপি ॥

স্ত্রী

কাজের লোক (কালোর মা)

স্বামী

সাহা

লোক (সত্য)

[মফঃস্বল শহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ড্রয়িং রুম। ডানদিক দিয়ে বাইরে যাবার আর বাঁদিক দিয়ে ভেতরে যাবার রাস্তা। পেছনের দেওয়ালে দরজা আছে। সেটা আর একটা ঘরের ইঙ্গিত দেয়। ঘরের মধ্যে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী কমলা অথবা ঊর্মিলা অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। বাইরে থেকে বেয়ারার সাড়া পাওয়া গেল।]

স্ত্রী—ভেতরে এস। কি? কি বললেন?

বেয়ারা—আসছেন। বললেন খাবার যদি বিলকুল রেডি থাকে তাহলে একটু খেতে পারেন।

স্ত্রী—যাও তুমি, বল গিয়ে খাবার তৈরীই আছে [টেবিলের উপর রাখা একটা ঘণ্টা বাজায়—একজন বর্ষীয়সী ঝি ঢোকে] কালোর মা, ঠাকুরকে বল মাংস গরম করতে, আর ঘি গরম রাখুক, সাহেব এলেই যেন লুচি ভাজতে শুরু করে।

ঝি—যাই। তা খবর কিছু পেলে?

স্ত্রী—কই আর! তুমিও যেখানে আমিও সেখানে। ভেবে পাই না, হাজত থেকে পালায় কি করে লোকটা। যত সব ইডিয়ট।

ঝি—ইসমাইল বেয়ারা বলতেছিল ও নাকি চাষা খ্যাপানে ভদ্দর নোক। আগে যেমন সব সেই স্বদেশী ডাকাত হোত না, সেইরকম। কোন্ জমিদারের নায়েবকে নাকি খুনও করেছে!

স্ত্রী—তাই নাকি? তা ওরা সব পারে। নিজের চেয়ে বড় ওদের কাছে কিছু নেই। স্বার্থপর!

ঝি—না না! যে দুধওয়ালাটা বিক্যালে দুধ দেয় না, সে বলতেছিল নোক নাকি ভাল। গরীবির দিকি খুব টান। সেই আগে যেমন ছ্যাল না? বলতেছিল—

স্ত্রী—থামো! দুধওয়ালা ত সব জানে। আমার আর জানতে কিছু বাকী নেই। [বাইরে একটু দূরে কথার আওয়াজ পাওয়া যায়। স্ত্রী দরজার কাছে গিয়ে দেখে] উনি বাগানের গেটের কাছে এসে পড়েছেন। শীগ্‌গীর যাও। ঠাকুরকে বল এখুনি সব রেডী করতে। আর শোন, দেরি দেখলে ঠাকুরের সঙ্গে একটু হাত দিও—

ঝি—সে আর তোমাকে বলতে হবে না। [বেরিয়ে যায়। বাইরে থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঢোকেন, এই মহিলার স্বামী। ঢুকতে ঢুকতে মাথা থেকে হ্যাট্‌টা খোলেন, স্ত্রী হাত থেকে হ্যাট্‌টা নেয়।]

স্ত্রী—বোস। দেরি হবে না, এখুনি খাবার আনছে। কি, কোন হদিস পাওয়া গেল?

স্বামী—এতই সোজা! ওরা সব ঘাগী লোক। একবার যখন বেরুতে পেরেছে, ও কি সহজে ধরা দেবে?

স্ত্রী—হ্যাঁ। শুনলাম, লোকটা নাকি পলিটিক্যাল?

স্বামী—হ্যাঁ। ও, ঐ ছোট দারোগাটাকে যদি না আমি—

স্ত্রী—ও তাই বল, ওনারই কীর্তি।

স্বামী—ইডিয়ট, ঐ রকম একটা আসামীকে ঐ রকম একটা ঘরে রাখে!

স্ত্রী—ঠিক হয়েছে। ওকে কত প্রশ্রয় তুমি দিয়েছ। ঠিক শোধ দিয়েছে তার।

স্বামী—আমি কিন্তু পনের মিনিটের বেশী সময় দিতে পারব না। খাবার যদি দেবার হয়ত দাও, নয়ত—

স্ত্রী—কি আশ্চর্য, এই এলো বলে। কালোর মা, তাড়াতাড়ি আনো না। [স্বামীর কাছে একটু হেসে] রাগ করলে? কিন্তু সত্যি বল, তুমি ভালোমানুষ বলেই না ওরা ঐরকম করতে সাহস করে।

স্বামী—কিন্তু আমাকে ঠিক চিনতে পারেনি। ভালোমানুষ! এবারে ওকে আমি—

স্ত্রী—আমার ত মনে হয়, একটা স্ট্রং স্টেপ নেওয়া উচিত। তা পালিয়েছে কখন?

স্বামী—ওকে কি বলে পালিয়েছে?

স্ত্রী—না তা নয়, ও যদি সত্যি ও রকম সাংঘাতিক লোক হয়, তবে সংগে সংগে ত তোমাকে জানান উচিত ছিল।

স্বামী—ছিলই তো! সেইটেই তো হয়েছে ওর মারাত্মক অপরাধ! ওই রকম একটা ধড়িবাজ পলিটিক্যাল লিডার—ওকে যদি ধরতে না পারি তাহ'লে আমার অবস্থাটা কি হবে ভাবতে পারো? একে তো সেই চিদাম্বরম্, আমাদের ডি. এম, নলখাড়ীর ব্যাপারটা নিয়ে বারে বারে নোট পাঠাচ্ছে। শেষের নোটটায় লিখেছে যে চেষ্টা থাকলে যে রিং লিডারগুলোকে ধরা যায় না তা নাকি তিনি বিশ্বাসই করেন না। এখন যদি শুনতে পায়—আর পাবেই—যে হাজত থেকে পালিয়েছে তাহলে? ওঃ, ওই সাহাটাকে—তুই তো জানতিস ওর রেকর্ড, বর্ন ক্রিমিন্যাল-এর মতন বর্ন পলিটিক্যাল! এখন আমাকে ন্যাকার মত সব বলছে। এখন বলে কি হবে? তুই যদি এতই জানতিস তাহলে সাধারণ হাজতে রাখতে গেলি কেন? আর রাখলিই যদি কনস্টেবলটাকে ভালো করে সাবধান করে দিলি না কেন?

স্ত্রী—তোমার কিন্তু ওকে আর একটুও দয়া করা উচিত নয়।

স্বামী—দয়া! দয়ার কথা উঠছে কিসে?

স্ত্রী—এখন বলছ বটে, কিন্তু লোকটা সামনে এলে—একটু কাঁদলে ঠিক গলে যাবে।

স্বামী—আচ্ছা তুমি দেখে নিও, আমাকে যতটা দুর্বল তুমি মনে কর ঠিক ততটা দুর্বল আমি নই।

স্ত্রী—দুর্বল তো নও ; তুমি যে ভালোমানুষ—

স্বামী—ঠাট্টা করছ! কিন্তু আমি যেভাবে ওদের কেসটা সাজিয়েছি না! ঘর জ্বালান, নরহত্যা, লুঠ, দাঙ্গা সবগুলো চার্জ একসঙ্গে এবং এমন সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ হয়েছে যাতে এ্যাট লিস্ট এই পালের গোদাটাকে ফাঁসিতে লটকান যায়।

স্ত্রী—ওকি সত্যিই খুন করেছে না কি?

স্বামী—না, তা বোধহয় নয়। এক কালে টেররিস্ট ছিল তো! তখন এত সব করেছে যে এখন বোধহয় বোষ্টুমী ভাব এসেছে।—কিন্তু আমি ওর নামে ঐসব চার্জ আনতে বলেছি, না হলে ওকে ফাঁসানো যাবে না। ওর আগেকার কীর্তিকলাপ বরং আমার কাজেই লাগবে। কোনো জুরির ইচ্ছে থাকলেও ছাড়তে পারবে না। [খাবার আসে। কালোর মা-র হাত থেকে স্ত্রী খাবার নেয়।] তখন ঐ চিদাম্বরম্‌ও ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট্, আমিও ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। কি করবি কর্।

স্ত্রী—সত্যি, সেই আজ কত বছর ধরে সেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। লোককে বলতেও যেন কেমন লাগে।

স্বামী—হ্যাঁ, ড্রয়ার থেকে রিভলবারটা বের করে আনো তো! আজ দু'বছর ধরে ও ফেরারী। ওঃ, একবার যদি পাই। তবে বেশীদূর পালাতে পারেনি। আউট অফ রিচ হ'তে গেলে ওকে নদী পেরিয়ে জঙ্গলে যেতে হবে। দিনের বেলা নদী পর্যন্ত আসতে পারেনি নিশ্চয়ই। আর সেই রিস্কই যদি ও নেয় তবে জ্যান্ত ধরতে না পারলেও মরাই ধরব।

স্ত্রী—[হঠাৎ নিস্পৃহ হয়ে] মাংসটা ঠিক হয়েছে তো? নতুন ঠাকুরটা আবার পারে না ঠিক ক'রে--আমিই গিয়েছিলাম, কিন্তু এই গোলমালে শেষটা আর দেখতে পারলাম না।

স্বামী—একটু বেশী গলিয়ে ফেলেছ, আমার আবার শক্ত না থাকলে বিচ্ছিরি লাগে। বিলিতী রান্নায় ওরা তো রক্তটা ধোয় না—রক্ত শুদ্ধই রাঁধে, তাতে অনেক বেশী উপকার হয়। একটু কাঁচা-কাঁচা থাকে।

স্ত্রী—[কণ্ঠে কোথায় যেন একটু তীব্রতা আসে] মোটেই না। মাংসকে মাংস বলে চেনা গেলে বরং সেটা খেতেই ঘেন্না করে। তাই আমরা হলুদ দিই, চিনি ভেজে দিই, যাতে রংটা অন্যরকম হয়।

স্বামী—আর সেইজন্যেই তো আমাদের রান্নায় কোন উপকার থাকে না। আরে বাবা, যেটা উপকারী সেটা তো সোজাসুজি তেমন করেই করতে হবে যাতে উপকারটা পাও।

স্ত্রী—[একটু চুপ করে থেকে রিভলবারটা হাতে নেয়।] ঐ সাহাটা যদি ঐ রকম না করত তাহলে তো তোমাকে বাপু ঐসব নোংরা কাজে নামতে হোত না। লোকটা এক নম্বরের ফাঁকিবাজ, আমি তোমাকে বলছি একেবারে ঘুষখোর।

স্বামী—আসলে অলস, কোন উচ্চাশা, মানে এ্যাম্বিশান্ নেই। আমি বুঝতে পারি না। আরে তুই যদি উন্নতি না করিস তো যার জন্যে তুই কাজে ফাঁকি দিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি যাস সেই স্ত্রীই'তো তোকে সম্মান করবে না।

স্ত্রী—হ্যাঁ, সেই রকম স্ত্রী কিনা। স্বামীকে একেবারে আঁচলের তলায় রাখতে যায়। এই যে মুনসেফের বাড়িতে সেদিন সকলে ঐ সাহাকে স্ত্রৈণ বলে ঠাট্টা করছিল। জানতে তো পারে, তাতে কি কোন লজ্জা হয়? আর লোকটাকেও বলি, বিয়ের চোদ্দ বছর পরেও একি! ঐ তো রক্কেকালীর মত চেহারা। একটা হাত আবার নুলো। ওকি! খাওয়া হয়ে গেল! আর একটা লুচি খাও অন্তত—

স্বামী—নাঃ, বেশী খেলে দৌড়তে পারবো না।

স্ত্রী—তুমি কেন দৌড়বে? এই পঙ্গপাল সরকার মাইনে দিয়ে তাহলে পুষছে কেন? যদি তোমাকে ডাকাত ধরতে দৌড়তে হয়?

স্বামী—প্রমোশনটা যে আমারই হবে, তাই। যাক, যা হয় করিয়ে নিক। ঐ যে বলে না এন্ড জাসটিফাইস দি মিনস আর তাছাড়া আমি নিজে যদি ওকে পিস্তল হাতে অ্যারেস্ট করতে পারি তার আলাদা একটা এফেক্টও আছে। তাহলে আর কারুর সাধ্যি হবে না যে আমার প্রমোশন নিয়ে টাল-বাহানা করে। আর তারপর—তাহলে ঊর্মিলাদেবীর হাতপাখা টেনে হাত ব্যথা করতে হবে না। কেরোসিনের আলোতে নভেল পড়তেও হবে না।

স্ত্রী—ভালো ইস্কুল নেই বলে বাসুকে কলকাতার বোর্ডিং-এ পাঠাতেও হবে না।

স্বামী—হ্যাঁ, আর আমাকেও বাসুকে বোর্ডিং-এ পাঠাবার জন্য খোঁটা শুনতে হবে না। [দুজনেই হেসে ফেলে। স্বামী যদিও হাসতে হাসতেই বলে, তবু গলায় একটা সিরিয়াস ভাব এসে যায়] আর তাহ'লে ঊর্মিলাদেবী বোধহয় আমাকে আর একটু বেশী ভালো বাসতে পারবে, না?

স্ত্রী—আহা! এখন যেন কম বাসি!

স্বামী—[গলায় আর অফিসারী ভঙ্গীও নেই। হাসিও নেই, একটা বেদনা আছে।] বাসো। একটু কমই বাসো। অন্তত বাসতে তো কম কিংবা হয়ত বাসতেই না!

স্ত্রী—[ঠাট্টার সুরটা বজায় রাখতে চেষ্টা করে।] আহা, তোমাকে বাসি না তো কাকে ভালোবাসতে গেছি শুনি?

স্বামী—কি করে জানব? দেবাঃ ন জানন্তি, তবে এখন বোধহয় ঊর্মিলাদেবী আমাকে একটু একটু ভালোবাসে, না?

স্ত্রী—তুমি আবার আগের কথা তুলে আমাকে খোঁটা দেবে? এখন বুঝি একটু একটু ভালোবাসি?

স্বামী—[হাসে] আচ্ছা বেশ, না হয় অনেকই হ'লো! না না, তোমার দোষ

দিচ্ছ না। মেয়েরা চায় স্বাচ্ছন্দ্য। তার ওপর তুমি বড়লোকের মেয়ে—যে যেখানে জন্মায়, সে তো তার চাইতে আরো ওপরে উঠতে চাইবেই। আমি যদি জীবনে উন্নতি করতে না পারি, তোমার মনের ভালোবাসা তো মার খাবেই! সত্যি, অনেক বোকামি করেছি আমি।

স্ত্রী—[সজল হয়ে ওঠে গলা] সেগুলো মোটেই বোকামি নয়। তুমি ভালো-মানুষ, তাই তোমার উন্নতি হয়নি।

স্বামী—ওগুলো বোকামি। মানুষ যেখানে এসে পড়ে তাকে তো সেখানকার মতই চলতে হবে। নিজেকে ভালোমানুষ বলে আমি অন্তত নিজের সাথে চালাকি করতে চাই না কমলা! [স্ত্রী আশ্চর্য হয়ে তাকায়] হ্যাঁ, কমলা নামটা তো বেশ। কেন যে তুমি জোর করে বদলে তাকে ঊর্মিলা করলে!

স্ত্রী—[থতমত খেয়ে] তখন মনে হয়েছিলো ওটা বোধহয় খুব সেকেলে!

স্বামী—দূর! সেকেলে! কমলা নাম কখনো পুরোনো হয়? অনেকবার মনে হয়েছে, তোমাকে কমলা বলে ডাকি। আজ ডেকেই ফেললাম। আচ্ছা কমলা, শহরে গেলে তোমার খুব ভালো লাগবে, না?

স্ত্রী—লাগবে, সত্যি লাগবে। তখন আমাকে কাউকে কাছছাড়া করতে হবে না। এখন বাসুর কাছে যেতে হলে তোমাকে ছাড়তে হয়। আর তোমার কাছে থাকতে হ'লে বাসুকে ছাড়তে হয়। তখন আমাকে কাউকে ছাড়তে হবে না।

স্বামী—ভয় করবে না তো?

স্ত্রী—[বুঝতে পেরেও] কেন? [স্বামী মুখটা ফিরিয়ে নেয়] ও, না। আমার হিস্টিরিয়া যদি অতদিন না চলত তবে তুমিও ওপথে যেতে না। আমি জানি। শহরকে আর আমার ভয় নেই। আচ্ছা এখন তো আমি একদম ভালো হয়ে গেছি, না?

স্বামী—হ্যাঁ, কিন্তু কেন তোমাব হিস্টিরিযা হ'লো বলতে পার?

স্ত্রী—আবার তুমি ঐকথা তুলবে?

স্বামী—তুলিই না একটু! ধর যদি ফেরারীটার কাছে কোন অস্ত্র থাকে। মারা যেতেও তো পারি।

স্ত্রী—[চোখে জল এসে যায়] খবরদার বলছি, ওসব কথা বলবে না তুমি। তাহলে আমি কিন্তু তোমাকে যেতে দেব না!

স্বামী—[হেসে] আমাকে তো ভালোবাসতে পারোনি তখন। কিন্তু কাকে ভালোবাসতে? কাউকে বাসতে নিশ্চয়ই?

স্ত্রী—না তাকে ভালোবাসা বলে না! তোমাকে তো বলেছি কতদিন! তার সঙ্গে বিয়ের কথা হয়েছিলো কেবল। তারপর সে পলিটিক্সে ঢুকলো, বিয়েও ভেঙে গেল!

স্বামী—সেই কি তোমার বাবার বন্ধুর ছেলে, যাকে তুমি পুলিশের হাত থেকে

বাঁচিয়েছিলে?

স্ত্রী—না। [বাইরে থেকে চাপরাশির গলায় আওয়াজ আসে।]

স্বামী—অন্দর আও।

চাপরাশী—সাহা সাহাব, বাহার খাড়া হ্যায়।

স্বামী—[একটু ভেবে] অন্দর আনে বোলো। [জলের গ্লাস হাতে তুলে নেয়। স্ত্রী ভেতরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়] আরে ওটা আবার একটা পুরুষ মানুষ নাকি যে ওকে এত লজ্জা করতে হবে? [স্ত্রীর পা আটকে যায়। বাইরে গলা খাঁকারির শব্দ পাওয়া যায়। স্বামী অফিসারোচিত ভঙ্গীতে ঠিক হয়ে বসেন। স্ত্রীকে বসতে ইঙ্গিত করেন। স্ত্রী পিছনের দিকে একটা চেয়ারে বসেন।] কাম ইন্। [ছোট দারোগা সাহা ঢোকেন। বয়স প্রায় চল্লিশ, ভীতু লোক, স্যালুট করেন।] ইয়েস?

সাহা—সব ব্যবস্থা পাকা স্যার। নদীর ওপারে সার দিয়ে লোক দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। ওপারে গেলেও পালাতে পারবে না স্যার!

স্বামী—আর?

সাহা—আর স্যার ঐ আপনি যেমন বলেছিলেন, পালাতে চাইলে জখম করতেও কেউ যেন দ্বিধা না করে। সবাইকে বলে দিয়েছি।

স্বামী—আমি কিন্তু আরো একটু পরিষ্কার করে আপনাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। নিজে তো বুদ্ধি করে কিছু করতে পারবেন না। অফিসার যে অর্ডার দেয় সেটাও ঠিকমত বলতে পারেন না লোককে।

সাহা—হ্যাঁ স্যার তাও বলেছি। বলেছি, এমন যদি আশঙ্কা হয় যে, মানে, আহত করেও ধরা গেল না, তাহলে নিহত করতেও কেউ যেন ভয় না পায়। ওপরের অর্ডার আছে। তবে—

স্বামী—তবে?

সাহা—তবে, এমনি যদি ধরতে পারা যায় সেইটাই ভালো।

স্বামী—খুব দয়ার শরীর আপনার না? [একটু থেমে] তবে এটা ব'লে ভালো করেছেন। দেখুন এ সমস্ত হাঙ্গামা কিছুই করতে হোত না যদি না হঠাৎ দুপুরবেলায় আপনার স্ত্রীর সাথে প্রেম করবার ইচ্ছে চাগিয়ে উঠতো।

সাহা—[ভয়ে ভয়ে] স্যার! না, মানে—

স্বামী—দেখুন, একটা মিথ্যে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করছেন আপনি। করবেন না, কি পরিমাণ কাজে ফাঁকি দেন কেবল ঐ জন্যে সকলেই জানে। সকলে এই নিয়ে হাসি ঠাট্টা করে, আপনি জানেন না? জানেন নিশ্চয়ই, তবে সেটাকে সিরিয়াসলি নেননি। ভেবেছিলেন হাসি-ঠাট্টার মধ্যেই দিন যাবে! কিন্তু এবারে আপনার পক্ষে ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস দাঁড়াবে, মনে রাখবেন। তা সে ও ফেরারীকে পাওয়া গেলেই কি, আর না গেলেই কি!

সাহা—স্যার ? . [অত্যন্ত নার্ভাস]

স্বামী—আপনাকে অনেক ইনডালজেন্স দেওয়া গেছে। আর নয়!

সাহা—স্যার, আপনি নিশ্চয়ই আমার চাকরি—

স্বামী—খাব কিনা ? তাছাড়া আপনার যোগ্য শাস্তি আর কি হতে পারে আপনিই বলুন না! [হঠাৎ গলা ফাটিয়ে ব্যঙ্গ করবার ভাবে] তাছাড়া এই পুলিশের চাকরি আপনার মত ভালোমানুষের পোষাবে কেন? আপনাদের সব বড় বড় হৃদয়। প্রেমিক হৃদয়, পুলিশের তুচ্ছ কাজে তাকে নষ্ট করবেন? কি বলছিলে তুমি সেদিন ঊর্মিলা? কপোত-কপোতীকথা—[স্ত্রীর বোধহয় এতটা সহ্য হয় না। তবু মুখে একটু হাসির ভাব এনে মাথা নিচু করে নেয়।]

সাহা—[গলা ধরে গেছে] স্যার চাকরি গেলে খাব কি স্যার? এইবারটা মাপ করুন। জীবনে—

স্বামী—এই তিনবছর আপনি আমার আন্ডারে এসেছেন, এর মধ্যে কতবার আপনাকে মাপ করা হয়েছে? এমন কি, এই ছমাস আগে যখন এই আন্দোলনেরই একটা ছোঁড়াকে ধরা হয়েছিল, কি নাম যেন তার?

সাহা—সুকোমল।

স্বামী—এখনও ভুলতে পারেন নি? নামটা তো দেখছি ঠিক মনে আছে! নিজের মনকে বোঝবার চেষ্টা করুন। দেখুন আপনার সিমপ্যাথি কোন-দিকে। যাই হোক, সেই সুকোমলকে যখন হাজতে রাখা হয়েছিলো, তখন আপনার স্ত্রী মাংসভাত রান্না করে ওর জন্যে পাঠিয়ে দেননি? তখন আপনাকে ওয়ার্নিং দেওয়া হয়নি?

সাহা—স্যার, সুকোমলের অত্যন্ত কম বয়স ছিল। আর ওকে যখন আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে নিয়ে যায়, আমার স্ত্রী তখন ওকে দেখেছিলো।

স্বামী—[নিষ্ঠুরের মত বলে] তাই মিসেস সাহার মাতৃহৃদয় একেবারে উথলে উঠলো। তবু যদি উনি সত্যি সত্যি মা হতেন।

সাহা—আমি মানছি স্যার সেটা আমাদের খুবই অন্যায় হয়েছিলো। কিন্তু ও বললো ওর যা শাস্তি হবে, তা তো হবেই । মুখ দেখে মনে হলো তিন-চার দিন খায়নি। একটু খেতে দিলে কি আর এমন হবে। আমিও ভাবলাম স্যার, কোনরকম বন্ধুত্ব তো করতে যাচ্ছি না, শুধু একবেলা দুটি—

স্বামী—বেশ, তা এবারেও কি আপনার স্ত্রী জানলা দিয়ে কয়েদীকে দেখে—কিন্তু এবারে তো মাতৃভাব হবে না মিঃ সাহা—নিরবধি সামন্তর বয়েস তো আপনারই মত হবে ; না? তা যাই হোক, এবারে কি পোলাও রান্না হবে বলে কিসমিসের ফরমাস তামিল করতে গিসলেন ?

সাহা—[ক্ষুব্ধ হয়] আমার যে দোষ হয়েছে তা আমি একশবার মানছি। এর জন্য ও বেচারীকে বারে-বারে এর মধ্যে জড়াবেন না।

স্বামী—[গলা অত্যন্ত কঠিন] আপনি যদি নিজের বুদ্ধিতে চলতেন, তাহলে ওকে জড়াবার দরকার হোত না। আপনার স্ত্রী আমার আলোচনার যোগ্যও নন। এটা মনে রাখবেন।

সাহা—[অপ্রস্তুত হয়ে] না, মানে আমি ঠিক ওভাবে কথাটা বলিনি স্যার। মানে আজ তিনদিন ধরে ওর যা অবস্থা, তাতে করে পরামর্শ দেবে কি স্যার, ভালো করে কথাই বলতে পারছে না।

স্বামী—থাক্, থাক্—

স্ত্রী—[কৌতূহলী হয়ে] আহা, শোনাই যাক্ না! আপনার স্ত্রীর কি হয়েছে?

সাহা—[একটু হক্‌চকিয়ে যায়, ঊর্মিলার দিকে ভালো করে তাকাতে পারে না।] খুব জ্বর, আপনারা তো সব জানেনই, ওর বাঁ হাতটা, মানে ভাঙা —তার ওপর এই জ্বর—ওষুধটা ঢেলে খাবারও শক্তি নেই। একটা ঝি ছিল, সে কাল থেকে ছুটি নিয়েছে। তার ছেলের বিয়ে। ঐসময় ছিল ওর ওষুধ খাবার সময়। তা আমি ভেবেছিলাম যাব আর আসব—

স্বামী—দেখুন, ওসব বাজে কথা শোনার সময় আমার নেই। বৌকে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিন। হাতে পানি দাও রামসিং [ভিতরে চলে যায়।]

[স্ত্রী এবং সাহা দুজনেই কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়। আড়ষ্টতা কাটাবার জন্যেই যেন স্ত্রী হঠাৎ উঠে পড়ে স্বগত বলার মতই বলে।]

স্ত্রী—যাই মসলাটা দিয়ে আসি। [স্ত্রী যখন প্রায় দরজার কাছে গেছে হঠাৎ সাহা ডাকে।]

সাহা—শুনুন ; [স্ত্রী ফেরে] দেখুন আপনি যদি দয়া করে আমার কথাটা শোনেন। ওঁর এ ব্যাপারে মাথার ঠিক নেই। অবশ্য আমি একশবার মানছি যে, এজন্যে দায়ী আমি। আমার স্ত্রীর যদি যাবার কোন জায়গা থাকত আমি নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দিতাম। সত্যি ওর যাবারও কোন জায়গা নেই—

স্ত্রী—বাপের বাড়িতে কেউ নেই?

সাহা—আছে মিসেস্ চৌধুরী, কিন্তু ওর যাবারও উপায় নেই। মানে ওরা ব্রাহ্মণ আর আমরা তিলি। কাজেই বুঝতেই পারছেন। ওর যখন বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল, তখন ও পালিয়ে আমার কাছে চলে আসে। সেই দিনেই আমরা, মানে গান্ধর্ব মতে বিবাহ করি। কিন্তু তার পরদিন ওর দাদা খোঁজ পেয়ে এসে উপস্থিত হন। এবং একটু কথা কাটাকাটির পরেই হাতের কাছে টেবিলে একটা এই মানে,—কাগজ চাপা দেবার পাথর ছিল, সেইটে তুলে "তোর মরাই ভাল" বলে ছুঁড়ে মারেন। হাত দিয়ে ঠেকাতে গিয়েছিল তাইতেই হাতটা জখম হয়ে যায়।

স্ত্রী—সেকি! চিকিৎসা করাননি?

সাহা—মানে, সে জায়গাটা তো ঠিক শহর ছিল না। তারপর ওকে নিয়ে কোলকাতায় গিয়েছিলাম। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে। [একটু চুপ] ওর স্বাস্থ্য ইদানীং একেবারে ভেঙে পড়েছে। এ সময় যদি চাকরি যায় তাহলে—মানে আমি একা হ'লে ভাবতাম না—আর এই বয়সে আমি যে আর কোন চাকরি যোগাড় করতে পারবো তাতো মনে হয় না। আপনি একটু যদি—

স্ত্রী—দেখুন, আপনাদের অফিসিয়াল ব্যাপারে আমি মোটেই থাকতে চাই না।

[সাহা চুপ করে থাকে, একটু পরে বলে]

সাহা—খামোকা আপনাকে এতগুলো কথা বলে কষ্ট দিলাম।

[স্বামী ঢোকে]

স্বামী—কি ব্যাপার! আপনি এখনও যাননি!

সাহা—যাই স্যার। [চলে যায়]

স্বামী—কি এত বকরবকর করছিল!

স্ত্রী—ওর স্ত্রীর নাকি খুব অসুখ।

স্বামী—সত্যি নাকি?

স্ত্রী—মনে তো হ'লো! এখন মনে হচ্ছে অতটা না বললেও হতো!

স্বামী—মনে হচ্ছে? যাক! এইবার তাহলে বুঝতে পেরেছ যে সামনে এলে অতটা বলা যায় না। তবে তুমি সামনে না থাকলে ঊর্মি আমি হয়ত অতটা বলতাম না।

স্ত্রী—তার মানে?

স্বামী—তুমি তো অফিসারেরও ওপরওয়ালা কিনা, ভয় হচ্ছিল পাছে আবার "ভালোমানুষ" হয়ে যাই। "ভালোমানুষ" কথাটা তো ভালোমানুষি করে বল, আসলে তো বলতে চাও, নিবীর্য। প্রমোশন যে এবার আমার চাই-ই।

স্ত্রী—প্রমোশনে যদি তোমার দরকার না থাকে তবে আমার জন্য তোমাকে কিছু করতে হবে না।

স্বামী—তোমার জন্যে তো নয়। আমার জন্যে। তুমি শহরে যাবে, খুশী খুশী থাকবে। তোমাকে খুশী দেখবার সাধ যে আমার অনেক দিনের।

স্ত্রী—আজ তোমার হ'লো কি? আমি কি অখুশি আছি?

স্বামী—কি জানি। বাসু যখন হ'লো তখন তোমাকে খুব খুশী দেখেছিলাম। দেখি, বাসুকে এনে দিলে হয়ত আবার খুশী হবে।

স্ত্রী—আজ কেন এতো পুরোনো কথা টেনে তুলছো বল তো?

স্বামী—সত্যি। কেন? [নিঃশ্বাস ফেলে] যাই! [বেল্ট শুদ্ধু পিস্তলটা কোমরে পরতে থাকে।]

স্ত্রী—আচ্ছা ঐ ফেরারীটাকে পেলেও কি সাহার চাকরি যাবে?

স্বামী—না।
স্ত্রী—যাক—
স্বামী—সাসপেন্ড হ'তে পারে।
স্ত্রী—আর পাওয়া না গেলে? যাবে?
স্বামী—হ্যাঁ।
স্ত্রী—তবে তুমি তো বাঁচিয়ে দিতে পার।
স্বামী—না ওকে বাঁচাতে গেলে নিজেকে মরতে হবে।
স্ত্রী—তার মানে? আঃ বলো না।
স্বামী—মানে—ইনসপেক্টর রহমান আর বড় দারোগা ঘোষ দুজনেই গেছে রায়পুরের সেই জোড়া খুনের তদন্তে। তাই সাহা এখন ছিল আমার আন্ডারে ডাইরেক্ট, কাজেই—
স্ত্রী—ইস। তাহ'লে কি হবে? কি হতে পারে? শুনিনেই না, কতটা খারাপ হতে পারে?
স্বামী—একধাপ নীচে নেমে যেতে পারি, সাসপেন্ড হতে পারি। আর সেরকম লোকের হাতে গেলে, কি জানি কি হবে! তবে সব দোষ যদি আমি সুন্দর করে সাজিয়ে সাহার ঘাড়ে দিই, তব এ যাত্রা কোন রকমে টি'কে যেতেও পারি। কিন্তু প্রমোশন? নৈব নৈব চ!
স্ত্রী—[সভয়ে] ভগবান, যদি ফেরারীটা ধরা পড়ে, তবে আমি জোড়া পাঁঠা বলি দেব।
স্বামী—[অবস্থাটা হালকা করবার জন্যে হেসে হালকাভাবেই বলবার চেষ্টা করে] ইস, একি করলে? ও ব্যাটা তো এমনিও ধরা পড়তো. খামোকা দুটো প্রাণীহত্যার ব্যবস্থা পাকা করে ফেললে?
স্ত্রী—সত্যি বল না, বেশী দূরে যেতে পারেনি, না?
স্বামী—তাই তো মনে হয়।
স্ত্রী—আমার ইচ্ছে করছে, তোমার সঙ্গে যাই, একটুও যদি সাহায্য করতে পারতাম তোমাকে। এখানকার লোকগুলো যা বোকা।
স্বামী—আমি তো জানি, ফেরারী আসামীদের ছেড়ে দেবারই অভ্যাস আছে তোমার। ধরবার অভ্যাস আছে বলে তো জানি না। আমার তো ভয়, আমি কষ্ট করে ধরবো—আর তুমি পালাবার রাস্তা বাতলাতে বসবে।
স্ত্রী—একবার ধরেই দেখ না। আমি যদি জজ হতুম না, তুমি ধরে আনলে আমি ফাঁসির হুকুম দিতুম।
স্বামী—কিন্তু ছেড়ে তো দিয়েছিলে একবার?
স্ত্রী—আচ্ছা তখন আমার বয়স কত ছিল বল তো? তখন বোকা ছিলুম বলে, আর এখনও বোকা নেই।
স্বামী—হ্যাঁ, তোমার দাদার কাছে শুনেছিলাম সব গল্প। লোকটা পিস্তল

দেখিয়ে ভয় দেখাতেই সুড় সুড় করে খিড়কীর দোর দিয়ে বার করে দেওয়া। এই তো সাহস!

স্ত্রী—আহা, আমার অবস্থায় পড়লে দেখা যেত!

স্বামী—ছেলেটা তো তোমার বাবার বন্ধুর ছেলে ছিল, না? তাই ভেবেছিল তোমাদের বাড়িতে ঢুকলেই বুঝি বেঁচে যাবে। তোমার বাবাকে ঠিক চিনতো না!

স্ত্রী—[অপ্রস্তুতের হাসি হেসে] হ্যাঁ বাবা হয়ত—

স্বামী—তোমার সঙ্গেও তো আলাপ ছিল, না?

স্ত্রী—হ্যাঁ, আলাপ ছিল! যতসব—

স্বামী—আহা, আলাপ ছিল বলা মানেই তো আর প্রেম ছিল বলা নয়। কি মুশকিল! তোমার দাদার কাছে সব শুনেছিলাম। প্রেম নিবেদন করেও যখন কোন ফল হল না তখন বীরপুরুষ পিস্তল বার করলেন।

স্ত্রী—এক খুনের গল্প করতে গিয়ে আর এক খুনে পালাবে?

স্বামী—হ্যাঁ, যাই, এ খুনে পালালে আমার চলবে না!

স্ত্রী—হ্যাঁ চলবে না, কিছুতেই না। শোন একটু সাবধানে থেকো। বলা তো যায় না, ফেরারীটার হাতে যদি কিছু থাকে।

স্বামী—ভালোই হবে। রণক্ষেত্র জমবে ভালো! জিতলে তো কথাই নেই। আর মরলে—নাঃ তাহলেও কথা নেই।

স্ত্রী—আজ তোমার হয়েছে কি? [হাত ধরে বলে] না, তোমাকে আমি যেতে দেব না।

স্বামী—দেবে বৈকি! তুমিও যেতে দেবে, আমিও যাব। না গেলে চলবে কেন? তাহলে প্রমোশন হবে না। একধাপ নিচে নামতে হবে,—আর চাকরির খাতায় যদি এই কালো দাগ একবার লাগে, সে দাগ কি আর কখনো ঘষে তোলা যাবে? তখন ছোট হাকিমের বৌ হয়ে, আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে, বড় হাকিমের বৌকে খোশামোদ ক'রে—যেমন কুমারেশবাবুর স্ত্রী তোমাকে করে থাকেন—ছোট হাকিমকে কতটা শ্রদ্ধা করতে পারবে ঊর্মি?

স্ত্রী—পারবো, পারবো!

স্বামী—[হেসে মাথা নাড়ে] আর তোমার বাসু? তোমার শহর?

স্ত্রী—চাই না।

স্বামী—[আবার হাসে] আর যদি চাকরি যায়? এই বয়সে আর কোথায় চাকরি খুঁজতে যাবো বল? ব্যাংকের মাত্র ঐ সামান্য কিছু টাকা সম্বল করে ছেলেকে নিয়ে বেকারের বৌ হতে কেমন লাগবে?

স্ত্রী—যাই লাগুক—

স্বামী—[থামিয়ে দেয়] তাই আমাকেও যেতে হবে, আর তুমিও যেতে দেবে। ঊর্মি, এই যে রাতটা আসছে—এই রাতে একজনকে বলি যেতেই হবে।

হয় সাহা, না হয় আমি। আর আমরা যদি দুজনে বাঁচতে চাই তবে ঐ নিরবধি সামন্তকে বলি যেতেই হবে...। আচ্ছা যাই। [বেরিয়ে যায়]

[স্ত্রী চুপ ক'রে সামনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সন্ধ্যে হয়ে আসে। দূর থেকে মসজিদে আজান দেবার শব্দ ভেসে আসতে থাকে। কালোর মা একটা কেরোসিনের টেবল ল্যাম্প নিয়ে ঘরে ঢোকে।]

কালোর মা—ওমা, অমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? কাপড় ছাড়বে না?

স্ত্রী—[যেন সম্বিৎ ফিরে আসে] অ্যাঁ, ও, হ্যাঁ।

কালোর মা—কি? হ'ল কি? কোন খারাপ খবর আলো নাকি?

স্ত্রী—না, ইয়ে, কি যেন, হ্যাঁ, ছোটদারোগার বৌ-এর নাকি খুব অসুখ?

কালোর মা—হ্যাঁ। খুব নাকি জ্বর। দুধঅলাটা দুধ দিতি গিয়েছিলো না? তা বললে—যে এত নাকি জ্বর যে, দুধির পাত্তরটা যে এগোয়ে দেবে সে সামত্তও নেই। ও তাই নিজে পাত্তর খুঁজে নিয়ে, দুধ রেখে তবে আসে!

স্ত্রী—ও, তোমার কাজ হয়ে গেলে একবার দেখে এসো তো ছোটদারোগার বৌকে! আর যদি কিছু করবার থাকে তো ক'রে দিয়ে এস।

কালোর মা—[খুশী হয়ে] যাব? আমিও তাই ভাবতিছিলাম, একবার যাওয়া ভাল। কেউ যায় না ও বাড়ি। [বাসনগুলো তুলে নিয়ে যেতে যেতে বলে] এখুনই যাচ্ছি। [ও চলে যায়। স্ত্রী একলা বসে থাকে। পিছনের দরজা দিয়ে একটা লোক ঢোকে। পরনে ধুতি আর হাফশার্ট। শীর্ণকায়]

লোক—কমলা!

স্ত্রী—[চমকে তাকায়] কে!! [লোকটা হাসে] কে তুমি?

লোক—আমি, আমি, আমি সত্যপ্রিয়। চিনতে পারলে না তো? অবশ্য না পারবারই কথা। আমি কিন্তু তোমাকে প্রথম দেখেই চিনতে পেরেছিলাম।

স্ত্রী—ও তু—মি! কিন্তু তুমি এখানে কেমন করে এলে? ও [একটু যেন বুঝতে পারে।]

সত্য—বলতে পার আসতে বাধ্য হলাম। যা ফেউ লাগিয়েছেন তোমার স্বামী চারিদিকে!

স্ত্রী—[এইবার যেন পরিষ্কার হয়ে আসছে] ও, ও, ও, তুমিই নিরবধি সামন্ত! তুমিই!! [চিৎকার করে কাউকে ডাকতে যায়। কিন্তু নিজেই আবার সামলে নেয়।]

সত্য—কি, আমাকে ধরিয়ে দেবে?

স্ত্রী—তুমি কি মনে করেছ তোমাকে ছেড়ে দেব! ষোল বছর বয়সে যে ভুল করেছিলাম—

সত্য—তিরিশ বছর বয়সে সেটা শুধরে নেবে?

স্ত্রী—হ্যাঁ। সুযোগ যখন এসেছে।

সত্য—তুমি কি তখন ভুল করেছিলে বলে তোমার মনে হয়?

স্ত্রী—নিশ্চয়ই! বাবার কথা শুনলে আজ আমাকে এত কষ্ট পেতে হোত না। কিন্তু এখানে এলে কি করে তুমি? আর এলেই বা কেন? তোমার ভয় করলো না?

সত্য—এলাম উপায় ছিল না বলে। হাজত থেকে কোনরকমে যখন বেরোতে পারলাম তখন হেঁটে চললাম নদীর দিকে। নদী পার হতে পারলেই—পৈতৃক প্রাণটার মেয়াদ আরও কিছুদিন বাড়ে। কিন্তু নদীর কাছ বরাবর আসতেই দেখলাম, নাঃ আর উপায় নেই, জেনে গেছে ওরা। তখন পাড়ের নীচ দিয়ে দিয়ে তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত এলাম। চমৎকার জায়গায় তোমাদের বাড়িটা না! একেবারে নদীর ধারে। বেড়াতে যাও নিশ্চয়ই?

স্ত্রী—অবান্তর প্রশ্ন। তারপর?

সত্য—হ্যাঁ, তারপর। তারপর তোমাদের পিছনের আমগাছটা ধরে উঠে পড়লাম গাছে। অনেকক্ষণ ওখানেই বসেছিলাম। প্ল্যান করছিলাম, ইতিমধ্যে যদি ধরা না পড়ি তাহলে সন্ধের অন্ধকারে আবার নামবো নদীতে। চারিদিকেই লক্ষ্য করছিলাম। এমন সময় দেখলাম তোমাকে, কিরকম চেনা চেনা লাগল—তারপর যখন তুমি রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে সবিস্তারে মাংস রান্নার কারকিত বোঝাতে লাগলে ঠাকুরকে, তখন গলার স্বর শুনে আর ঐ চিনি ভাজার কথাটা কানে যেতেই আর সন্দেহ রইল না। মনে আছে? সেই পালাবার আগের বার যেবার তোমাদের বাড়িতে যাই তুমি জিদ ধরলে তুমিই মাংস রাঁধবে—তোমার মা বলেছিলেন একটু চিনি ভেজে দিস—তা তুমি প্রায় একপো চিনি ঢেলে দিয়েছিলে? উঃ কি মিষ্টি! কি মিষ্টি! কেউ আর মুখে দিতে পারে না। [হাসতে থাকে]।

স্ত্রী—[গলা কঠিন] আমার মনে পড়ছে না। তুমি কি পুরোনো কথা ঝালাতে এখানে এলে নাকি? কিন্তু তাতে কোন সুবিধে হবে না।

সত্য—না না, হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তাই। একটু বসব? [একটা চেয়ারে বসে] আমি যেদিক দিয়ে এসেছিলাম, সেইদিক দিয়েই চলে যেতাম। কিন্তু একটু পরেই দেখলাম, তা আর হবার নয়। নদীর ওপর পর্যন্ত পুলিশ। পুলিশ নেই কেবল যে পর্যন্ত তোমাদের পাঁচিল বিরাজমান। ওরা কি করে ভাববে বল, যে খোদ বড় হাকিমের বাড়িতে ফেরারী আসামী ঢুকবে। অনেক ভাবলাম। শেষ পর্যন্ত দেখলাম, তোমার সঙ্গে দেখা না করে আর উপায় নেই—

স্ত্রী—তার মানে তুমি ভাবছ, আবার তোমার পালাবার ব্যবস্থা আমিই করে দেব, না?

সত্য—দেবে না?

স্ত্রী—আশ্চর্য! আশ্চর্য তোমার সাহস, না, স্পর্ধা!—না, আমি কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। কি করে একটা লোক এরকম ভাবতে পারে। পলিটিকস্

করলে মানুষের চোখের চামড়া বোধহয় থাকে না। চোদ্দ বছর আগে যাকে তুমি বিয়ে করেছিলে, আজ আবার তারই কাছে এসেছ? তারপরে সে তোমার শত্রুর স্ত্রী ; কি ক'রে ভাবলে যে আমার মনটা ঠিক চোদ্দ বছর আগের মতই আছে? আশ্চর্য!

সত্য—মনস্তত্ত্ব নিয়ে ভাববার অবসর ছিল না। অন্য সব পথ যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন মনে হল হতেও তো পারে!

স্ত্রী—না। হ'তে পারে না।

সত্য—তুমি কি চোদ্দ বছর আগের প্রতিশোধ এখন নেবে?

স্ত্রী—নিলেও দোষ হয় না, না নিজের কাছে, না অপরের চোখে।

সত্য—এই যে প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে, এর মানে জানো?

স্ত্রী—জানি, একটা অসৎ লোকের অসৎ কাজের শাস্তি।

সত্য—না। তুমি এখনও আমাকে ভালোবাস?

স্ত্রী—[তিক্ত কণ্ঠে] এইবার বুঝি মনস্তত্ত্ব নিয়ে ভাববার অবসর হ'ল? যাক্‌গে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি ওঁর কাছে খবর পাঠাই—[যেতে উদ্যত হয়]

সত্য—শোন, একবার ভেবে দেখবে না?

স্ত্রী—ভাববার কি আছে?

সত্য—আমার কিন্তু ফাঁসি হতে পারে। তাছাড়া যে কাজটা আমরা করছি—তারও অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

স্ত্রী—ঠিক্ সেই আগেকার কথা! কিন্তু তুমি পালিয়ে গেলে আমাদেরও অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।

সত্য—[ঠাট্টার সুরে] তা সত্যি, তোমার স্বামীর পদোন্নতি আট্‌কে যাবে।

স্ত্রী—এতে ঠাট্টা করবার কিছু নেই। চাকরিতে পদোন্নতির কথা শুনলে তোমাদের ঠাট্টা করতে ইচ্ছে হয়, না? কিন্তু তোমাদের দলের নেতা হবার জন্যে যখন তোমরা দল পাকাও, ক্লিক্ কর, তখন নিজেদের ঠাট্টা করতে ইচ্ছে করে না? আর এক্ষেত্রে পদোন্নতি মানে শুধু টাকা আর পজিশনই নয়। একটা বাচ্চা ছেলে তার মায়ের কাছে থাকতে পারবে।

সত্য—[যেন একটা নতুন খবর শুনলো] তোমার ছেলে? সে এখন কোথায়?

স্ত্রী—কোলকাতার বোর্ডিং-এ। ওর পদোন্নতি হওয়া মানে, আমাদের শহরে থাকা, আর তার মনে,—একটা বাচ্চাকে তার মায়ের কাছ ছাড়া হয়ে কষ্ট পেতে হবে না!

সত্য—কত বড় হ'ল তোমার ছেলে?

স্ত্রী—[সে কথার উত্তর না দিয়ে] এক বছর আগে বাধ্য হয়ে বোর্ডিং-এ পাঠাতে হয়েছে।

সত্য—তুমি একেবারে হিউম্যানিটির কোশ্চেন এনে ফেল্‌লে। তোমার ছেলের

সম্ভবত খুবেই কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু একবার ভেবে দেখেছ কি? যে চাষার বৌগুলো ছেলেকে কাছে রেখেও দুবেলা দু মুঠো খেতে দিতে পারে না, যাদের পরনে—

স্ত্রী—দোহাই তোমার, ঠিক সেই বাইশ বছর বয়সের মত কথা আর বোলো না। সেই নেতাদের শেখান কথা। এত বছর পার হয়ে গেল নিজের কিছু বলবার নেই?

সত্য—[অবাক হয়ে] সেই আগের মতই বলছি! কি বলছ তুমি?

স্ত্রী—কেন বুঝতে পারছ না? চাষা আর মজুরের জায়গায় পরাধীন ভারতবাসী বসিয়ে দাও, দেখবে ঠিক একই বক্তব্য।

সত্য—[চিন্তিত হয়] একই বক্তব্য? তোমার তাই মনে হচ্ছে? কিন্তু কথাগুলো কি মিথ্যে? সত্যিই কি আমাদের দেশের চাষা মজুর [স্ত্রী কেমনভাবে যেন তাকায়] বেশ চাষা মজুর কথাটায় যদি তোমার আপত্তি থাকে তাহলে বলি—আমাদের দেশের যারা গরীব, যারা নিঃস্ব তাদের জন্য কিছু করবার দরকার নেই?

স্ত্রী—আমি পলিটিক্যাল মেয়ে নই। তাই তোমার এ সমস্ত কথা আমি বুঝি না।

[একটু চুপচাপ]

সত্য—আমাকে একটু জল খাওয়াবে?

স্ত্রী—জল? আচ্ছা, দাঁড়াও [কেউ জল চাইলে দিতে হয় এই বোধেই যেন জল আনতে যায়। কিন্তু যায় না। ফিরে বলে] আমাকে সরিয়ে দিচ্ছ কেন? পালাবে বলে?

সত্য—[হেসে ওঠে] বলেছি ত! নিজে নিজে পালাবার উপায় থাকলে তোমার কাছে আসতাম না। সেই কখন থেকে তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল খাওয়াবে না? [স্ত্রী একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সত্যর দিকে তারপর ভেতরে চলে যায়]

সত্য—আগেরই মত? আগেরই মত নেতাদের বুলি কপ্‌চে চলেছি? [স্ত্রী জল নিয়ে আসে, সত্য জল খায়।]

সত্য—বলেছ মন্দ না! আগেরই মত নেতাদের বুলি কপ্‌চে চলেছি।

স্ত্রী—সময় নষ্ট করবার মত সময় হাতে নেই। শোন, তোমাকে ছেড়ে দিতে পারব না। ছেড়ে দিলে আমার চল্‌বে না। ওঁকে খবর পাঠাই। উনি নদী পার হয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছেন হয়ত।

সত্য—সেই ভাল। খবর পাঠাও। [স্ত্রী খানিকক্ষণ সত্যর দিকে তাকিয়ে থাকে তারপর বলে]

স্ত্রী—একটা নিছক কৌতূহলের জবাব দেবে? [সত্য হেসে মাথা হেলায়] সেদিন কথা দিয়েও কেন এলে না? [সত্য চুপ করে থাকে] জেনে শুনে

এতখানি মিথ্যে কথা আমাকে বলেছিলে কেন? ফিরে এসে আমাকে বিয়ে করবে এ প্রতিশ্রুতি না দিলেও তোমাকে আমি পালাবার সুযোগ করে দিতামই। এ তুমি জানতে, তবু কেন—?

সত্য—সেদিন তো মিথ্যে বলিনি!

স্ত্রী—তবে এলে না কেন?

সত্য—আসতে পারলাম না।

স্ত্রী—ও, পারলে না।

সত্য—ঠাট্টা করছ?

স্ত্রী—না। তুমি যে চমৎকার ঠাট্টাটা করেছিলে আমার সঙ্গে সেই কথাটা ভাবছি। ভাবছি যে কত মেয়েকে কত কাপুরুষ এরকম কথা দিয়েছে। আর কথা ভাঙার পর বলেছে আসতে পারলাম না।

সত্য—শোন আমার কথা। আমাদের দলে বিয়ে কেউ করত না। বলতে পার বিয়ে করার আইনই ছিল না। যারা বিয়ে করেছিলো বা করতো, আমরা তাদের ছোট চোখে দেখতাম। যদিও তাদের মধ্যে অনেকেই স্ত্রীর সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতো না।

স্ত্রী—তোমার ভয় হ'ল, তোমাকেও যদি ওরা ছোট চোখে দেখে! সুন্দর! আমাকে বলার সময় সে কথাটি মনে পড়েনি কেন? পালাবার জন্য যে কোন ছলের আশ্রয় নিতে লজ্জা করেনি তোমার? অবশ্য তোমাদের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক।

সত্য—রাগ করছ কেন? আগে শোন।

স্ত্রী—রাগ করছি কেন? লজ্জা করছে বলে! আশ্চর্য, সেই কথা ভেবে এখনও লজ্জা করে আমার। মা জানতেন, বাবার ভয় দেখানোকে তুমি গ্রাহ্য করবে না—কিন্তু আমাকে বোধহয় তুমি সত্যি ভালবাস, আমি সামনে গেলে আমাকে বোধহয় তুমি অস্বীকার করতে পারবে না।

সত্য—পেরেছিলাম কি? তোমার বাবা চলে যাবার পর—তখনও তোমার বাবার কথাগুলো কানে বাজছিল আমারঃ "সারেন্ডার কর! এমনি করে আমাদের সকলের আশায় ছাই দিও না। তোমার বাবার কাছে কথা দিয়েছিলাম আমি। তোমার মা কমলার মাকে কথা দিয়েছেন। দশ বছর থেকে কমলা জানে তুমি তার স্বামী হবে। এখন এমনি করে সকলের সর্বনাশ করো না।" এমন সময় প্রদীপ নিয়ে তিনতলার ঘরে তুমি এলে। একটা ছবি যেন দেখলাম আমি। সত্যি অপরূপ সেই ছবি। ভাগ্যিস তখনও ইলেকট্রিক হয়নি রংপুরে।

স্ত্রী—হ্যাঁ। ছবিই দেখেছিলে, মানুষ ত দেখোনি।

সত্য—মানুষ? তারপর তুমি যখন বললে—তুমি তোমার বাবার মত মনে কর না যে আমি কোন অন্যায় করছি, বরং তুমি আমার কাজে সাহায্য করতে

চাও ; তখন তোমাকে মানুষের চেয়েও অনেক বড় বলে মনে হল। মনে হ'ল—যাক্! তারপর তুমি চলে গেলে। আর আমার কাজ হ'ল অপেক্ষা করা, কখন আবার তুমি আসবে।

স্ত্রী—ভোর হ'ল।—কেউ জানল না যে তুমি তিনতলার ঘরে আছ। এমন কি দাদাও নয়।

সত্য—ঐ একটা ভালো কাজ করেছিলেন তোমার বাবা। রাতে কি অন্ধকারই ছিল। সেদিনকার রাতে—চারিদিকের হৈ চৈ এর মধ্যে, বাগানের এক কোণে তোমার বাবাই টর্চের আলোতে প্রথম দেখতে পান আমাকে। দেখতে পেয়েই তোমাদের দারোয়ান, কি যেন নাম ছিল তার ?

স্ত্রী—রামকানাই।

সত্য—হ্যাঁ, রামকানাইয়ের দলকে পাঠিয়ে দিলেন একেবারে উল্টোদিকে। আর আমাকে নিয়ে এসে বন্ধ করলেন তিনতলার ঘরে। অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কবে থেকে এই দলে গেলে ? ছিঃ ছিঃ, এই কাজ কর তুমি !" ওঃ আমার কি রাগ তখন—আমি তখন—যাক্‌গে, আর কেউ জানতে পারলে কিন্তু তুমি আমাকে অত সহজে বাগানের রাস্তা দিয়ে বের করে দিতে পারতে না কমলা !

স্ত্রী—বাবা কিন্তু আরো গোটাকয়েক ভালো কাজ করেছিলেন।

সত্য—কি রকম ?

স্ত্রী—যেমন পুলিশকে বলেছিলেন, আমাদের বাড়িতে কেউ আসেনি। যেমন,—সেদিন দুপুরে, এবং রাত্তিরে—ওপরেই খাবেন বল্‌লেন। বললেন শরীর খারাপ, নিচে নামতে পারছিনে। মা ঠাকুরের কাছ থেকে ভাতের থালা নিয়ে এলেন দোতলায়। আর সেই থালা নিয়ে আমি চলে গেলাম তিন-তলার ঘরে—তোমাকে খাওয়াতে। বাবার খাওয়া হ'ল না। মা-ও তাই উপোস করে রইলেন।

সত্য—এই কথাটা জানতে পারিনি তো সেদিন। এখন যদি উপায় থাকতো ক্ষমা চেয়ে আসতাম তোমার বাবার কাছে।

স্ত্রী—বাবা মারা গেছেন।

সত্য—ও। আর মা ?

স্ত্রী—কানপুরে। দাদার কাছে। ইয়ে, তোমার—মা ?

সত্য—বেঁচে আছেন। জ্যাঠামশাইয়ের গলগ্রহ হয়ে।

স্ত্রী—উপযুক্ত ছেলে তুমি।

সত্য—তোমার কৌতূহলের জবাব দেওয়া কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। তারপর সেই ভাতের থালা হাতে তুমি এলে।

স্ত্রী—তুমি বল্‌লে, সেই রাত্রে তোমাকে পালাতে হবেই। তা নাহলে তোমার দলের ভীষণ ক্ষতি হ'য়ে যাবে। আর তার মানেই ভারতবর্ষের পরাধীনতা

ঘুচবে না।

সত্য—[ঠাট্টাটা গায়ে না মেখে] তুমি হয়ত সবটা বুঝলে না। কিন্তু কি যেন একটা বুঝেছিলে! শুধু বললে—"আমার কি হবে! বিয়ে করে তোমাদের বাড়িতে মায়ের কাছে রেখে যাও আমাকে। কেবল এইটুকু কর আমার জন্যে।"

স্ত্রী—উঃ, সেটুকু বলতে সেদিন যে আমার—। পরে ঐ কথাটা ভেবে কত যে লজ্জা পেয়েছি।

সত্য—বিশ্বাস কর, সত্যিই সেদিন আমি মিথ্যে বলিনি। ভেবেছিলাম বিয়ে করেই কাজ করব। এমন কাজ করব যাতে কেউ না আমাকে ছোট মনে করতে পারে। ভেবেছিলাম নাই বা রইল আমাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক! তুমি আমার কথা ভাববে আর আমি তোমার কথা! কল্পনা করেছিলাম, আমি যখন বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কিংবা পুলিশের তাড়া খেয়ে ছুটছি—তেষ্টায় যখন আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে,—তখন হয়ত তুমি আমার মায়ের কাছে বসে আমার গল্প শুনছ। কোনদিন হয়ত ছোট্ট একটা চিঠি তোমাকে পাঠাতে পেরেছি। আর তুমি দুপুরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে—চুপি চুপি সেই চিঠি পড়তে বসেছ! কি ছেলেমানুষ যে তখন ছিলাম! কি রোম্যান্টিক!

[স্ত্রী যেন আচ্ছন্ন হয়ে কথাগুলো এতক্ষণ শুনছিল—শেষের কথাগুলো যেন শুনতে পায় না।]

স্ত্রী—আশ্চর্য!

সত্য—কি আশ্চর্য! রোম্যান্টিক হওয়াই।

স্ত্রী—[সেই রকম আচ্ছন্নের মত বলে] উঁ? না। আমিও ঐ একই রকম ভেবেছিলাম।

সত্য—একই রকম?

স্ত্রী—আমিও কল্পনা করেছিলাম তোমার ছোটবেলার ছবি দেখছি আর গল্প শুনছি,—আর—

সত্য—আর?

স্ত্রী—শুনেছিলাম তোমাদের বাড়িতে বিরাট একটা দীঘি আছে? সে দীঘিতে রোজ সাঁতার দিতে? সেই দীঘিতে আমি চান করছি! উঃ কি ছেলেমানুষই যে তখন ছিলাম।

সত্য—কি বললে?

স্ত্রী—না বলছি, কি রোম্যান্টিক ছিলাম তখন!

সত্য—হ্যাঁ, ঐ কথা বলাই ভালো!

স্ত্রী—তারপর, তারপর কি হ'ল?

সত্য—তারপর তুমি তোমার মাকে গিয়ে বল্‌লে, না?

স্ত্রী—সে তো জানি—মা বাবাকে বললেন। বাবা তোমার কাছে গেলেন। তুমি কথা দিলে। অবশ্য আমাদের ষড়যন্ত্রের কথাটুকু জানলেন না। কি খুশী হয়েই নেমে এলেন বাবা। মাকে বল্‌লেন প্রশান্তর কথা রেখেছে প্রশান্তর ছেলে। তুমি আজই বেয়ানকে চিঠি লিখে দাও চলে আসতে।

সত্য—হ্যাঁ, মাকে তোমার বাবা বেয়ানই বলতেন বটে!

স্ত্রী—কিন্তু তুমি কেন আর এলে না? কিংবা কোন খবর দিলে না?

সত্য—আসতে পারলাম না।—তোমার বাবার সরকার ঘেঁষা লোক বলে নাম ছিল।

স্ত্রী—সরকার ঘেঁষা লোক বলেই সেদিন পুলিশ অত সহজে বাবার কথা বিশ্বাস করেছিলো। তা না হলে বাড়ি সার্চ হোত। চৌকিদার একটা লোককে আমাদের বাগানে লাফিয়ে পড়তে স্পষ্ট দেখেছিল। এবং তুমি জান, সে সত্যিই দেখেছিল।

সত্য—তা ঠিক। যাই হোক কথাটা যখন সবে দলে বলেছি, ঠিক সেই সময়েই সরকারী খেতাব যারা পেয়েছিল তাদের নামের মধ্যে তোমার বাবার নামও বেরুল কাগজে। বিয়ে করবার অনুমতি যদি বা পাওয়া যেত কিন্তু রায়-সাহেবের মেয়েকে বিয়ে করবার অনুমতি আমি নিজেই চাইতে পারলাম না। কারণ জানতুম তা অসম্ভব। আমি তোমাকে জানি কিন্তু তাদের আমি কি করে বোঝাতে পারতাম।

স্ত্রী—ও, এমনি করেই রায় সাহেবের মেয়ের বিচার হয়ে গেল!

সত্য—আমাদের বিচারও অত সহজে কোর না কমলা। তখন আমাদের সাবধান না হ'লে চলবে কেন? তখন দলের যা সমস্যা, বা কাজ, তার কাছে আমার বা তোমার ব্যক্তিগত সেন্টিমেন্টের দাম কি? আর দলের প্রত্যেকের ব্যক্তি-গত সেন্টিমেন্টের দামই যদি কেবল কোন দল দিতে বসে, তবে সে দলকে দিয়ে আর যাই হোক বড় কাজ কিছু হয় না। অন্তত সে দলের মুখে "ভারত স্বাধীন করব" একথা সাজে না। তাই মেনে নিলাম। সে খবরটাও দিতে আসতে কিংবা পাঠাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আবার পুলিশ তাড়া লাগালে। হ'ল না। যেতে হ'ল কুমিল্লায়। কোথায় রংপুর আর কোথায় কুমিল্লা। কেবল তাড়া খেয়ে, পালাতে পালাতে কোথা দিয়ে যে একবছর পার হয়ে গেল! তারপর যখন এলাম সান্তাহারে মায়ের কাছে, শুনলাম তোমার বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে। তাই রংপুর পর্যন্ত আর গেলাম না! ওটুকু কষ্ট বাঁচালাম আর কি!

স্ত্রী—এই প্রথম নিজেকে অপরাধী মনে করে, [কৈফিয়ৎ দেবার মত করে বলে] অনেক কেঁদেছিলাম। বলেছিলাম—মা, আমি বিয়ে করব না। কত ব্রাহ্ম মেয়ে তো বিয়ে না করে থাকে। বাবা বললেন, আমরা ব্রাহ্ম নই। মা বললেন ষোল-সতেরো বছরের খেয়াল তো এটা। ও তুই ঠিক ভুলে যাবি।

আমি ভগবানের কাছে হত্যে দেব। ভগবান যেন তোকে ভুলিয়ে দেন॥ তখন আমার কতটুকুই বা জ্ঞান! আমিও ভগবানকে ডাকতে লাগলাম—ভগবান, আমাকে ভুলিয়ে দাও। যার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে তাকে যেন আমি ভালবাসতে পারি। [কেঁদে ফেলে]

সত্য—পারো নি?

স্ত্রী—[মাথা নীচু করে, একটু পরে বলে] অথচ আমি জানি, পৌরুষে বুদ্ধিতে হৃদয়ে ও তোমার চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। কিন্তু আমি অনবরত ওর কাছ থেকে নিজেকে সরিয়েছি। যা ওর পাওনা ছিল তা দিইনি। আর ও তাই ক্রমে ক্রমে [ঠোঁট কামড়ে একটুক্ষণ বসে থাকে] বিয়ের পর তোমাকে ঘেন্না করতে শুরু করলাম। কত খারাপ কথা ভেবেছি তোমার সম্পর্কে। ভেবেছি তুমি স্বার্থপর, তুমি কাপুরুষ—আর তার পরেই ওকে ভালবাসতে গিয়েছি। [একটু হাসে] আর ও যখন ভালোবাসা নিয়ে এসেছে, ছল করে সরিয়েছি। হিস্টিরিয়া হ'ল আমার। আব ও গেল একটা—একটা খারাপ মেয়ের কাছে। যখন সম্বিৎ ফিবে এলো, ফেরাতে চেষ্টা করলাম ওকে। ফেরালামও, ও যে আমাকে সত্যিই ভালোবাসত! কিন্তু আমি মিথ্যের মুখোশ ছাড়তে পারলাম না। ও সেই মেয়ের কথা আমাকে বলতে পারলো। কিন্তু আমি বলতে পারলাম না—তোমার কথা ওকে! আমাকে খুশী করবার জন্যে ও কত চেষ্টাই না কবতে লাগলো। আমিও যে কবে অফিসার গৃহিণী হয়ে গিয়েছিলাম জানি না তো! সেই পার্টি, সেই ফ্যাশন্, তার মধ্যেই একদিন দেখি বেশ দুরস্ত হয়ে গেছি। তারপর বাসু এল। আব কিছু মনে রইল না। মনে হ'ল সংসারের সর্বদিক সামলাতে হবে। চাকরীর উন্নতি চাই। লোকটাকে হাতে রাখা চাই। আর তোমার স্মৃতি রইল পলিটিক্যাল লোকদের সম্পর্কে একটা ঘেন্নার মধ্যে। [একটু চুপচাপ]।

সত্য—যদি পার আমাকে মাপ কোরো।

স্ত্রী—না, না, তোমাকে মাপ করা না করার কি আছে। আমি নিজেই পারিনি নিজের মন ঠিক করতে। তোমার কি দোষ। [বাইরে দূরে কোথাও গোলমালের আওয়াজ পাওয়া যায়। দুজনেই সচকিত হয়ে ওঠে।]

সত্য—কাউকে ডাক। তোমার স্বামীকে খবর দিক। খামাকা অন্ধকারে হয়ত নদীর ওপারে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কি হল? খবর পাঠাও? এই সময়ে নদীর ওপারে সাপের উৎপাত কিন্তু খুব বেশী। কই, ডাক কাউকে!

স্ত্রী—না, তুমি এই সামনের গেট দিয়ে বেরিয়ে যাও [দ্রুত গিয়ে সেই দিকটা দেখে আসে।] সামনে ঠিক এক্ষুণি কেউ নেই। যে বেয়ারাটা ছিল, গোলমাল শুনে বোধহয় নদীর দিকে চলে গেছে। তুমি বেরিয়ে পড়। দেরি

কোরো না। কি হ'ল? বলছি সামনে কেউ নেই! এমন কি, তুমি স্টেশন পর্যন্তও চলে যেতে পার।

সত্য—হঠাৎ মত বদল হ'ল কেন? ছেড়ে দিতে চাইছ কেন? হঠাৎ?

স্ত্রী—কেন? আমি ঠিক বলতে পারবো না, কেন। কিন্তু এটাই করা উচিত বলে মনে হচ্ছে।

সত্য—আজকের উচিত কাল আবার ভুল বলে মনে হবে। তখন? তখন কি করবে? তোমার ছেলের, তোমার স্বামীর, তাদের কী হবে? ঝোঁকের মাথায় একাজ তুমি কোরো না।

স্ত্রী—আমি অত ভাবতে পারছি না। কেউ জানবার আগে তুমি চলে যাও।

সত্য—নাঃ, আর তা হয় না।

স্ত্রী—নিজে ফাঁসিকাঠে ঝুলে আমার উপকার করে যাবে?

সত্য—না, তাও ঠিক নয়। কমলা, আমি মুক্তি চাই না। মনে মনে অনেকদিন থেকেই আমি ক্লান্ত হয়েছিলাম, আজ তোমার ঐ একটা কথায় চমক লাগল আমার—আগেরই মত নেতাদের বুলি কপ্‌চে চলেছি!—সত্যিই তাই। নিজে আর ভাবতে পারি না। তাই অন্ধের মত কোন কাজ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু সফল হয়েছি কটা জায়গায়? আজ সাঁইত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেল। কি করতে পেরেছি আমি? কতটুকু? এখন পলিটিক্‌স্ করি অভ্যাসে। হয়ত আর কোন কাজ করবার যোগ্যতা নেই বলে। আমার মত একটা লোক চলে গেলে হয়ত বিশেষ ক্ষতি হবে না। সরকারের কাছে আজ আমার যে দাম, আমার দলের কাছে তো আমার সে দাম নেই; আমি তো জানি। আজ আমাকে ওরা সহ্য করে। এই তল্লাটে আমার প্রতিপত্তি একদিন ছিল বলেই ওরা আমাকে এখানে পাঠিয়েছে, নইলে দলের বড় বড় মিটিং-এ ডাকেও নাতো আমাকে। আমাকে জিজ্ঞাসা করে না কিছু, খালি হুকুম করে। আর আমি কাজ করি। সেই কবে একবার হুকুম মানা অভ্যেস করেছিলাম, তাই এখনও মানি, অভ্যাসে মানি!

স্ত্রী—আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। তুমি তো এত অকাজের ছিলে না!

সত্য—কি জানি। ছিলাম নিশ্চয়ই। না হলে হলাম কেমন করে? যদি তোমারও একটু উপকার হয়। তাহলে মন্দ কি?

স্ত্রী—তোমার ফাঁসিকাঠের ওপর আমার উপকার হয়ে কাজ নেই। এতে আমার উপকার হবে না। কেবল এক অশান্তির সমুদ্র থেকে আমাকে আর এক অশান্তির সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হবে। না, তা আমি চাই না। আমি চাই না।

সত্য—শুধু তোমার উপকারই বা কেন? এই যে ঘটনাটা ঘটে গেল এরপর এখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আমি কি ঠিক আগের মতই কাজ করতে পারবো? আমার সন্দেহ হচ্ছে। আর তা যদি না পারি, তবে এই বিভক্ত

মনটা নিয়ে—আমি তো দলের বোঝা হয়েই থাকবো। তাতে লাভ? তার চেয়ে এটা একটা বেশ বীরোচিত সমাপ্তি হবে! [হাসে] আর, তাছাড়া যে দারোগার চার্জে আমি ছিলাম তার চাকরিও তো যেতে পারে।

স্ত্রী—যেতে পারে না, সত্যি যাবে। কিন্তু—

সত্য—বড় ভালোমানুষ ঐ সাহা। সত্যি ওর দারোগা হওয়া উচিত হয়নি। ও অত ভালো না হলে আমি পালাতে পারতাম না। দুপুরে যখন বাড়ি যাচ্ছে, তখন বল্‌লে, "আমার স্ত্রীর খুব অসুখ, আমি একটু বাড়ি যাচ্ছি"। যেন আমি ওর ওপরওয়ালা। তারপর রসিকতা করে এও বলেছিল—"পালাবেন না যেন! তাহ'লে আমি জানে প্রাণে মরব।" তবু আমি পালালাম। [বাইরের দিক থেকে যেন কার পায়ের শব্দ শোনা যায়। সত্যপ্রিয় উঠে যেন অভ্যাসবশতই একটু সরে যায় দরজার আড়ালে। প্রবেশ করে সাহা! শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তারপর বলে—]

সাহা—আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছিলাম,—মানে—[ভিতর দিক থেকে কালোর মার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল]—"দিদিগো সর্বনাশ হ'ল দিদি, ছোট দারোগার বৌ মারা গেল।" [বলতে বলতে ঢুকে পড়েই থমকে দাঁড়ায়] ঐ কথাটাই বলতে এসেছিলাম আমি। তার সাথে আবো একটু কথা আমার—আমার আর চাকরির দরকার নেই। শুধু আপনার বাড়ির কোন চাকরকে দিয়ে যদি ছেলেদের ক্লাবে একটা খবর পাঠান,—মানে, ওকে তো শ্মশানে মানে—আমি বাড়ি যাই, ও একলা আছে। [এমন সময়ে কালোর মার চোখ পড়ে সত্যপ্রিয়র দিকে। অস্ফুট চীৎকার ক'রে ওঠে। কালোর মার চোখ অনুসরণ ক'রে সাহা সত্যপ্রিয়কে দেখে]

সাহা—সেই ধরা দিলেন, একটু আগে যদি দিতেন—মানে তাহলে ওকে একলা মরতে,—মানে—ও হয়ত শেষ সময়ে কিছু বলতে চেয়েছিল—[চলে যায়]

সত্য—কত সহজ মরা। অথচ—

স্ত্রী—কিন্তু তুমি পালাও—[হাত ধরে]

সত্য—না খবর পাঠাও। কেন অনর্থক দেরি করছ?

[স্ত্রীর চোখ পড়ে কালোর মার দিকে। উপলব্ধি করে কালোর মার সামনেই সে আগন্তুককে তুমি বলেছে, হাত ধরেছে। কৈফিয়তের ভঙ্গীতে বলে]

স্ত্রী—মনে পড়ছে তোমার কালোর মা? রংপুরের বাড়িতে একবার দেখেছিলে?

কালোর মা—কে? [একটু কাছে এগিয়ে যায়।] সত্যদাদা? তাই বলি। বললাম না তোমারে দিদি। দুধআলাটা বল্‌তেছিল, গরীবের পরে খুব টান! আমারে চিন্‌তি পারতিছ?

সত্য—হ্যাঁ পারছি। কিন্তু তোমার সাহেবকে খবর দাও। বল যে—

স্ত্রী—না, তুমি পালাও। [অপ্রকৃতিস্থের মত বলে] কালোর মা, একথা কাউকে যেন বোল না।

সত্য—ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আমার যে ফাঁসি হবেই এটা নিশ্চিত ব'লে ধরে নিচ্ছ কেন? হলই না হয় কিছুদিন শ্রীঘর বাস। ভালোই তো। বিশ্রাম হবে একটু।

স্ত্রী—না, না, তা হয় না। ওকে আমি কি বলব? না না, সে হবে না। তুমি যাও। কালোর মা, আমার ঘর থেকে টর্চটা নিয়ে এসো। [কালোর মা ভিতরে যায়]

সত্য [অবাক হয়ে] তুমি হঠাৎ এরকম ব্যবহার করছো কেন? আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

স্ত্রী—[সত্যর হাত ধরে] তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যাও। তোমাকে এখন কালোর মা চিনে ফেলেছে। আর তো আমি ওকে বানিয়েও কিছু বলতে পারবো না।

সত্য—[স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখে] এরকম করছ কেন? কি বানিয়ে বলবে?

স্ত্রী—দোহাই তোমাব, কিছু জানতে চেও না। তুমি চলে যাও। তোমার পায়ে পড়ি [ঠেলতে থাকে দরজার দিকে] সাহা তোমাকে দেখে গেছে, আর সময় নেই।

সত্য—[স্ত্রীর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে] কমলা—

[এই কথার মাঝখানে স্বামী বাইরের দরজা দিয়ে ঢুকে দাঁড়ায়। ওরা হাত ধরা অবস্থাতেই ফিরে তাকায়]

স্বামী—[ঢোক গিলে, যেন যন্ত্রচালিতের মত বলে] সাহা খবর দিলে ও নাকি আত্মসমর্পণ করতেই এসেছে।

স্বামী—[দুজনেরই দিকে তাকায়] কিন্তু আপনি, ঊর্মি, আমি ঠিক...।

সত্য—ঊর্মি?

স্বামী—[আঙুল দিয়ে স্ত্রীর দিকে দেখায়] আমার স্ত্রী! [তাকিয়ে থাকে স্ত্রীর দিকে, কি যেন বোঝে, কালোর মা টর্চ নিয়ে আসে] কালোর মা, এক গ্লাস জল আনো তো। বসুন নিরবধিবাবু। ঊর্মি, আর বোধহয় এগুলোর দরকার নেই। তুলে রাখ [বেল্টশুদ্ধ রিভলবারটা স্ত্রীর হাতে দেয়] দাঁড়িয়ে রইলেন কেন নিরবধিবাবু, বসুন? [দুজনেই দুটো চেয়ারে বসে] আপনিই কি—?

সত্য—সত্যপ্রিয় মুখার্জী।

স্বামী—না, আমি বলছি, আপনি ঊর্মিকে চিন্‌তেন? [স্ত্রী ভেতরের দরজার কাছে থমকে দাঁড়ায়। তারপর ভেতরে চলে যায়।]

সত্য—হ্যাঁ, ছোটবেলায় আলাপ। ওর বাবা আর আমার বাবাতে খুবই বন্ধুত্ব ছিল।

স্বামী—হ্যাঁ, তাই শুনেছি। তাই আপনার আত্মসমর্পণের ব্যাপারটা ঊর্মি ঠিক সহ্য করতে পারছিল না। আপনাকে পালিয়ে যেতে বলছিল তো বার-বার? বেচারা!

সত্য—কমলার মনটা বরাবরই একটু নরম কিনা!

স্বামী—হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়েছে। আর আপনি তো ছোটবেলা থেকে দেখছেন। বেশীই জানবেন। আচ্ছা, আপনি তো প্রথম জীবনে অ্যানারকিস্ট ছিলেন, না?

সত্য—আপনাদের রিপোর্টে তো সব কথাই আছে অরুণবাবু এবং ডিটেল-এই আছে। আবার কেন জিজ্ঞাসা করছেন?

স্বামী—নাঃ, সব কথা কি আর রিপোর্টে থাকে সত্যবাবু! থাকে না। কত কথা জানতে হবে এখন?

সত্য—তার মানে?

স্বামী—ঊর্মির মনটা সত্যিই নরম। আরেকবারও তো ওদের বাড়ি থেকে আপনার পালাবার ব্যবস্থা ঊর্মিই করে দিয়েছিল, তাই-না? [ভেতরের ঘর থেকে গুলির আওয়াজ আসে। কালোর মা জল নিয়ে এসেছিল, গ্লাস প'ড়ে যায় তার হাত থেকে। সত্য আর স্বামী ভেতরে ছুটে যায়। কালোর মা দরজার কাছে গিয়ে কি দেখে চীৎকার করে মুখ ঢেকে ফেলে। একটু পরে স্বামী ও সত্য বেরিয়ে আসে।]

স্বামী—কালোর মা, রাম সিংকে বল ডাক্তারবাবুকে যেন খবর দেয়। খুলি উড়ে গেলে কেউ বাঁচে না তবু ডাক্তারকে তো খবর দিতেই হবে। [কালোর মা চলে যায়। বাইরে অনেক পায়ের শব্দ আর গুঞ্জন শোনা যায়, দরজার কাছে এগিয়ে গিয়ে স্বামী বলে।]

স্বামী—না, ভেতরে আসতে হবে না কাউকে! যান চলে যান সবাই। মহাদেব. বাগানের এদিকে কেউ যেন না আসে। বসুন সত্যবাবু!

সত্য—অ্যাঁ? হ্যাঁ।

স্বামী—কিন্তু কেন? কেন ও একাজ করলো? এত তাড়া করলো কেন? আমি আপনাকে তো ছেড়েই দিতাম।

সত্য—বসুন অরুণবাবু, একটা গল্প বলি আপনাকে। হ্যাঁ গল্পই। আজ এটা গল্প। যে গল্প আপনার রিপোর্টে নেই সেই গল্প।

[স্বামী একটা চেয়ারে বসতে থাকে। সত্য কিছু বলতে শুরু করে। আস্তে আস্তে পর্দাও নেমে আসে।]

ইঁদুর

॥ চরিত্রলিপি ॥

ডাক্তার অমল চৌধুরী

জগন্নাথ (চাকর)

জনৈক ভদ্রলোক

হালিম

হরি

১ম ভদ্রলোক

২য় ভদ্রলোক

শিবানী

ডাক্তারের মা

বস্তিবাসী আরও অনেক লোক

[ডাক্তারের বাড়ির একতলায় ডাক্তারের চেম্বার। সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার অমল চৌধুরী। প্রতিপত্তি হয়েছে, পয়সা হয়েছে, আর বয়সও হয়েছে কিছু। এক-জন রোগীর প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন, সে চলে গেল। স্লিপগুলো দেখলেন। বেয়ারা জগন্নাথ পেছনে এসে দাঁড়াল।]

ডাক্তার—আর ক'জন আছে রে?

বেয়ারা—তা জনা চারেক।

ডাঃ—কাল আসতে বল্ সবাইকে, শরীরটা ভাল নেই। ভাল লাগছে না।

[বেয়ারা বেরিয়ে যায়। ডাক্তার উঠে দাঁড়ায়। ড্রয়ার থেকে টাকা বের করে। অনেক টাকা। বেয়ারা ফিরে আসে।]

বেঃ—সেই ছবিওয়ালা এসেছে।

ডাঃ—কে?

বেঃ—সেই সে বৌদিমণির ছবি করবে বলে নিয়ে গিয়েছিল।

ডাঃ—ওঃ। তা ছবি নিয়ে এসেছে?

বেঃ—এ'জ্ঞে। হ্যাঁ।

ডাঃ—আসতে বল্।

[বেয়ারা বেরিয়ে যায়। ডাক্তার টাকাগুলো পকেটে রাখে। বেয়ারা ও ভদ্রলোক ঢোকে। একটা বেশ বড় সাইজের অয়েল পেন্টিং ভালো করে প্যাক করা। বেয়ারা বয়ে নিয়ে আসে। রাখে। আবার যেদিক দিয়ে এসেছিল সেদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়।]

ভদ্রলোক—নমস্কার স্যার। আপনার অয়েল পেন্টিংটা।

ডাঃ—বিলটা?

ভদ্রঃ—এই যে সার!

ডাঃ—[বিলটা দেখে] প্রসাদবাবুকে বলবেন কাল পাঠিয়ে দেব।

ভদ্রঃ—একবার দেখবেন না স্যার? প্রসাদবাবু নিজে আসতে পারলেন না বলে আপনাকে বার বার বলতে বলে দিয়েছেন! ছবিখানা একবার দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন প্রসাদবাবুর হাত।

ডাঃ—অত বড় আর্টিস্ট, ভাল হাত তো হবেই!

ভদ্রঃ—খুলে দেব স্যার, দেখবেন? আপনার মনে হবে উনি যেন জীবন্ত হ'য়ে আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

ডাঃ—আমার সময় হ'লেই আমি দেখব।

ভদ্রঃ—না, মানে কি জানেন! অতীতটা মানে যে অতীতটাকে মানুষ ভালবাসে, তাকে তো চায়, ভুলতে তো চায় না মানুষে!

ডাঃ—এ্যাঁ? না, সব সময় তা হয় না!

ভদ্রঃ—হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্ষেত্রবিশেষে তা হয় না। এই ধরুন না—সব সময় মানুষ কিছু অতীত ধরে বসে থাকতে পারে না। বিশেষ করে,—যারা কর্মবীর, যাদের—

[বেয়ারা এসে ঢোকে, ডাক্তার তাড়াতাড়ি—]

ডাঃ—কি জগন্নাথ?

জগঃ—বাবু একজন মেয়েছেলে—বলছে আপনার সঙ্গে তার ভারী দরকার।

ডাঃ—দরকার?

জগঃ—আমি অনেকবার বললাম যে আজ আর তিনি—।

ডাঃ—নিয়ে এস। [ভদ্রলোককে] আপনি তাহলে আসুন!

ভদ্র—[উঠে] আচ্ছা তাহলে প্রসাদবাবুকে তাই-ই বলব যে আপনার খুব পছন্দ হয়েছে—আচ্ছা নমস্কার।

ডাঃ—নমস্কার!

[একটি গরীব স্ত্রীলোক চাকরের সঙ্গে ঢোকে। ঘোমটা দেওয়া, আজকালকার তুলনায় ঘোমটাটা একটু বেশী মনে হয়। স্ত্রীলোকের পরনে কালো শাড়ি। বেয়ারা আবার বাইরের দিকে চলে যায়। ডাক্তার একটু ইতস্তত করে বলে]

ডাঃ—বসুন ঐ চেয়ারটায়।

[স্ত্রীলোকটি বসে না]

ডাঃ—কি, কি দরকার আপনার?

[স্ত্রীলোকটি এবার ঘোমটাটি খানিকটা তুলে দেয়।]

ডাঃ—কে কে তুমি?

স্ত্রী—ভাল করে দেখ।

ডাঃ—তুমি!! কোথা থেকে এলে তুমি? একি দশা হয়েছে তোমার? কি করে তোমার এ অবস্থা হ'ল?

[ক্লান্ত স্ত্রীলোকটি একটু হাসবার চেষ্টা করে]

স্ত্রী—এর চেয়েও খারাপ অবস্থার লোক আছে!

ডাঃ—বোস বোস। ভাল করে তোমার দিকে দেখতে দাও!

[এইবার স্ত্রীলোকটি একটা চেয়ারে বসে]

ডাঃ—কি করে, কি করে তোমার এই অবস্থা হল—আমি বুঝতে পারছি না। কেন কেন তুমি এমন করে নিজের ক্ষতি করলে?

স্ত্রী—ওই হয়! আর তাছাড়া আমি করলাম কে বললে? তুমি কেমন আছ?

ডাঃ—দেখতেই পাচ্ছ বেশ ভালো আছি। তা তোমার ক্ষতি তুমি করলে না তো কে করলে? কেন তুমি তখন বিয়ে করতে রাজী হ'লে না? কেন তুমি—

স্ত্রী—আঃ থাক্, আমি তোমার কাছে এসেছিলাম একটা দরকার!

ডাঃ—এড়াতে চাচ্ছ? কিন্তু না, আজ তোমাকে বলতেই হবে। কেন সেদিন তুমি বাড়িতে ছিলে না! কেন ঠিকানা না জানিয়ে বাইরে চলে গিয়েছিলে! কেন?

স্ত্রী—আমার দরকারটা শুনবে না?

ডাঃ—শুনব, নিশ্চয় শুনব। কিন্তু তুমি কথা দাও আমাকে বলবে সব। কথা দাও।

স্ত্রী—সে গল্প শুনে এখন কি হবে?

ডাঃ—গল্প?

স্ত্রী—তবে কি ইতিহাস?

ডাঃ—উঁ?, হ্যাঁ তাই। আমাকে জানতে হবে কোন্ ঐতিহাসিক কারণে আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরে আমি বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে বিলেত-ফেরত ডাক্তার হলাম,—আর, কোন ভাগ্যের চাকার জন্যে আজ, এই রাত্তিরে অসম্ভব দারিদ্র্যের চিহ্ন বহন করে তুমি আমার কাছে এসেছ একটা 'দরকারে'। কেন?

স্ত্রী—তুমি যে বড়লোক! তুমি যে ডাক্তার।

ডাঃ—ওঃ। কিন্তু বুঝতে পারছি না তোমার কথা, বড়লোক বলে এসেছ না ডাক্তার বলে?

স্ত্রী—বড়লোক বলেও, আবার বলতে পার ডাক্তার বলেও।

ডাঃ—এখনও সেই হেঁয়ালি ক'রে কথা বলবার স্বভাবটি তো যায়নি!

স্ত্রী—[একটু হেসে] কথায় বলে না, স্বভাব যায় না মলে।

ডাঃ—ওঃ, তাহলে তোমার স্বভাবের তলায় জীবনের ইতিহাস চাপা পড়ল! বেশ বল, কেন এসেছ তাই বল!

[স্ত্রীলোকটি কি বলবে কি দিয়ে শুরু করবে যেন বুঝতে পারে না। একটা অসহায়ত্ব পেয়ে বসে তাকে]

ডাঃ—আজ পনের বছর পরে এসেও তোমার যখন আমার সম্পর্কে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করবার ইচ্ছা হ'ল না, বা তোমার—

স্ত্রী—বাঃ, তোমার কথা ত মাঝে মাঝে কাগজেই দেখতে পাই।

ডাঃ—কাগজে পড়?

স্ত্রী—হ্যাঁ যেদিন পাই। কিনতে তো পারি না। এত বাজে খবর দেয়। তার চেয়ে তোমার কথা আর একটু বেশী করে দিলেই পারত।

ডাঃ—তার মানে বেশ খুঁটিয়েই কাগজ পড় আজকাল তাহলে? আমার খবর তো কাগজের এমন জায়গায় থাকে না যে খুললেই চোখে পড়বে!

স্ত্রী—সেই জন্যেই তো খুঁটিয়ে পড়ি! কিছুদিন আগে তোমার হাসপাতাল

প্রতিষ্ঠার খবর পড়লাম। মাসীমা মানে তোমার মায়ের নাম কি উমা-সুন্দরী ছিল?

ডাঃ—না, আমার শাশুড়ীর নামেই হাসপাতালটা হয়েছে। উমাসুন্দরী আমার শাশুড়ীর নাম।

স্ত্রী—ওঃ, উনি মারা গেছেন নাকি? চমৎকার দেখতে ছিলেন না?

ডাঃ—তার মানে? তুমি তাঁকে দেখেছ? তুমি তাঁকে চিনতে?

স্ত্রী—[ত্রস্তে] বাঃরে, আমি তাঁকে কি করে চিনব! হ্যাঁ, আমি যে জন্য এসে-ছিলাম!—আমি—

ডাঃ—দাঁড়াও! তবে তুমি কি করে জানলে যে তিনি চমৎকার দেখতে ছিলেন?

স্ত্রী—কেন? কাগজে ছবি বেরিয়েছিল যে!

ডাঃ—ছবি? কোন কাগজে?

স্ত্রী—কি জানি! প্রা-য় একবছর আগের কথা! এতদিন বাদে কি তা মনে থাকে? তাছাড়া আজ এর কাছ থেকে কাল ওর কাছ থেকে কাগজ চেয়ে পড়ি! সকলে তো আর এক কাগজ রাখে না!

ডাঃ—কিন্তু নাঃ। কোন কাগজের লোক তো ছবি নিয়ে গেছে, বা তাদের ছবি পাঠান হয়েছে বলে মনে পড়ছে না!

স্ত্রী—তোমার মনে নেই হয়তো।

ডাঃ—তুমি মিথ্যে বলছ, ছবি তুমি দেখনি।

স্ত্রী—তাই হবে!

ডাঃ—ঠিক আর একদিন যেমন চিঠি লিখেছিলে!

স্ত্রী—কোন্ চিঠি?

ডাঃ—সেই কলকাতা থেকে পালিয়ে গিয়ে, যে টাকার তোমার খুব দরকার তাই—

স্ত্রী—(একটু যেন আনন্দ) সে চিঠি তুমি বিশ্বাস করনি?

ডাঃ—না করিনি, করতে পারিনি! লোক চিনতে অত ভুল করি না আমি। আর আমি যে ভুল করিনি তার প্রমাণ আজকের তোমার এই অবস্থা। টাকার জন্যেই যদি আমাকে বাতিল করেছিলে তাহলে আজ তোমার এই অবস্থা কেন?

স্ত্রী—ভাগ্যে হ'ল না যে!

ডাঃ—কেন, কেন ভাগ্যে হ'ল না? সে কথা জানবারই তো কৌতূহল আমার। বল—কেন হ'ল না?

স্ত্রী—পুরো পনের বছরের ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার বলতে গেলেও যে রাত পুইয়ে যাবে।

ডাঃ—বেশ তো—পোহাক।

স্ত্রী—খুব সাহস যে! কিন্তু না ওসব বাজে কথা ছাড়ো। হ্যাঁ শোন—আমাকে কিছু টাকা দিতে পার?

ডাঃ—টাকা? তুমি কি টাকার জন্যে আমার কাছে এসেছ?

স্ত্রী—[হেসে] তবে কি এতদিন পরে তোমার ভরা সংসার ভাঙতে এসেছি।

ডাঃ—ঠাট্টা কোর না।

স্ত্রী—তুমি আমার কথা মন দিয়ে শুনছ না কেন? বললুম না তুমি বড়োলোক বলে তোমার কাছে এসেছি!

ডাঃ—ওঃ। কত টাকার দরকার?

স্ত্রী—কত? এই—এই একশো।

ডাঃ—কোথায় থাক তুমি?

স্ত্রী—টাকা দেবে না? [হাসে] আমার কিন্তু খুব দরকার। না হ'লে ভীষণ বিপদে পড়তে হবে।

ডাঃ—টাকাটা ফেরত দেবার জন্যে কোন্ ঠিকানায় তাগাদা করব?

স্ত্রী—তুমি নিজে যাবে তাগাদা করতে?

ডাঃ—যাব।

স্ত্রী—সর্বনাশ!

ডাঃ—কেন?

স্ত্রী—লোকে তোমার দুর্নাম করতে পারে!

ডাঃ—কেন?

স্ত্রী—আমার যে দুর্নাম আছে গো!

ডাঃ—শিবানী!!

স্ত্রী—না পারুল। আমার নাম এখন পারুল।

ডাঃ—কি হেঁয়ালি করে কথা বলছ শিবানী? যারা জোচ্চোর তাদের নাম পাল্টাবার দরকার হয়, কিন্তু—

শি—বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে না? সত্যি তাই। আমার বৃত্তির সঙ্গে শিবানী নামটা নিজের কানেই বড় বাজতে লাগল তাই—

ডাঃ—শিবানী!

শি—টাকাটা একেবারে দিয়ে দিতে পার না? একেবারে? ধারের জন্যে তোমাব কাছে আসিনি। আমি বড় ক্লান্ত। আমাকে খুব তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যেতে হবে।

ডাঃ—কোথায়, তোমার বাড়িতে?

শি—বাড়ি আমার নেই। একটা ঘর ছিল সেটাও আজ—

ডাঃ—কি? সেটাও আজ?

শি—ছেড়ে দেব কিনা ভাবছি।

ডাঃ—ভাড়া বাকী পড়েছে?

শি—উঁ? হ্যাঁ।

ডাঃ—আচ্ছা একটা কথার জবাব দাও। এরকম টাকার দরকার তোমার নিশ্চয়ই আরও হয়েছে—এবং টাকা দেবার লোকও নিশ্চয়ই ছিল। তাহলে আজকে এক যুগ পরে আমার কাছে আসবার দরকার পড়ল কেন?

শি—আজ আর কেউই নেই যে। আজ বিপদে প'ড়ে যখন মনের মধ্যে হাতড়াতে লাগলাম তখন দেখলাম তুমি ছাড়া আর আমার কেউই নেই।

ডাঃ—বিয়ে করনি তুমি?

শি—হয়ে উঠল না।

ডাঃ—বুঝতে পারছি সেই চাকরি তোমার নেই। তোমার সংসারে এখন কে কে আছে?

শি—সংসার? একা একা সংসার হয় নাকি?

ডাঃ—তোমার বোনেরা? ছোট ভাই?

শি—জানি না। ভালই আছে বোধহয়।

ডাঃ—তার মানে তারা তোমার কোন খোঁজ নেয় না? তাদের না তুমি মানুষ করেছিলে?

শি—কিন্তু তারা যে জেনে ফেলল তাদের মানুষ করবার জন্যে আমাকে চরিত্রভ্রষ্ট হতে হয়েছে।

ডাঃ—ভাল মানুষ হয়েছে তারা!

শি—হ্যাঁ, ওরা ভালো মানুষ। কোনরকম ঝামেলা বহন করবার ক্ষমতাও ওদের নেই।

ডাঃ—কিন্তু তারপর? তারপর কি করলে?

শি—ডাক্তারী পড়েছিলে না ওকালতী?

ডাঃ—বলবে না?

শি—শুনবে? —তারপর —তারপর —দেখলাম মনের কতকগুলো সংস্কার কাটিয়ে ফেললে এই কলকাতা শহরে স্ত্রীলোকের খাওয়া-পরায় কোন কষ্ট হয় না। অন্তত প্রথমটায়। প্রথমে জোটে অ্যাড্‌মায়ারার, তারপর মালিক, তারপর অনেক মালিক—তারপর—

ডাঃ—চুপ কর।

শি—এই দেখ, তুমিই তো জানতে চাইলে।

ডাঃ—কি তোমাকে বলব বুঝতে পারছিনে। কিন্তু শিবানী, এর জন্যে তুমি নিজেই কি দায়ী নও? কেন তুমি আমাকে সেদিন ফিরিয়ে দিলে? না হলে আজ এই সংসার তো তোমারই হবার কথা?

শি—নাঃ। সে তাহলে হয়তো সেই গরীব ছোট্ট, হয়তো সরকারী ডাক্তারের সংসার হ'ত। বড়লোক বিলেত-ফেরত ডাক্তারের হ'ত না ত!

ডাঃ—ওঃ। তাহলে সত্যি!

শি—কি সত্যি ?

ডাঃ—আমার টাকা ছিল না বলে তোমার মন ওঠেনি। গরীব হবু ডাক্তারকে ভালবাসতে পারনি।

শি—ভালবাসতে পারিনি ?

ডাঃ—হেঁয়ালি কোর না। আমি জানি তোমার অভিভাবক তুমি নিজে ছিলে। আর আমি জানি যে তোমার দিক থেকে কোন বাধা ছিল না। তাহলে ? স্বীকার কর যে তোমার মনে দ্বিধা ছিল। সেটা কি সেই টাকার জন্যেই ?

শি—টাকার পেছনেই তো এতদিন ছুটে বেড়ালাম।

ডাঃ—অথচ আজ তোমার এই অবস্থা। এর দায়িত্ব কি সম্পূর্ণ তোমারই নয় ?

শি—আমি কি একবারও বলেছি যে আমার এই অবস্থার জন্যে আমি দুঃখিত ?

ডাঃ—তুমি দুঃখিত নও ?

শি—না।

ডাঃ—তোমার বিবেক নেই ? যে জীবন-যাপন করছ তুমি—তোমার অনুতাপ হয় না ?

শি—তুমি কি ক্রিশ্চিয়ানিটি প্রিচ করছ ? আমাদের বস্তিতে মাঝে মাঝে ওরা এইরকম সব কথা বলতে আসে।

ডাঃ—তুমি কি বস্তিতে থাক ? তুমি কি—

শি—বস্তির বেশ্যা।

ডাঃ—শিবানী!!...তবু তুমি বলবে, তুমি দুঃখিত নও।

শি—না নই!

ডাঃ—তুমি নির্লজ্জ।

শি—লজ্জা ভদ্র স্ত্রীলোকের ভূষণ—বেশ্যার নয়! ওটা তোমার স্ত্রীর জন্যেই তোলা থাক। বেশ্যার লজ্জা করলে চলে না! আচ্ছা যা-ই! [উঠে দাঁড়ায়]

ডাঃ—দাঁড়াও! টাকা নেবে না!

শি—[গলাটা খুব ক্লান্ত আর পাতলা শোনায়] না থাক।

ডাঃ—একটা কথা জেনে রেখো বাণী, ভদ্রলোকের স্ত্রীদের বিদ্রূপ করলেই তোমার গৌরব কিছু বাড়ে না বা অপরাধের পরিমাণ কম হ'য়ে যায় না।

শি—অপরাধ ? তুমি—তুমিও আজ এই কথা বলবে ? অথচ জান কি—যে তোমার জন্যে—

ডাঃ—নিজেকে দেবদাসের মেয়ে সংস্করণ তৈরী করলে ?

শি—কথাটা মন্দ বলনি। দেবদাসের মেয়ে সংস্করণ! [একটু আনমনা হ'য়ে যায়] দেবদাস, শ্রীকান্ত, ঘরেবাইরে, আরও কত—একদিন আমিও পড়েছিলাম না ? [হাসে] আমি ত খবর রাখি না। তুমি কি এমন কোন শরৎচন্দ্রের কথা জান—যিনি দেবদাসীর গল্প লিখবেন বা লিখতে পারেন ?

ডাঃ—[একটু অভিভূত] বাণী, তোমাকে আমি আঘাত করতে চাইনি।

শি—[আনমনা ভাবেই] কেন চাওনি ? ভালই তো !! তবু তো মনে পড়ে গেল ! আমি তো শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সব ভুলেই গিয়েছিলাম। ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছ ! বই কিনে নিয়ে গেলে হত। সে দেশে হয়ত পাওয়া যাবে না।

ডাঃ—কেন তুমি কোন্ দেশে যাচ্ছ ?

শি—আচ্ছা এত রাত্রে কি বইয়ের দোকান খোলা থাকে ?

ডাঃ—[একটা চেয়ার শিবানীর দিকে ঠেলে দেয়] শিবানী, বোস। আমার মনে হচ্ছে তুমি প্রকৃতিস্থ নও।

শি—[মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে—সমস্ত পৃথিবীর ওপর যেন অভিমান] না আমি প্রকৃতই সুস্থ ! আমি যেখানে থাকি সেখানে আমি বেমানান নই। আমি যেখানে যাব সেখানে আমি বেমানান হব না। তোমাদের কথায় আমার কিবা এসে যায় —আচ্ছা ডাক্তার সাহেব চলি !

ডাঃ—না দাঁড়াও ! টাকা নিয়ে যাও।

শি—থাক দরকার নেই।

ডাঃ—কিন্তু সেই জন্যেই কি তুমি আসনি ?

শি—না—সবটাই তাই নয় ! ওই কথাই তোমাকে বলা সহজ ছিল তাই বলেছি।

ডাঃ—তবে কি জন্যে এসেছিলে ? বল। না বলে তুমি এখান থেকে যেতে পারবে না। বল।

শি—তোমাকে দেখবার দরকার ছিল। [একটু তিক্ত হাসি আসে মুখে] আমার পক্ষে দরকার ছিল। দেবদাসের যেমন মরবার আগে পার্বতীকে একটিবার দেখবার দরকার পড়েছিল, সেই রকম আর কি ! দেখা গেল দেবদাস বেচারা আমার চেয়েও দুর্ভাগা।

ডাঃ—তুমি কি মরতে যাচ্ছ ?

শি—বালাই ষাট ! আমি মরতে যাব কোন দুঃখে। ঠাট্টা বোঝ না ? দেবদাসের কথা তুমি তুললে ; শুনতে ভাল লাগবে বলে বললাম কথাগুলো।

ডাঃ—কিন্তু কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

শি—তোমার তা জেনে তো কোন দরকার নেই। যাবার আগে একটা চেনা লোককে—একটা ভাল লোককে দেখতে এসেছিলাম—তা আমার ভুল ভাঙল। এবার তোমার ভুলটা ভেঙে দিয়ে যাই।

ডাঃ—ভুল ?

শি—হ্যাঁ ! আমার কথা মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে আমাকে মেয়ে দেবদাস বলে বিদ্রূপ করলে তুমি। এবং তার পরেই দেখলাম আমার জন্যে তুমি করুণা অনুভব করলে। ভাবতে একটু ভাল লাগল, না ?—যে, তোমারই কথা ভেবে ভেবে একজনের এমন অবস্থা হয়েছে ! কিন্তু তুমি ভুল করলে। আমি বলতে চাচ্ছি যে আমার এই অবস্থার জন্য দায়ী তুমি—

ডাঃ—আমি? কি করে?

শি—তুমি এবং তোমার সংসার।

ডাঃ—আমার সংসার? তার মানে?

শি—মানে?—তুমি দায়ী এই জন্যে যে—আমি কলকাতা ছাড়বার তিনমাসের মধ্যে বিয়ে তো করলে তুমি!

ডাঃ—কিন্তু তুমি তো নিজেই সেই জন্যে দায়ী—

শি—আর তোমার সংসার দায়ী এই জন্যে যে—থাক, তোমার শাশুড়ী বেঁচে নেই, তোমার স্ত্রীকেই জিজ্ঞাসা কোর।

ডাঃ—স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করবার সুবিধা হবে না। তুমিই বল।

শি—জিজ্ঞাসা কোর, আর যদি তাদের সত্যি কথা বলবার সাহস থাকে--তাহলে তারা বলবে যে—আমারই দয়ায় তোমার এবং শীলাদেবীর এই সুখের সংসার! আর আমাকেই ব্যঙ্গ করছ তুমি! আর যে জন্যেই এসে থাকি তোমার বিদ্রূপ—! অবশ্য এও জানি ব্যঙ্গ করাটা খুব সহজ—খুব সহজ।

ডাঃ—আমি কিছু বুঝতে পারছি না! তোমার দয়ায় মানে? স্পষ্ট করে কথা বল। আমার স্ত্রীকেই কি তুমি ব্যঙ্গ করছ না?

শিঃ—তুমি করালে কেন? কিন্তু এক্ষুনি আমার সবাইকে ব্যঙ্গ করতে ইচ্ছে করছে—তোমাদের মত যত ভালমানুষ সুখী মানুষ আছে, সবাইকে! আ-হা-হা—সেদিন আমার কাছে গিয়ে খুকুমণির কি কান্না!

ডাঃ—আমার স্ত্রীকে তুমি চেন!

শি—হাড়ে হাড়ে চিনি।

ডাঃ—(উত্তেজনায়) বোস,—কবে, কবে আমার স্ত্রী তোমার কাছে গিয়েছিল? কাঁদতে? কেন সে যাবে তোমার কাছে? সত্যি কথা বল।

শি—তোমাকে ভিক্ষে চাইতে গো!

ডাঃ—ভিক্ষে চাইতে? তার মানে? রাবিশ!

শি—হ্যাঁ গো হ্যাঁ! তখন তো আমার সাথে ভেসে যেতেও পারতে? নাকি! ওদিকে শীলা, সেও তোমার সাথেই ভাসতে চায়। তাই সমস্যার সমাধান হল। আমি চাকুরে মেয়ে, শক্ত মেয়ে, এ পৃথিবীতে আমি বাঁচতে পারব। কিন্তু সে যে তোমাকে না পেলে মরে যেতো গো। মেয়ে যত কাঁদে মা তত বোঝায়। ভারতের মেয়েদের ঐতিহ্য। ত্যাগের মাহাত্ম্য। তার মধ্যে আবার এক উকিলের চিঠি! ওঃ!

ডাঃ—উকিলের চিঠি?

শি—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তোমাব মায়ের চিঠি। বুঝতে পারলে না? তোমার ভাবী-বো-এর পক্ষে ওকালতী করে লেখা। আজ মনে পড়ে চিঠির শেষ দুটো লাইন। "অমলের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা কোর। ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন।" তিন দিক থেকে আক্রমণ! আর আমি একেবারে

ভূপাতিত!' হিঃ হিঃ হিঃ [হাসতে থাকে]।

ডাঃ—আমি বিশ্বাস করতে পারছি না! এ অসম্ভব! এতদিনের মধ্যেও তাহলে আমি—না—এ—এসব কথা বলার মানে কি? কি মতলবে তুমি এসেছ?

শি—একটা ওষুধ দিতে পার? ওষুধ?

ডাঃ—ওষুধ? কিসের ওষুধ?

শি—ছেলে নষ্ট করার ওষুধ?

ডাঃ—সেইজন্যে তুমি আমার কাছে এসেছিলে? ছিঃ ছিঃ।

শি—[ইচ্ছে করে আঘাত করার জন্যেই যেন] আমার কিন্তু খুব খারাপ রোগ আছে! ছেলেটা বিকলাঙ্গ হ'য়ে জন্মাতে পারে ত?

ডাঃ—[প্রচণ্ড চাপা রাগে] আমি ওসব নোংরা কাজ করি না, চলে যাও এখান থেকে!

শি—ছেলেটা জন্মালে,—সমাজের পক্ষে সেটা একটা নোংরা জিনিস হবে না?

ডাঃ—আমি জানি না!

শি—জান না কি গো? সমাজের জন্যে কত ভাল ভাল কাজ করে বেড়াও। কাগজে নাম বেরোয়। আসলে ঠিক কোন্ জিনিসটি করলে সমাজের ভাল হবে, তা জান না?

ডাঃ—তোমার কাছ থেকে শেখবার ইচ্ছে নেই। তুমি যাও।

শি—[ব্যঙ্গে] সমাজে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত ব্যক্তির বে-আইনী কাজ করতে ভয় করছে?

ডাঃ——তোমার স্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমারই ভুল হয়েছে, পনেরো বছরের আগের চোখ দিয়ে তোমাকে দেখতে গিয়েছিলাম। যে জীবন তুমি যাপন করে এসেছ তাতে এই বদলই তো তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। তোমাকে এতটা প্রশ্রয়—

শি—ঠিক ঠিক! ঐ একই ভুল আমিও করলাম। [হাসে] আজ সকালে ভগবানকে বলেছিলাম—হে ভগবান, যাবার আগে, তোমার অপূর্ব সৃষ্টি এই মানুষ, তা আমাকে একটা আস্ত পুরুষ মানুষ দেখাও। তা ভগবান সারাজীবন ধরে হয় আমাকে পাজী মানুষ দেখাল নয় আমাকে [ব্যঙ্গে] ভাল মানুষ দেখাল, পুরুষ মানুষ দেখালে না গো!

[একটু দূরে একটা গোলমাল শোনা যায়, দুজনেই উৎকর্ণ হয়। গোলমাল কাছে এগিয়ে আসে। বেয়ারা ঢোকে]

বে—বাবু এই বস্তি থেকে একটা লোককে নিয়ে এসেছে—এখানে নিয়ে আসব?

ডাঃ—কেন কি হয়েছে?

বে—কি জানি বাবু—কে নাকি হাতুড়ী না কি দিয়ে মাথায় মেরেছে, ভদ্রলোকের আর রা বেরুচ্ছে না।

ডাঃ—খুব রক্ত পড়েছে?

বে—নাঃ, রক্ত তো দেখলাম না?

ডাঃ—ভদ্রলোক? পাশের ঘরে রাখ। কারা নিয়ে এসেছে? সব জিনিস তৈরী কর।

[বাইরে আওয়াজ আরও বেড়ে উঠেছে। লোকগুলো যেন এই ঘরে ঢুকে পড়তে চায়। শিবানীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে। বেয়ারা বাইরে যায়]

শি—(ভয়ে) ওদের কি তুমি এইখানে ডাকবে নাকি?

ডাঃ—হ্যাঁ।—কেন?

শি—আমি তাহলে এই ভেতর দিকে গিয়ে অপেক্ষা করব?

ডাঃ—কেন? তুমি চলে যেতে পার অনায়াসে!

শি—ওরা চলে যাবার পর আমি যাব! এইটুকু দয়া কর!

ডাঃ—(একটু ভাবে) বেশ। ঐ বারান্দাটায় যাও।

[শিবানী চলে যায়—পাশের ঘরে গোলমালের আওয়াজ। ডাক্তার পাশের ঘরে চলে যায়। একটু পরেই ফিরে আসে। সঙ্গে কয়েক জন লোক, বস্তিরও দুচারজন আছে, আবার পাড়ার ভদ্রলোকও দুএকজন আছেন। বস্তির লোকদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দু জাতই আছে। হিন্দি-বলিয়ে মুসলমানও আছে, আবার চব্বিশ পরগনার মুসলমানও আছে]।

১ম ভদ্র—প্রাণ নেই?

ডাঃ—নাঃ। এখানে মিছিমিছি আনলেন। পুলিসে খবর দিয়েছেন?

২য় ভদ্র—না তো, আমাদের মনে হয়েছিল প্রাণটা আছে, তাই তাড়াতাড়ি আপনার এখানেই নিয়ে এলাম।

ডাঃ—পুলিসে খবব দিন আগে। জগন্নাথ, ঐ পাশের ঘরের ফোনটা দেখিয়ে দাও। যান, একজন ফোন কবে দিন! [২য় ভদ্রলোক বেরিয়ে যায়] কিন্তু কি করে হল?

বস্তির হালিম—ওয় বাবু বহুত জুলুমবাজ থা। হামনে কয় দফে মানা কিয়া থা! তো—

বস্তির হরি—তা বাপু বস্তির সব লোক তো সমান না, অনেকে যে আবার তারে নাইও দিত!

১ম ভদ্র—যাঃ যাঃ তোদের বস্তির কথা আর বলিসনি! ঐ মেয়েটাকে একা একা বস্তির মধ্যে তোরা থাকতেই বা দিলি কেন? তোদের—

হালিম—নেহি বাবু ওয় অওরত খারাব নেহি থী।

১ম ভদ্র—না। সতীলক্ষ্মী ছিল। খারাব নেহি থী। তাহলে, তার পেছনে লোক ঘুরবেই বা কেন রে?

ডাঃ—ওঃ স্ত্রীলোক ঘটিত ব্যাপার!

১ম ভদ্র—স্ত্রীলোক ঘটিত এবং মনে হচ্ছে স্ত্রীলোক দ্বারা সংঘটিত। [নিজেই

হেসে ওঠে, রসিকতা করেছে ভেবে]

ডাঃ—[কৌতূহলী] আপনি বলছেন সেই স্ত্রীলোকটিই খুন করেছে ?

১ম ভদ্র— আমার তো তাই মনে হয়। বলেন কেন, যত ছোটলোকের কারবার। একটা একেবারেই থার্ড ক্লাস বেশ্যা—আর এই পলাশ বড়োলোকের ছেলে। —সুতরাং—

হালিম—নেহি বাবু ওয় অওরত এ্যায়সা—

হরি—তা বললে কি হবে হালিম ভাই! আগে ওর বদনাম ছিল, খুবই ছিল।

খালেক—কিন্তু এখানে এসে ইস্তক কেউ তারে ঠিক—তাছাড়া আমাদের ছেলে-মেয়েদের অ আ ক খ শিকোচ্ছিল।

হরি—তা শিকোচ্ছিল!

১ম ভদ্র—দেখেছেন এরা to the point কথা বলতে জানে না! খুব তো ভাল ভাল কচ্ছিস, তা পাকিস্থানে পালাবার মতলব কচ্ছিল কেন রে! বুঝলেন ডাক্তারবাবু দিস ইজ প্রি প্ল্যানড। আমি শুনলুম আজই এক মুসলমানের সঙ্গে পাকিস্থানে পালাবার মতলব করেছিল। হয়ত এতক্ষণ ভেগেই পড়েছে!

ডাঃ—কে ? যে এই পলাশ চৌধুরীকে খুন করেছে বলে ভাবছেন ?

১ম ভদ্র—ভাববাব আর অবকাশ নেই ডাক্তারবাবু। সেই মা—মানে সেই নটোরিয়াস স্ত্রীলোকটিই খুন করেছে। ভেবেছিল বোধহয়, কিছু টাকা পয়সা হাতিয়ে পালাবে!

ডাঃ—ওঁর পকেট থেকে টাকা পয়সা গেছে দেখেছেন নাকি ?

১ম ভদ্র—না, না আমি কেন দেখতে যাব! না হলে আর উদ্দেশ্য কি হতে পারে বলুন!

ডাঃ—যাকগে, উদ্দেশ্যের কথা পুলিস ভাববে, আমাদের ভাববার দরকার নেই। কিন্তু ভাবছি—একটা স্ত্রীলোকের গায়ে এত জোর এল কোথা থেকে। অবশ্য যদি—

হালিম—হমনে ভি ইয়েহি শোচতা থা কি ক্যায়সে—

হরি—আর পারুল তো রোগা মেয়েমানুষ বললেই হয়।

ডাঃ—কি নাম বললে ?

সকলে—পারুল।

(ডাক্তার নিজেকে সংযত করে)

হালিম—ওয় অচ্ছি লড়কী থি ডগ্দর সাব। মুঝে এ্যায়সা ম্যালুম হোতা কি মজবুরী সে ওয় ইয়ে কাম কিয়ি হোগী।

ডাঃ—ওঃ। তা কতদিন আগে এ তোমাদের বস্তিতে এসেছিল ?

হরি—তা মাস পাঁচ ছয় হবে। আমাদের এখানে এসে কিন্তু উনি ভালই ছিল।

ডাঃ—কোন্ জায়গা থেকে তোমাদের এখানে এল ?

হালিম—মুঝে বোলনে দিজিয়ে—কিঁউ কি অব তো পোলিস ইনস্পেক্টরজীসে সবহি নিকল যায়েগা! ম্যায় হি লেকর আয়াথা।

১ম ভদ্র—তুমি? তা মতলবটা কি ছিল বাবা?—

হালিম—মতলব এক অওরত কো বাঁচানেকি কৌশিশ কিয়া থা! হাঁ ডক্দর সাব, ওয় খারাব হি থী!

১ম ভদ্র—পথে এস বাবা।

হালিম—[একটু রেগে] মগর ওয় ভন্দর পলাশ বাবুসে কম খারাব থী।

ডাঃ—থাক ও কথা। তুমি ওকে তোমাদের বস্তিতে নিয়ে এলে কোথা থেকে?—

হালিম—দুসরা এক বস্তিসে! উধার কাম কে লিয়ে ম্যায় যাতা থা। মুঝে ওয় চাচা পুকারতিথী। এক রোজ বোলা, চাচা ম্যায় চয়ন সে মরনা চাহাতি! মুঝে বহত তাজ্জব লগা। ম্যায়নে কহা, মগোর বেটী মরনে সে পহলে তো বহত রোজ গুজরনে হোগা—পেট চলেগা ক্যায়সে? তো বলী—কাম করুংগী, কুছ ভী করুংগী—ইয়ে দোজখ সে মুঝে লে চল! উসকী আঁখ দেখ কর মুঝে এ্যায়সা লগা কি—

১ম ভদ্র—ওঃ ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির।

হালিম—বাবুজী!

ডাঃ—আঃ থামুন না মশাই। শুনতেই দিন না। তারপর?

হালিম—কেয়া বলুঁ ডগ্দরজী—ম্যায় উসে লে আয়া থা। ঠোংগা বনাতি থী, সুঁই কা কাম ভি করতি থী—কেয়া হরি ভাই বোলনা?

হরি—তা বাবু ঠিক! দিন রাত্তির কাজ করত।

ডাঃ—তা এই পলাশবাবু কোত্থেকে এল?

হরি—ঐ তো মুশকিল! আমাদের বস্তির কথা কি বলবো, লজ্জাও করে।

খালেক—আগে ছিল কি, মানে কসবীদের জন্যি আলাদা জাগা ছিল। তা গরমেণ্ট যেদিন ইস্তক ঐ বেআইনী করে দেল, তা দেখবেন আপনে সব বস্তিতেই দুটো এট্টা ওরম থেকেই গেল। কোতাও বেশী কোতাও কম! তা আমাদের এখানেও ঐ কাঞ্চনী বলে এট্টা মেয়ে, মানে খসম সাথে করেই এল —

হরি—কিন্তু দুদিন বাদেই বোঝলাম যে সে খসম আসলে ঐ আর কি! তা ঐ পলাশবাবু ওর কাছেই আসত যেত আর কি।

ডাঃ—তা তোমরা থাকতে দিলে কেন?

হালিম—কেয়া করেংগে ডগ্দর সাব। দুনিয়া এ্যায়সাহি হো গয়। কিসসে নফরত করু? হর বস্তিমে এ্যায়সা হ্যায়। অর ইসসে লেকর হি হমে চলনে পড়তা। কাঞ্চনীসে হমে কুছ্ নফরত নেহী থী! মগর হমনে মিটিং করকে তয়কিয়া থা কি ওয় পলাশ বাবুকা আনা বন্দ করনা হোগা।

হরি—আমাদের ভয় করত, কারণ ওনার হাতে যত এই পাড়ার ভন্দর গুন্ডো। তার ওপর ওনার নজর তো ইদিক উদিক চলতেইছে! তা আমাদেরও যেমন কপাল—।

হালিম—বীচমে ইয়ে হিন্দু মুসলমান ফ্যাসাদ শুরু হো গিয়া—তো হমে বহত দেমাগ ঠিক করনে পড়া। কি'উ কি—

হরি—তখন যদি হালিম ভাই পলাশবাবুরে ঠ্যাঙগাত তো হিন্দু মুসলমান দাঙগা বেধে যেতো। কেউ তো আর দেখত না তলিয়ে, কেন কি হচ্ছে।

ডাঃ—তা এই পলাশের নজর কি ঐ কি নাম বললে পারুলের ওপর পড়েছিল?

খালেক—তাই বাবু। পারুল আমাদের ক'দিন বলেছে কিন্তু—আমাদেরও তো অনেক বুঝে শুনে চলতে হয়। পলাশবাবুর সাথে ঝগড়া করলে বস্তি যে জ্বলে যেত বাবু।

ডাঃ—হুঁ!

হালিম—ফিরভি ম্যয় বোলতা হ্যায় ডগ্দর সাব ওয় লড়কী মজবুরী সে ইয়ে কাম কিয়ি হোগী। উসকি দিল অচ্ছি থী।

[এই সময় ২য় ভদ্রলোক ফিরে আসে]

২য় ভদ্র—ওঃ, একটা ফোন করতে ঘেমে গেলাম! পুলিস আসছে! কি বলছিলে বাবা? কার দিল্ অচ্ছি হ্যায়?

হরি—ঐ পরুলের কথা হচ্ছে। যিনি খুন করেছে।

২য় ভদ্র—ওঃ, খুন করলেও আজকাল অচ্ছি দিল্ থাকছে বুঝি?

হালিম—মগর ইয়েতো আপ মানেঙ্গে কি পলাশবাবু বহুত জুলুমবাজ থা। অওরত' কো পিছে পড়তা থা।

২য় ভদ্র—যদি সত্যি এব মধ্যে থেকে না থাকে, তবে আর বেশী বোল না বাছাধনেরা। তাহলে তোমাদেরও নিয়ে হাজতে পুরবে।

খালেক—আমরা কি জানি বলেন? আমরা তো মিলাদ শরিফ শুনতেছিলাম। গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনে আমার খালা ভাবলে পারুলের ঘরে গোঁ গোঁ আওয়াজ কিসের হচ্ছে, তাইতেই—।

হরি—আর আমি তো শুয়েই পড়েছিলাম। গোলমাল শুনে—মানে সকলে যা বলছে আমিও তাই বলছি আর কি। আমরা কি জানি।

ডাঃ—[হঠাৎ যেন একটু উত্তেজিত হ'য়ে] পুলিস কেস যখন হবে তখন তোমরা বলতে পারবে না যে মেয়েটি আসলে ভাল ছিল? মানে যা তোমরা মনে করতে তাই বলতে পারবে না? [ভদ্রলোক দুজন অবাক হ'য়ে তাকায়। সবাই চুপ]

হালিম—[ধীরে ধীরে] ওয় মুঝে চাচা পুকারতি থী, ম্যয় সচ্ বলুঙ্গা।

২য় ভদ্র—কিন্তু সে তো পাকিস্তানে হাওয়া।

ডাঃ—পুলিসে তো খবরই দিয়েছেন। পাকিস্তানে পালাবার আগে ধরাও তো পড়তে পারে। আর পাকিস্তানে পালাচ্ছে এটা তো আপনাদের অনুমান!

১ম ভদ্র—না মশাই—সবাই বলছে। কৈ হে সচ্ বলনেআলা, বল না।

হালিম—সচ্। পলাশবাবু যব বহ্‌ত জুলুম করনে লগা, তো একরোজ ওয় বলি থী কি মুঝে ফির ভাগনে পড়েগা চাচা—মগর কঁহা যাঁউ!

খালেক—তা জাঁহাগীর ছেলেডা ভাল ছিল। আর ওর ঘরও আসলে পাকিস্তানে। পারুলেরে ওর মনেও ধরেছিল। আমরা বললাম যে, তোমার যদি নিকে করতে মন যায়, তো কর—তা—।

১ম ভদ্র—দেখেছেন কাণ্ডটা! হিন্দুর মেয়ে হয়ে! ছিঃ ছিঃ, এই জন্যেই দেশটা উচ্ছন্নে গেল! হয় একটা হিন্দু আয়ুবখাঁ, তো এই নষ্ট মেয়েগুলোকে গুলি করে মারে।

ডাঃ—পাকিস্তানে নষ্ট মেয়েদের গুলি ক'রে মারা হয়েছে নাকি?

১ম ভদ্র—এ্যাঁ?

ডাঃ—আর তাছাড়া হিন্দু আয়ুবখাঁ যাকে হ'তে হবে, তাকে তো এই পলাশ-বাবুদের সাহায্যই নিতে হবে। তা এই পলাশবাবুরা কি এই সব নষ্ট মেয়ে মানুষদের মারতে দিতে রাজী হবেন?

২য় ভদ্র—কি জানি মশাই, আপনার বাঁকা বাঁকা কথা কিছু বুঝতে পারছি না। কিন্তু একটা হিন্দু মেয়ে মুসলমানকে নিকে করছে শুনলেও গায়ের মধ্যে বিরি ক'রে ওঠে!

১ম ভদ্র—আর কখন? যখন পাকিস্তানে আমাদের বাপ ভাইকে হত্যা করছে, মা বোনেদের এইবকম অসম্মান করছে ঐ ব্যাটারা!—তখন

ডাঃ—কিন্তু একটা নষ্ট মেয়েছেলের পক্ষে অতটা জ্ঞান থাকা কি সম্ভব?

১ম ভদ্র—তাহলে বলি শুনুন—নাম করব না। কোন এক পাড়ায়, এই বকম এক মেয়েছেলে নিজে আগুনের বল ছুঁড়ে একটা পুরো বস্তি জ্বালিয়ে দিয়েছে, জানেন? গায়ে যার সত্যিকারের হিন্দু রক্ত আছে, সে বেশ্যা হ'লেও সে হিন্দু! হিন্দুব লাঞ্ছনা শুনে তার রক্ত টগবগ করে ফুটবেই! আর সেইখানে—

ডাঃ—পলাশবাবুরা হিন্দুর মেয়েকে লাঞ্ছনা করলে আপনাদের হিন্দুর রক্ত কি বলে?

২য় ভদ্র—আপনি দেখছি একজন মুসলমান সাপোর্টার।

[ডাক্তার হাসে। হরি সুযোগ পেয়ে বলে]

হরি—বাবু, আমাদের কি আর এখানে থাকার দরকার আছে?

১ম ভদ্র—আছে বৈকি চাঁদেরা!—আছে!! পুলিস আসুক,—অনেক কথাই বেরিয়ে পড়বে আস্তে আস্তে! আর তোরাই বা কি? মুসলমানদের সংগে এক বস্তিতে থাকিস!

হরি—জায়গা কোথায় পাব বাবু?

২য় ভদ্র—তাই ব'লে এই সব পাকিস্তানীদের সঙ্গে!

হালিম—হাম পাকিস্তানী নেহী হ্যায় বাবুজী।

খালেক—বরং আমরা ব'লে দিইচি যে যাদের মন পাকিস্তানে প'ড়ে আছে, তারা সব চলে যাও পাকিস্তানে।

হালিম—হাঁ ই'হা গড়বড় মত কর। হাম হিন্দুস্তানী হ্যায় বাবুজী।

১ম ভদ্র—ওঃ, কথা আছে খুব।

২য় ভদ্র—ওইতেই চালাচ্ছে।

[বেয়ারা ঢোকে]

বে—বাবু, বড়মা খুব অস্থির হ'য়ে উঠেছেন, আপনাকে একবার ওপরে আসতে বলেছেন।

ডাঃ—বল্ গিয়ে—অস্থির হবার কিছু নেই, আমি একটু পরে আসছি। শোন্, মায়ের খাওয়া হয়েছে তো?

বে—বলতে পাচ্ছি নে তো।

ডাঃ—বল্ গিয়ে এমন কিছু হয়নি। না খেয়ে থাকলে খেয়ে নিতে বল্।

[বেয়ারা চলে যায়]

ডাঃ—আপনারাও চলুন বড় বসবার ঘরটায়। থানা থেকে আরও দু'একজন লোক এলে এ ঘরটায় ধরবে বলে মনে হ'চ্ছে না।

১ম ভদ্র—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই চলুন।

[কথা বলতে বলতে সবাই বেরিয়ে যায়। বারান্দার দিক থেকে শিবানী এসে ঢোকে। ওষুধের আলমারির দিকে তাকায়। পাল্লায় চাবি ঝুলছে। কাঁচের আলমারি। পাল্লা টানে, খুলে যায়। কি যেন খুঁজতে থাকে। পেয়ে যায়। একটা শিশি বার করে, দেখে, তাড়াতাড়ি নিজের ব্যাগের মধ্যে রাখে। ডাক্তার আসে। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে থাকে। শিবানী হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে নেয়।]

ডাঃ—শুনেছো সব নিশ্চয়ই।

শি—[চুপ করে থাকে]

ডাঃ—কি করবে এখন?

শি—আমার ওপর আরো ঘেন্না হচ্ছে তো?

ডাঃ—না।

শি—যাবার আগে তোমাকে একবার দেখতে বড্ড ইচ্ছে করল যে। বোকা, আমি খুব বোকা।

ডাঃ—তাহলে টাকা বা ঐ ছেলে নষ্ট করার কথা মিথ্যে?

শি—না, তাও নয়! আমি...আমার...ওঃ এখন আমার সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে।

ডাঃ—সত্যিই তুমি—অন্তঃসত্ত্বা ?

শি—...অথচ আমি শান্তিতে মরতে চাইছিলাম! অন্তত ঐ পলাশের ছেলে—! ওঃ আমার সমস্ত গা ঘিনঘিন করছে!

ডাঃ—এইবারে আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে! পলাশের সঙ্গে তাহলে তোমার সম্পর্ক ছিল ?

শি—না, না—। এখন কি কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে ?

ডাঃ—তুমি বল!

শি—সেই দাঙ্গার সময় ও এসেছিল একদিন। এসেছিল কাঞ্চনীর ঘরে। তারপর এসে পড়ল আমার ঘরে!

ডাঃ—এসে পড়ল মানে ?

শি—কাঞ্চনী আমাকে ঠকালে আর কি! প্রথমে নিজে এল—তারপর ও ঢুকে পড়ল।

ডাঃ—কিন্তু তুমি চেঁচাতে পারতে।

শি—না, পারতাম না। তাহলে হালিমচাচা ছুটে আসত। একটা রক্তারক্তি কান্ড হোত। হিন্দু-মুসলমানের আগুন আমাদের পাড়াতেও এসে পোঁছত। আরও কত লোক মরত, আরও কত বাড়ি জ্বলে যেত কে জানে ? তাই সে কথা একেবারেই চেপে যেতে হ'ল!

ডাঃ—আজকে যে কাজ করলে সে কাজ তখন করনি কেন ?

শি—সেও বোধ হয় ঐ একই কারণে। তা ছাড়া তখন ঠিক মনেও হয়নি বোধ হয়! আর...জীবনে অনেকবারই তো ধর্ষিতা হয়েছি—তাই—কি জানি—মানে সহ্য করলাম!

ডাঃ—তাহলে আজ একাজ করলে কেন ? সহ্য করলে না কেন ?

শি—পারলাম না! তবে ও মরে যাবে এটা ভাবিনি!...আচ্ছা ওকি গেছে ? সত্যি ?

ডাঃ—সত্যি।

শি—যখন আমি বেরোব, তখন ও এল। কোথা থেকে একটা প্রচণ্ড ইচ্ছে এল ওকে বাধা দেবার! ওকে কেউ খুন করলে আমি, আমি খুশী হতাম, সত্যি খুশী হতাম, খুব খুশী হতাম, খুব খুশী হতাম [একই ভাবে কথাগুলো বলতে থাকে]

ডাঃ—[ঝাঁকানি দিয়ে] শিবানী!

শি—না, না। কিন্তু আমি ওকে খুন করব ভাবিনি। ওর ছেলেকে খুন করব ভেবেছিলাম, সে তাকে বাঁচাবার জন্যে, নিজে বাঁচবার জন্যে,—অথবা মরবার জন্যে। কিন্তু ওকে—উঃ—।

ডাঃ—এখন কি করবে ?

শি—মরব। [একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ] তুমি কি আমাকে ধরিয়ে দেবে ?

ডাঃ—তাছাড়া কি করবে তুমি? এখন আর উপায় কি?

শি—দোহাই তোমার, আমাকে তুমি এখুনি ওদের হাতে দিও না, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। তুমি জান না কনেস্টবল থেকে দারোগা পর্যন্ত ওরা সবাই কত নিষ্ঠুর, কত জঘন্য হ'তে পারে! তুমি জান না। [ডাক্তার বিচলিত। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যেই যেন বলে]

ডাঃ—পাকিস্তানে পালাচ্ছিলে সত্যি?

শি—সত্যি।

ডাঃ—কেন?

শি—[কান্নার একটা আওয়াজ ঠেলে আসতে চায়] মরব বলে।

ডাঃ—বুঝতে পারলাম না।

শি—সত্যি যে তাই! এখন আমি কেমন করে বোঝাই! যদ্দিন বাঁচব ভালভাবে বাঁচব ব'লে তোমাদের পাড়ার এই বস্তিতে এলাম চাচার সঙ্গে! মাস-খানেক কেটে গেল একরকম ভাবে। তারপর শুরু হ'ল।

ডাঃ—কি শুরু হ'ল?

শি—অনেকেই বুঝে ফেলল যে আমি, আমি খারাপ ছিলাম,—এবং এখনই বা থাকব না কেন? আর তার সঙ্গে শুরু হ'ল আমার মনের শত্রুতা!

ডাঃ—মনের শত্রুতা?

শি—বলতেই হবে?

ডাঃ—বাধা আছে?

শি—নাঃ এখনও আমার একটু একটু লজ্জা আছে।

ডাঃ—থাক্ তবে।

শি—না। থাকবেই বা কেন! (একটু থেমে) একদিন তোমাকে দেখলাম। দেখলাম আর চিনতে পারলাম! তুমি মস্ত বড় ডাক্তার হয়েছ তা জানতাম। কাগজেও দেখতাম তোমার খবর মাঝে মাঝে। কিন্তু তুমি যে এই পাড়াতেই থাক, তা জানতাম না। জানলে হয়ত—।

ডাঃ—কিন্তু কোথায়, কোথায় দেখলে?

শি—সেদিন আমার ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছিল। তাই রাস্তার কলে জল আনতে যেতেও দেরি হল। গিয়ে দেখি লম্বা লাইন। তাই লাইনে বালতি বসিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল বলেই এদিক ওদিক তাকাতে হ'ল। বালতির দিকে চেয়ে কে দাঁড়িয়ে থাকবে বল। আর এদিক ওদিক তাকাতে হ'ল বলেই তোমাকে দেখতে হ'ল...তুমি তোমার গাড়ি করে যাচ্ছিলে।

ডাঃ—তখন দেখতে পেলে? আশ্চর্য! তোমার চোখের তারিফ করতে হয়! পনের বছর পরে একটা চল্‌তি গাড়ির ভেতর বসা একটা লোককে চিনে ফেললে?

শি—ঠাট্টা করছ নাকি ?

ডাঃ—[ত্রস্তে] না না, মোটেই না। বরং আমার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে যে তুমি আমাকে সত্যি ভালবাসতে, তাই এটা সম্ভব হল! কারণ আমারও তো বদল হয়েছে অনেক।

শি—কিন্তু সত্যি কথাটা ত তাও নয়।

ডাঃ—তবে।

শি—খুব ভাল শোনাত হয়ত। আজ যদি আমি খুনীর আসামী না হতাম—তাহলে আমি জল আনতে গেছি—নাইবা হ'ল নদী, নাইবা হ'ল সরোবর, কলকাতার কলই হ'ল না হয়। তবু তো জল আনতে যাওয়া! নাইবা হোল কলসী তবু তো জল আনতে যাওয়া!! অনেক দিনের বিরহের পর তোমার দর্শন পাওয়া আর প্রেমের জোরেই এক নিমেষে তোমাকে চিনতে পারা এবং আমার ভাল থাকবার সংকল্প একেবারে পাকা হয়ে যাওয়া। .. চমৎকার গল্প হ'ত তাহলে, কিন্তু তাতো হয়নি।

ডাঃ—তবে ? কি হয়েছিল তবে।

শি—সেদিন সারাদিন একবার মনে হয়, বোধহয় তুমি, আর একবার মনে হয়, নিশ্চয় তুমি! তাই পরদিন আবার দেরিতে—। আচ্ছা তোমার মনে আছে ? ধর, আজ থেকে তিন মাস আগে হবে,—এই মোড়ের বস্তির সামনে দিয়ে যখন তোমার গাড়ি যাচ্ছিল, তোমার গাড়ির সামনে হঠাৎ একটা ছোট ছেলে এসে পড়েছিল ? অল্প একটু ধাক্কাও লেগেছিল তার, মনে পড়ে ?

ডাঃ—হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়ে। তারপর ?

শি—যারা জল নিচ্ছিল সবাই ছুটে গিয়েছিল। ছেলেটির মাও ছিল সেখানে। তোমাকে গাড়ি থেকে নামতে হ'ল। ড্রাইভারকে বকতে হ'ল, ছেলেটিকে দেখতে হ'ল। বিশেষ কিছু হয়নি ব'লে রায় দিতে হ'ল। তারপর মা আর ছেলের কান্না থামাবার জন্যে দশটা টাকা বার করে দিতে হ'ল তাদের হাতে। পাঁচ থেকে দশ মিনিটের আগে এসব কাজ শেষ হয়নি তোমার। কলকাতার রাস্তা তো! আর তাই,—আর তাই তোমাকে ভাল ক'রে দেখা সম্ভব হ'ল। কারণ খুব কাছ থেকে দেখেছিলাম কিনা।

ডাঃ—তুমি ছিলে সেইখানে ?

শি—হ্যাঁ, সেই ছেলেটার মায়ের পাশেই।

ডাঃ—কিন্তু আমি তো তোমাকে চিনতে পারিনি।

শি—তুমি তো তাকাওনি কারুর দিকে। অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিলে তুমি। আর তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাইছিলে। তোমার আমার মাঝখানে এক 'গজেরও ব্যবধান ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু সেখানে একজন কেউ তো

তোমার কাছে কেউ না। সেখানে সবাই যে তোমার কাছে বস্তির লোক।

ডাঃ—কিন্তু আমি সেভাবে মানুষকে দেখি না।

শি—যাই হোক, সেই হ'ল আমার কাল। তোমাকে মনে ছিল—তোমার সেই চেহারা, যখন তোমার বয়স পঁচিশ। আবার তোমাকে দেখলাম, তোমার গলা শুনলাম। আবার আমার মনে হ'ল, না এ লোকটা তো দূরের লোক নয়!! তার পরদিন আবার সেই সময় জল আনতে গেলাম। (হঠাৎ থেমে) তারপর রোজ ঐ সময়েই জল আনতে যেতাম আর কি!

ডাঃ—ওঃ!

শি—আর তাই তো আমার সব ওলটপালট হ'য়ে গেল। নইলে পলাশকে সহ্য করা এমন কি শক্ত ছিল! নইলে এই বস্তিতে থাকাই বা এমন কি শক্ত ছিল! গোড়ার দিকে মনের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ ক'রে হেরেছিলাম। এবার হারতে পারলাম না কেন?

ডাঃ—শিবানী, একটা কথা তবু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে। ভুল বুঝো না, কারণ তোমাকে বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই। সে আমি চাইও না।

শি—অমন ক'রে বোল না। অমন ক'রে বললে আমার সঙ্কোচ হয়। তুমি যা জিজ্ঞাসা করবে, কর। আমি বলব।

ডাঃ—মানে তোমার মনের শত্রুতা ব'লে তুমি যা বললে—মানে—তুমি তো আর একজনকে বিয়ে ক'রে তার সঙ্গে ঘর করতে চলেছিলে!

শি—হ্যাঁ চলেছিলাম! ঘর করতে? হ্যাঁ তাও হয়ত করতাম কিছুদিন। ছেলেটা খুব খারাপ ছিল না। আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিল। ওকে ঠকাতে হবে বলে মাঝে মাঝে বড় খারাপ লাগত। কিন্তু কি করব, আমার লক্ষ্যে আমাকে যদি পোঁছতে হয়—। তাছাড়া আমাকেই কি কম লোক ঠকিয়েছে!

ডাঃ—তোমার লক্ষ্যে? কি লক্ষ্য ছিল তোমার?

শি—জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়া।

ডাঃ—জন্মভূমি?

শি—তুমি তো জান আমাদের দেশ ছিল পাকিস্তানে!

ডাঃ—ওঃ, হ্যাঁ।

শি—জীবনের সব জায়গায় যখন আমি হেরে গেলাম, বেঁচে থাকাটা যখন আমার কাছে অর্থহীন সময় কাটানো বলে মনে হ'তে লাগল, তখন কেবলই আমার সেই ছোট্ট গাঁয়ের, আর সেই গাঁয়ের মধ্যে আমাদের সেই ছোট্ট বাড়িটার কথা মনে পড়তে লাগল। যতগুলো গাছ ছিল আমাদের বাড়িতে, সব মনে পড়তে লাগল। নিম, পেয়ারা, সজনে! বড্ড দেখতে ইচ্ছে করল।

সবাইকে—মনে হ'ল ওদের যেন প্রাণ আছে, আমি গেলে যেন ওরা চিনতে পারবে।

ডাঃ—সবই তোমার কল্পনা শিবানী—রোমান্টিক চিন্তা। দেহে মনে তুমি অসুস্থ।

শি—তাই হবে বোধহয়। তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পারবে না। —কারণ যারা জীবনে জিতে গেছে, তারা হারার দলের কথা বুঝতে পারে না বোধহয়।

ডাঃ—কিন্তু সেখানে তুমি যেতে কি করে? এই ছেলেটা তোমাকে ছেড়ে দিত?

শি—আমি যেতাম। আমাকে কেউ ঠেকাতে পারত না। তাছাড়া জাহাঙ্গীর আমাকে সত্যি একটু ভালবাসে বোধহয়, তাই ওকে ঠকান কঠিন হ'ত না।

ডাঃ—সে ভালবাসে ব'লে তাকে ঠকাবে? তুমি কি ধরনের লোক?

শি—তুমি কোন্ রাজ্যে বাস কর? একাজ নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তো মানুষ হামেশাই করে থাকে। খোঁজ নিয়ে দেখ, হয়তো তোমার নিজের জীবনের ব্যবহারই তোমাকে ব'লে দেবে। তাছাড়া আমি তো তার কোন ক্ষতি করছি না। আমি যাব। তারপর তাকে ছেড়ে আমার জন্মভূমিতে যাব। মরব বলে যাব। একটু শান্তিতে মরব বলে যাব।

ডাঃ—মরবে ঠিক করেছিলে?...মরবে বলেই যদি ঠিক ক'রে থাক তাহলে এখানে মরলে না কেন?

শি—সেখানে গিয়ে মরতে আমার ভাল লাগবে বলে। তাছাড়া একটা গর্তের দরকার ছিল আমার, যেখানে আমাকে মরবার আগে কেউ ইঁদুরের মতন খোঁচাবে না। দ্যাখো, আমার যা ভাল লাগে সারা জীবনে আমি তা করতে পারিনি। তাই মরবার মুহূর্তটাকে ভাল লাগাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তাও বোধহয় হবে না, না?

ডাঃ—না, হবে না বোধহয়!

শি—তুমি আমাকে ওদের হাতেই দেবে?

ডাঃ—[একটু চুপ] তাছাড়া কি করব আমি?

শি—[অত্যন্ত আগ্রহে] আমাকে ছেড়ে দাও। আজ রাত্রের মধ্যে আমার বর্ডার পার হয়ে যাবার কথা। তারপর তো আমি সাবিয়া বেগম। তোমাদের সমাজের আর কোন ক্ষতি তো আমি করতে আসব না। তাহলে তুমি কেন আমাকে যেতে দেবে না?

ডাঃ—ঠিক। কিন্তু আমি সামাজিক লোক। এতটা জানতে পেরেও আমি—

শি—মনে করো না এটা একটা দুঃস্বপ্ন! আমি তোমার কাছে আসিনি! কিছু বলিনি! তুমি কিছু জান না!

ডাঃ—[প্রচণ্ড যন্ত্রণায় যেন] পাশের ঘরের মৃতদেহটা যে দুঃস্বপ্নের চেয়েও বেশী !!

[শিবানী চাপা আর্তনাদ করে ওঠে]

ডাঃ—সত্যি তুমি যদি না আসতে শিবানী!

শি—ভগবানও যে আমার শত্রু হ'য়ে যাবে কি ক'রে জানব বল! ভেবেছিলাম আমার শেষ মুহূর্তে আমি জিতব—। কিন্তু—ওঃ। ও যদি তখন না আসত।

[বাইরের দরজায় টোকা। ডাক্তার, শিবানী দুজনেই উৎকর্ণ, ভীত]

ডাঃ—কে? কি দরকার?

বেয়ারার গলা—আপনাকে—একবার ডাকছেন ওঁরা।

ডাঃ—কারা?...কেন?

বে—দারোগাবাবু এসেছেন!

ডাঃ—এখুনি আসছি বল।...তুমিই বল শিবানী, এবার কি করব।

শি—তোমার ভগবানকে তুমি জিজ্ঞাসা কর!

ডাঃ—সমস্ত জেনে আমি কি করে বলব যে— ...তার চেয়ে শিবানী আমি একটা কথা বলি—তুমি ধরা দাও, আমি চেষ্টা করব যাতে তোমার সাজা না হয়। কলকাতার সবচেয়ে নামকরা ব্যারিস্টারের সাহায্য নেব আমি।

শি—ব্যারিস্টার আমাকে বাঁচাতে পারবে?

ডাঃ—পারবে। তুমি তো ইচ্ছে ক'রে একাজ করনি। ও যদি তোমার ওপর জোর করবার চেষ্টা না করত—তাহলে ত—।

শি—বেশ্যার ওপর বলাৎকারের কেস্ হয় কি? ওদেরও তো ব্যারিস্টার থাকবে!

ডাঃ—কিন্তু তোমাকে তো কেউ দেখেনি খুন করতে—!

শি—ওঃ। তুমি বলছ যে তোমার সত্যের খাতিরে এখন আমাকে ধরা দিতে হবে। তারপর তোমার ব্যারিস্টার মিথ্যা বলে আমাকে বাঁচিয়ে দেবে? দেখেছ, তুমি নিজেই জান না সত্য কি? হয়তো তোমার মত কোন "সামাজিক" লোকই জানে না। তাই তো এই সমাজ সংসারের ওপর আমার এত ঘেন্না হয়ে গেছে!...ঠিক আছে, তোমার যা কর্তব্য ব'লে মনে হয় তুমি তাই কর। আজ হঠাৎ এসে আমি তোমার কর্তব্যে বাধা দেব না।

ডাঃ—আমি বুঝতে পারছি না আমি কি করব। তুমি অপেক্ষা কর, কারণ এখন তুমি যেতেও পারবে না, গেটের সামনে ভীষণ ভিড়। (চলে যেতে চায়। আবার ফিরে এসে বলে) কেউ যদি এঘরে আসে, তোমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে, কি বলবে?

শি—কি বলব?

ডাঃ—বোল যে—বোল তুমি আমার আত্মীয়া রোগী—নাম—শিবানী—হ্যাঁ শিবানী।

[বেরিয়ে যায়। শিবানী দরজাটা ভেজিয়ে দেয়। ফিরে আসে চেয়ারটার কাছে। ব্যাগটা হাতে নেয়। শিশিটা বার করে চারিদিকে তাকায়। জলের জন্যে কি ? তাকিয়ে থাকে শিশির দিকে। তারপর শিশিটা ব্যাগের মধ্যে রেখে দেয়। হঠাৎ ব'সে প'ড়ে ফুঁপিয়ে কে'দে ওঠে। ভেতরের দিকের দরজায় বিধবা প্রায়-বৃদ্ধা এক মহিলাকে দেখা যায়। ডাক্তারের মা। পোশাকে বড়োলোকের ছাপ আছে। ছেলের দেরি দেখে নীচে নেমে এসেছেন]

মা—অমু, কি হ'য়েছে। এসব কি শুনছি!

[হঠাৎ থেমে যান। শিবানী নিজের আবেগে কে'দে চলেছে, একথা শুনতে পায় না বোধহয়] একি! তুমি কে ? কি হয়েছে তোমার ?

[এইবার শিবানী শুনতে পায়। সোজা হয়ে বসে। কিন্তু যেদিক থেকে প্রশ্ন আসে সেদিকে তাকাতে পারে না। নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করে]

শি—[না তাকিয়ে] আমি ডাক্তারবাবুর একজন আত্মীয়া, আমার অসুখ করেছে। তাই এসেছি।

মা—আত্মীয়া! কি নাম তোমার ?

শি—আমার নাম শিবানী।

মা—শিবানী—মানে—শিবানী ?

[শিবানী এইবার ফিরে তাকায়। একটু স্তব্ধতা। তারপর দুজনেই প্রায় এক সঙ্গে বলে]

মা—তুমি!

শি—আপনি!

মা—[কষ্টে এগিয়ে আসতে থাকেন] তুমি এতদিন পরে এখানে কি মনে করে এসেছ ?

শি—আমি অসুস্থ।

মা—(গভীর সন্দেহে) অসুস্থ তুমি হ'তে পার। কিন্তু কিজন্য এসেছ তুমি। কতক্ষণ এসেছ ?

শি—অনেকক্ষণ।

মা—অমু কোথায় ?

শি—ওদিকে কোথায় গেছেন।...অনেক লোক এসেছে, তারা ডাকছিল।

মা—হুঃ! তা এত লোকজন কেন ? কে খুন হয়েছে ?

শি—এ্যাঁ ?

মা—তুমি জান না কিছু ?

শি—না।

মা—অনেকক্ষণ তো এসেছ তুমি, জান না কিরকম?
শি—[ভয়ে] হ্যাঁ, আমিও ঐরকম কি শুনছিলাম।
মা—অত ভয় পাচ্ছ কেন? যেন খুনটা তুমিই করেছ।
শি—কি বলছেন এসব?
মা—বলছি, অত ভয়-পাওয়া ভাব দেখাচ্ছ কেন? খুন জখম তো কলকাতায় লেগেই আছে! আর তোমার বয়সও তো নেহাত কম হ'ল না! [একটু চুপ] তা হঠাৎ এতদিন পরে কি মনে করে এসেছ?
শি—এমনি দেখা করতে। আর তাছাড়া অসুখ করেছে।
মা—কি অসুখ?
শি—সে অন্যরকম!
মা—তা দেখাই যদি করতে এসে থাক তা আমার সাথে দেখা করতে গেলে না কেন? বুঝেছি!! বৌমার সংবাদ পেয়েই তুমি এসেছ! তুমি কেমন মেয়েছেলে? তিনমাসও হয়নি বৌমা গত হয়েছে! তা তোমার একটু তর সইল না?
শি—এসব কি বলছেন?—আমি—
মা—তোমার কান্নার ঘটা দেখেই আমি বুঝেছি! ছিঃ!
শি—আপনি ভুল—
মা—কলকাতায় তো অনেকদিনই আছ, অসুখও তোমার আজ হয়নি! বৌমাও গেল, আর তুমিও ডাক্তার পেলে না অসুখ সারাবার!
শি—আপনার বৌমা মারা গেছেন, আমি জানতাম না।
মা—নাঃ জানতে না। দেখ, আমিও মেয়েছেলে। তোমার ঐ কান্নাকাটি দেখে ব্যাটাছেলের মন ভুলতে পারে—কিন্তু আমাকে অত সহজে তুমি ভোলাতে পারবে না!

[অপমানে শিবানীর চোখ জ্বালা করে ওঠে]

শি—কিন্তু আমি তো আপনার ধরনের মেয়েছেলে নই, আপনি আমাকে বুঝবেন কি করে?
মা—কি বললে? মানেটা শুনি!
শি—মানে? মানে—আমি নিজে মেয়েছেলে হ'লেও মেয়েছেলের কান্নায় আমার মন ভোলে—তাই না আপনার বৌমাকে পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে কাঁদতে, তাই না নিজে ইনিয়ে-বিনিয়ে চিঠি লিখেছিলেন? আর আমি ভুলে গিয়েছিলুম! তাই আমি কেন এসেছি তা বোঝবার সাধ্য—
মা—তোমার আস্পদ্দা তো কম নয়! তোমার কোন খবর আমি জানি না মনে করেছ! দিনকতক আগে দেখা হয়েছিলো তোমার ছোট বোনের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে! সব কথাই শুনলাম। লজ্জায় তোমার জন্য তারা সমাজে মুখ দেখাতে পারে না। বাধ্য হয়েই তাদের বলতে হয় যে, তাদের

বড় বোন মারা গেছে। তুমি মনে করেছ এসব কথা আমি অমুকে বলব না!

শি—দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে দাঁড়িয়ে উপযুক্ত আলোচনা করেছেন আপনারা! মা কালী নিশ্চয়ই পুণ্যের ঘরে আপনাদের নম্বর বাড়িয়ে দেবেন!

মা—দেখ! তুমি ভাবছ আমার ছেলেকে তুমি হাত করতে পারবে? দারোয়ান দিয়ে ঘাড় ধরে এখুনি তোমাকে বার করে দিতে পারি জান?

শি—[প্রথমে একটু চুপ করে থাকে, তারপর হঠাৎ যেন মাথায় একটা দুষ্টুমি বুদ্ধি আসে। হেসে বলে]

অমন কাজও করবেন না যেন! জানেন তো আমি খারাপ মেয়েছেলে! শেষ কালে যা-তা ব'লে চেঁচাব! হয়তো বলে ফেলব, যে বৌ মারা যাবার পর আপনার ছেলে আমাকে ডেকে এনেছে! সেটা কি রকম দেখাবে না?

মা—[থতমত খেয়ে যায়] কেন এসেছ? আমাকে নিয়ে খেলা করতে এসেছ?

শি—করলে মন্দ হয় না। পনের বছর আগে একটা দাবার চাল দিয়ে আপনি জিতে গিয়েছিলেন। আজ হয়ত আমি জিতব। কে বলতে পারে?

মা—তুমি কি সেইসব কথা বলতে এসেছ অমুর কাছে ?

শি—হুঁ, হুঁ। কেন এসেছি—আপনি হলেন গিয়ে গুরুস্থানীয়া—বলতে গেলে আমার শাশুড়ীস্থানীয়া—আপনার কি এ সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত? আমার কিন্তু লজ্জা করবে বলতে। শুনবেন?

মা—থাক! শয়তানী কোথাকার! তবে আমার ছেলেকে আমি জানি! সে কখনো—দেশজোড়া তার নাম। তুমি কি তার সেই সুনাম নষ্ট করে দিতে চাও?

শি—পাগল, না মাথাখারাপ! [অত্যন্ত ভালমানুষের মত] আমি চাইব যে আমার স্বামীর সুনাম আরও বাড়ুক। শুধু দেশে কেন বিদেশেও যাতে—

মা—এতদূর পর্যন্ত তোমাদের কথাবার্তা হয়ে গেছে নাকি? না, না, শোন শিবানী, তুমি কি মনে করছ, এটা তুমি ভাল কাজ করছ? তাহলে আমার অমল আর কোনদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে?

শি—এবার তো আপনার বৌমা নেই, কান্নাকাটি করে মন ভোলাবার কাজটা সম্পূর্ণ আপনি একাই করবেন নাকি?

মা—ইতর! ছোটলোক কোথাকার! [রাগে প্রায় পাগল] এখুনি তোমাকে আমি বাড়ি থেকে বার করছি। বলব তুমি চুরি করতে এসেছিলে! পুলিসও তো বাড়িতেই আছে বোধহয়। দেখি অমু তোমাকে কেমন বাঁচায়!

[শিবানী একটু ভয় পায় যেন]

শি—হঠাৎ ক্ষেপে যাচ্ছেন কেন? আস্তে কথা বলুন। আপনার চীৎকারে বাইরের লোক কেউ যদি এখানে এসে পড়ে, তাহলে আপনার ছেলে সত্যিই আর কোন দিন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না!!

মা—কত টাকা চাস তুই? টাকা দিচ্ছি বেরিয়ে যা এখান থেকে।

শি—আপনি আবার ভুল করছেন, আমি আপনার মত স্ত্রীলোক নই!

মা—কি বললি?

শি—টাকার জন্যেই কি আপনি আপনার ছেলেকে বড়লোকের মেয়ের কাছে বিক্রি করেননি? আর টাকা ছেড়ে দিয়েই কি আমি চলে যাইনি?

মা—আমাকে অপমান করতেই কি তুই এসেছিস আজকে। তুই পারতিস দিতে এই ঐশ্বর্য এই নাম? এইসব তুই পারতিস দিতে অমলকে? পারতিস?

শি—কিন্তু আমি যা পারতাম তা ও পায়নি, আমি জানি তা ও পায়নি—। [একদৃষ্টে সামনের দিকে তাকিয়ে বলে] তাহলে আজ আমি আসা মাত্র ও ওরকম করত না, ও পায়নি, ও কিছু পায়নি। আমাদের সমস্ত কল্পনা [হঠাৎ হিংস্র হয়ে ওঠে] কেন কেন সেদিন আপনি সমস্ত নষ্ট করে দিলেন?

মা—ওকি! অমন করে আমার দিকে এগিয়ে আসছ কেন?—দাঁড়াও। [শিবানী দাঁড়ায়। মা একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসবার চেষ্টা করে] একি! আমাকে কি তুমি খুন করবে নাকি? [শিবানী যে ঘরে মৃতদেহটা আছে সেদিকে তাকায়] তোমার গায়ে এত শক্তি নেই যে তুমি আমাকে খুন করতে পার!

শি—এ্যাঁ? (অপ্রকৃতিস্থভাবে) খুন করতে কি গায়ের জোর লাগে নাকি? ইচ্ছেটা চাই, ইচ্ছে থাকলে—। ওকে কেউ খুন করুক এই ইচ্ছেটা আমার ছিল—

মা—[গভীর সন্দেহে] এ কিরকম করে কথা বলছ তুমি?

[বাইরে আবার অনেক লোকের পদশব্দ আর কথার আওয়াজ—ডাক্তারের গলা 'এই ঘরে আসুন' গুঞ্জন। ভারী বুটের আওয়াজ।]

মা—[হঠাৎ যেন আশ্বাস পায়] ঐ তো ঐ তো ওরা—অমু—[বলে ডাকতে যায়। মাতালের নেশা কেটে যাওয়ার মত হঠাৎ শিবানী সচেতন হয়]

শি—[চাপা গলায়] কথা বলবেন না এখন!

মা—কেন? এসব তুমি—[আবার চীৎকার করে কাউকে ডাকতে যায়। মুহূর্তের মধ্যে শিবানী যেন লাফিয়েই মায়ের কাছে চলে আসে। হাত দিয়ে তার মুখ চেপে ধরে প্রাণপণে। পেছনের ঘরে কথার আওয়াজ হ'য়েই চলে]

শি—[চাপা গলায়] বলছি না বারে বারে, কাউকে ডাকবেন না! আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন! ওঘরে যারা এসেছে তাদের মধ্যে একজনও যদি আমাকে চিনতে পারে, তাহলে আপনার ছেলের সম্মান তো নষ্ট

হবেই, এমন কি হাতেও দড়ি পড়তে পারে। কারণ আমি খুনের আসামী, পালিয়ে এসেছি! ওরা যদি এখানে আমাকে দেখে তাহলে ধরেই নেবে যে ডাক্তার আমাকে লুকিয়ে রেখেছিল! কারণ ও এখনও ওদের কাছে আমার নাম বলেনি! আপনার ছেলেকে যদি ভাল লোক বলে জানেন, তাহলে এটাও জেনে রাখুন যে ভাল লোকের শত্রুও অনেক থাকে। তারা এ সুযোগ ছেড়ে দেবে না!...চেঁচাবেন না তো? বেশ! [ছেড়ে দেয়। মা আতঙ্কিত হয়ে তাকিয়ে থাকে শিবানীর দিকে।] আমার জন্যে আর আমার—[হঠাৎ থেমে যায়]

মা—[যে মহিলাকে এতক্ষণ শুভ্র থান পরিহিতা বড়লোকের বাড়ির দাম্ভিক মহিলা বলে মনে হচ্ছিল, কোথায় তার অহঙ্কার চলে গেছে। নীচের ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, মাথার কাপড় পড়ে গেছে,—নির্জীব সাপের অবস্থা যেন] তুমি কি সত্যি ঐ কাজ করেছ?

শি—করেছি!

[পেছনের ঘর থেকে লোক চলে যাবার আওয়াজ নিস্তব্ধতা।]

মা—কেন?

শি—[হঠাৎ ক্ষেপে যায়] আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না কোন কথা! [তারপর হঠাৎ ঘুরে বলে] আপনার জন্যে। আপনার জন্যে আজ আমি একটা বেশ্যা, একটা খুনী—একটা—আপনাকে যদি আমি—[কোণে টিপয়ের ওপর অযত্নে রাখা একটা পেতলের মূর্তি ছিল। তুলে নেয় সেটা, যেন ছুঁড়ে মারবে, সত্যি যেন খুন করবার ইচ্ছে হয়েছে শিবানীর]

মা—[অক্ষম আর্তনাদ করে ওঠে] শিবানী!

শি—[সম্বিত ফিরে পায়। নামিয়ে রাখে মূর্তিটা] আমার কাছে কোন কৈফিয়ৎ চাইবেন না আপনি!

মা—আমি তো মা চাইনি।

[শিবানী তাকিয়ে থাকে মায়ের দিকে। একটু হাসি আসে যেন ঠোঁটে। পরক্ষণেই যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে যায়। নিজের মাথাটা চেপে ধরে]

শি—আপনি চলে যান আমার সামনে থেকে—না হলে আমার মাথাটা বোধহয় সত্যি খারাপ হয়ে যাবে! [হঠাৎ কেঁদে ফেলে।]

[ভেজান দরজা খুলে ডাক্তার ঢোকে। অবাক হয়]

ডাঃ—একি কাণ্ড! মা তুমি কি করে নীচে—

[ডাক্তারের কথা শেষ হয় না, মা এতক্ষণ যেন কিরকম হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, ডাক্তারকে দেখে যেমন জলে ডুবে যাওয়া লোক একটা কুটো আঁকড়াতে চায়, তেমনি করে ডাক্তারের দিকে হাত বাড়ায়]

মা—অমু—। [কেঁদে ফেলে]

ডাঃ—কি ব্যপার! আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না! মা তুমি নড়তে পার না বাতের ব্যথায়, তুমি কি করে—।

মা—অমু—বাবা পুলিশে দে ওকে, পুলিশে দে—।

ডাঃ—চুপ কর! কি বলছ তুমি!

মা—এতক্ষণ তো ও আমাকে চুপ করিয়েই রেখেছিল বাবা। ভয়ে আমি আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম—।

[শিবানী হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়]

শি—সবাই চলে গেছে?

ডাঃ—হ্যাঁ।

শি—তাহলে এবারে আমি যেতে পারি?

ডাঃ—তুমি যাবে? এখনও একটু ভিড়—

মা—অমু ওকে পুলিশে দে—ওকে—

ডাঃ—আঃ মা, দয়া করে একটু চুপ কর!

মা—চুপ আমি করছি। কিন্তু আমাকে পর্যন্ত ও খুন করতে এসেছিল। বল, এবার আমাকে চুপ করে থাকতে বল।

ডাঃ—সেকি! শিবানী?

[পাশের ঘরের ঘড়িতে আওয়াজ হতে শুরু করে। শিবানী উৎকর্ণ হয়। ডাক্তারও। মা একটা কথা বলতে যায়, কিন্তু থেমে যায়]

শি—এগারটা, যাঃ।

ডাঃ—কি যাঃ?

শি—[প্রচণ্ড হতাশায়] জাহাঙ্গীর চলে গেল !

মা—পুলিশে দে ওকে অমু—ওকে—

শি—কেন?

মা—ন্যাকা? কেন? নিজে মুখেই তো স্বীকার করলে!

ডাঃ—কি, কি স্বীকার করলে?

মা—ও যে খুন করেছে।

ডাঃ—[শিবানীকে] তুমি বলেছ একথা? কেন মিথ্যা কথা বলতে গেলে?

মা—তার মানে?

ডাঃ—ও কেন খুন করতে যাবে মা. ও খুন করেনি।

মা—এ কী হেঁয়ালী হচ্ছে তোমাদের!

ডাঃ—খুন যেখানে হয়েছে সেখানে শিবানী কোনদিন ছিল না তো। পারুল বলে একটা মেয়ে খুন করেছিল—তাও সঠিক কেউ জানে না! আর সে তো পাকিস্তানে চলে গেছে জাহাঙ্গীর বলে একটা ছেলের সঙ্গে। তার সাথে—

মা—দাঁড়া অমু—এক্ষুণি ও বললে না, যে—জাহাঙ্গীর চলে গেল! কেন, কেন বললো ও ওকথা? কেন?

ডাঃ—মা, আমি যা বলছি তাই শোন! শিবানী আমাদের আত্মীয়া, অনেকদিন পর দেখা করতে এসেছে, অনেক দূরে থেকে। তার সংগে আজকের ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক কেবল এইটুকুই যে—আমি ডাক্তার, তাই একটা লোককে মৃত বলে ঘোষণা করতে হয়েছে—আর সেই সময় শিবানী এখানে এসে পড়েছিল। আমাকে এরকম ডেথ সারটিফিকেট তো কত লোককে দিতে হয়। তার সংগে তোমার তো কোন সম্পর্ক নেই মা! তোমার জানবার তো দরকার নেই!

মা—আমার জানবার দরকার কতটুকু শুনি!

ডাঃ—মা, শিবানী অনেকদূর থেকে এসেছে। ওকে ওপরে নিয়ে যাও। ওর থাকবার ব্যবস্থা করে দাও।

মা—ও এখানে থাকবে? অমু—! ওর সব পরিচয় তুই জানিস?

ডাঃ—আজকে এই এত রাতে ও কোথায় যাবে?

মা—থানায়। হাজতে।

ডাঃ—না মা।

মা—অমু!!

ডাঃ—যা বলছি তাই কর মা।

মা—তুই আজ আমাকে হুকুম করছিস অমু?

ডাঃ—আজকের সমস্ত ব্যাপারটাই অন্যরকম!

মা—অসম্ভব! তুই, অমু তুই এতবড় অন্যায় হ'তে দিবি?

ডাঃ—অন্যায়?

মা—ওকে আজ যদি তুই পুলিশের হাতে না দিস্, সেটা বেআইনী হবে না?

ডাঃ—কিন্তু মা, বে-আইনী আর অন্যায় দুটো এক কথা নয়। কিন্তু যাক, অনেক সময় নষ্ট হ'য়ে গেছে। তুমি ওপরে যাও মা।

মা—বে-আইনী মানেই অন্যায়! এই সেদিনও তুই এই কথাই বলেছিস অমু।

ডাঃ—তাই-ই। সেটাও ঠিকই বলেছিলাম। আমি বিশ্বাসও করি তাই! কিন্তু আজকের ব্যাপারটাই অন্যরকম।

মা—অন্যায় সব সময়েই অন্যায়। আজ খুন করল বলে অন্যায় হ'ল না, আর কাল খুন করলেই অন্যায় হবে, এ কি ধরনের কথা!

ডাঃ—কে খুন করেছে মা? আমি তোমাকে বার বার বলছি মা, যে—যে খুনটা হয়েছে তার সংগে আমাদের শিবানীর কোন সম্পর্ক নেই!

মা—আমি কিছু বুঝতে পারছি না অমু! এ কাজ যদি তুই করিস, তাহলে মানুষের ন্যায় অন্যায় নিয়ে আর কোন দিন তুই কথা বলতে পারবি না!

ডাঃ—যত সহজে বলতাম, তত সহজে আর বলতে পারব না সত্যি।

মা—একটা মেয়েমানুষের মোহে প'ড়ে তুই—! ছিঃ ছিঃ! বৌমা চলে গেল, আমি কি এই দেখতে প'ড়ে রইলুম!

ডাঃ—মা !!

মা—না, একাজ তুই করতে পারবি না।

ডাঃ—তবে তুমি আমাকে কি করতে বল?

মাঃ—ওকে পুলিশে দে—, না হয় এখুনি ওকে বাড়ি থেকে বার ক'রে দে।

[শিবানী এতক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে এদের দিকে তাকিয়েই কি যেন আকাশপাতাল ভাবছিল। এবার হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়]

শি—[উদ্‌ভ্রান্তের মত] আমি যাব।—কিন্তু কোথায়?

ডাঃ—কাল সকালে তোমার যাবার ব্যবস্থা আমি ক'রে দেব। তোমাকে ইঁদুরের মত খুঁচিয়ে যাতে না মারতে পারে, অন্তত সেটুকু আমাকে করতেই হবে। আমাদের পাপের একটা আংশিক প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও!

মা—পাপ? কিসের পাপ?

ডাঃ—ওকে আমরা সবাই মিলে ঠকিয়েছি মা।

মা—কখনো না। যে নিজে ভাল থাকতে চায়, তার এ অবস্থা হ'তেই পারে না। তুই ওর সম্পর্কে সব কথা জানিস না বোধহয় অমু—।

ডাঃ—তোমার সম্পর্কেও তো আমি অনেক কথা জানি না মা! আর আজকে জেনেও তোমাকে তো আমি—।

মা—কি, কি জানিস তুই!

ডাঃ—থাক মা। আমি খুব ক্লান্ত। কাল সব চেয়ে ভোরে কোন প্লেন কোথায় যায়, তারই খোঁজ করতে হবে। আমি একটু ফোন ক'রে আসছি।
[বেরিয়ে যায়]

[আবার দুইজন স্ত্রীলোক মুখোমুখি। মা'র চোখে যেন বিষ ঝ'রে পড়ছে।]

মা—কি বলেছ তুমি আমার নামে? এর শোধ আমি—। চাকরগুলো গেল কোথায় সব।

শি—কেন! কি দরকার?

মা—তোমার সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা করতে হবে—।

শি—কি ব্যবস্থা?

মা—[সে কথার উত্তর না দিয়ে] সত্যি, কি দিয়ে ওকে তুক করলে বল তো? এ যেন আমার ছেলে নয় বলে মনে হচ্ছে! এমন ছেলে—।

[বাইরে একটা গাড়ীর শব্দ। গাড়ী থামল। সেই বেয়ারাটি ছুটে আসে]

বে—বাবু—

মা—কি হ'য়েছে?

বে—পুলিশ লাশ নিতে এসেছে। বাড়ির লোকও আছে অনেক।

মা—পুলিশ এসেছে? শোন, দারোগা—না কে এসেছে?—মোটকথা আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যেতে বলবি!

বে—[অবাক] আপনার সঙ্গে?

মা—[রাগে] হ্যাঁ হ্যাঁ! আর অমুকে একথা বলবি না। যা অমুকে গিয়ে বল,, যা বলতে এসেছিলে! টেলিফোন করছে অমু।—

বে—আচ্ছা। [চলে যেতে চায়]

মা—পুলিশকে আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে বলবি! [বেয়ারা বেরিয়ে যায়]

শি—[ভয়ে এবং ঘৃণায়] আপনি কি আমাকে ধরিয়ে দেবেন?—কিন্তু কেন? আপনার ছেলেরই বা কি হবে তাহলে?

মা—দশ বছরের ছেলে নিয়ে বিধবা হয়েছিলাম। এই এতবছর ধরে তার ভালমন্দ আমিই ভেবেছি। আজও আমিই ভাবব।

শি—দোহাই আপনার, একাজ আপনি করবেন না! একদিন তো আমি আপনার উপকার করেছিলাম, অন্তত সেই কথা ভেবে—।

মা—আমার ভাবা হয়ে গেছে। আজ এই বে-আইনী কাজ ওকে যদি আমি করতে দিই, তাহলে জীবনে আর কোনদিন ও শান্তি পাবে? এটা তো ঝোঁকের মাথায় করছে, তুকের গুণে করছে! বুঝতে ও পারবেই একদিন।

শি—[চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে] কিন্তু আমি যদি বলি অমল আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিল তাহলে?

মা—ডেকে যখন সে সত্যি পাঠায়নি, তখন ওকথা কেউ বিশ্বাস করবে না। এবং অমুও সেকথা বলবে না।

শি—কিন্তু এক সময়ে তার সঙ্গে একটা সম্পর্ক ছিল—তাই আজকে ডেকে পাঠানটা অস্বাভাবিক নাও হতে পারে তো?

মা—[হেসে] অমু এতখানি নির্লজ্জ হ'তে পারে না যে তার ভালবাসার কথা পুলিশকে বলতে বসবে! তোমাকে এখান থেকে পুলিশে নিয়ে গেলেই তার মাথা ঠিক হবে! তার ছেলের কথাটাও তো তাকে ভাবতে হবে!

শি—কিন্তু আমি তো নির্লজ্জ হ'তে পারি। আপনার নাতির কথা ভেবে আমি তো চুপ করে নাও থাকতে পারি!

মা—সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। আর যাতে না করে সে ব্যবস্থাও করা যাবে!

শি—বিশ্বাস করবে। তার চিঠিগুলো যে এখনো আছে আমার কাছে। নতুন ডাক্তার হ'তে যাচ্ছে, ইচ্ছে করে ডাঃ চৌধুরী বলে কত চিঠিই তো লিখেছিল আমার কাছে। যদি আমি সেগুলো দেখাই, তবু বিশ্বাস করবে না কেউ?

[একটু চুপ]

মা—তুমি এতদিন সেই চিঠি রেখে দিয়েছ আমাকে প্যাঁচে ফেলবার জন্যে ?

শি—তাছাড়া, আপনার লেখা চিঠিটাও আছে আমার কাছে।

মা—এ্যাঁ! সে চিঠি তো তোমার নষ্ট ক'রে ফেলবার কথা ছিল।

শি—[একটু হাসে] আপনি জানেন যে আপনার অনেক কথাই তখন আমি মানতাম। বলতে লজ্জা নেই, যে একটা সম্পর্ক হবে বলেই মানতাম। চিঠি দিয়ে আপনি যখন সেটা ভেঙে দিতে চাইলেন, তখন আপনার হুকুমটা মানবার দরকার আর মনে হ'ল না! তাই ওটা রয়েই গেল!

মা—[প্রায় হিসহিস করে] ভাবলে, যে কোনদিন ওটা দিয়ে আমাকে জব্দ করতে পারবে!

শি—[ঘৃণায় একটু চুপ করে থাকে] আমার জীবন ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার কারণের দলিলটাকে নষ্ট করতে মায়া হ'তে লাগল। আজ সকালের আগে ওগুলোর দিকে তাকিয়েও দেখিনি কতদিন। আজ সকালে দেখলাম কালি দিয়ে লেখা চিঠি পনের বিশ বছর পরেও মোটেই নষ্ট হয়ে যায়নি!

মা—উঃ। তখন তোমাকে কতই না ভাল আর মিষ্টি আর সৎ বলে মনে হতো। তুমি এত ভেবেচিন্তে কাজ করতে পার, তখন আমার তা মনে হয়নি!

শি—আমি ভাল,—যাই কেন না করে থাকি আমি, আমি এখনও সৎ।

মা—লজ্জা করে না তোমার! সৎ! তাই আমাকে এই প্যাঁচে ফেলেছ!

শি—আমার জীবন আমাকে একটা শিক্ষা দিয়েছে, যে অসৎএর সাথে অসৎ ব্যবহার করেও সৎ থাকা যায়।

মা—হ্যাঁ তাই না? বেশ্যা হলেও সৎ থাকা যায়! খুন করলেও সৎ থাকা যায়। আর কত বলবে?—যাকগে, এখন কি চাও বল তো?

শি—আপনার আইনের কি হবে? আপনার ছেলের সারা জীবনের শান্তির?

মা—সে কথা তোমাকে ভাবতে হবে না!

[ডাক্তার ঢোকে]

ডাঃ—মা, তুমি পুলিশের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছ? কেন?

[এক মুহূর্ত চুপ সব]

মা—না। আর দরকার নেই।

ডাঃ—ওঃ। [চলে যায়]

মা—বল এবারে কি চাও। কি হলে আমাদের মুক্তি দেবে।

শি—এক গ্লাস জল চাই। জল খাব।

মা—ওঃ। কাজের লোকদের কাউকে দেখতে পেলে বলছি সে কথা! কাল সকালে অমুও কি যাবে তোমার সঙ্গে?

শি—[অন্যমনস্ক] কোথায়?

মা—অমু যার জন্যে টেলিফোন করতে গেল!
শি—আমি জানি না!
মা—এখন থেকে কি তুমি যা বলবে তাই শুনেই আমাকে চলতে হবে?
শি—[অবাক হয়ে] কেন?
মা—তার চেয়ে এক কাজ কর না। তোমরাই এখানে থাক। আমাকে কাশী-টাশী কোথাও পাঠিয়ে দাও।
শি—আপনার কথা ভাববার সময় আমার নেই!
মা—এতদূর!
শি—আমাকে একটু জল দেবেন না?

[ডাক্তার ঢোকে]

ডাঃ—ওরা সবাই চলে গেল।

[আবার একটু চুপ]

মা চল তোমাকে ওপরে দিয়ে আসি।

[ডাক্তারের ওপর ভর দিয়ে মা উঠে দাঁড়ায়। পেছনে বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছে। মা বেয়ারাকে দেখতে পায়]

মা—ওরে! এই—একে—শিবানীকে এক গেলাস জল দে। আর আর তরুবালাকে বল আমায় নিয়ে যাবে। আর বৌমার ঘরটা খোল গিয়ে।

[বেয়ারা বেরিয়ে যায়]

ডাঃ—চল। শিবানী একটু বোস, আসছি আমি।

[শিবানী দাঁড়িয়েই থাকে। ঘড়িতে একটা ঘণ্টার আওয়াজ। ব্যাগটা একবার খোলে আবার বন্ধ করে। কাজের লোক জল নিয়ে আসে। হাত বাড়িয়ে জলটা নেয়। খেতে গিয়ে নামিয়ে রাখে। যদিও বোঝা যায় পিপাসা প্রচণ্ড]

শি—[কাজের লোককে] তুমি যাও, গেলাসটা পরে নিয়ে যেও।

[কাজের লোক চলে যায়]

[শিবানী তাড়াতাড়ি ওষুধের শিশি থেকে সবগুলো বড়ি নিজের বাঁ হাতে ঢেলে নেয়। জলের গ্লাসে হাত দেয়। ডাক্তার ঢোকে। শিবানী গ্লাস ছেড়ে শিশিটাকে ব্যাগ দিয়ে আড়াল করে। ডাক্তার লক্ষ্য করে না।]

ডাঃ—বোস শিবানী। তোমার সঙ্গে কতগুলো কথা ঠিক করে নিই। কাল খুব সক্কালে একটা প্লেন বম্বে যাবে। আমরা প্রথম বম্বে যাব। সেখানে গিয়ে তোমার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আচ্ছা, নার্সের ট্রেনিং নিতে তোমার আপত্তি নেই তো?
শি—নার্সের কি একটা ট্রেনিং আমার নেওয়া ছিল যেন!
ডাঃ—তাই নাকি? তবে সে যাই হোকগে। এটা করতে হবে এই কারণে যে—যাতে এদের সন্দেহ করবার সময়টা চলে যায়। এরা বিশ্বাস করুক যে

পারুলে পাকিস্তানে চলে গেছে। সেইজন্যেই ট্রেনিংটা নিতে হবে। আর নিতে হবে বম্বেতে।

শি—তারপর ?

ডাঃ—তারপর, তোমার যেমন ইচ্ছে তুমি তেমনি করে বাঁচবে।

শি—আমার যদি ইচ্ছে হয় যে তোমার কাছে থেকে আমি বাঁচব। তুমি আমাকে একটা সামাজিক সম্মান দেবে। পারব কি তেমন করে বাঁচতে ?

ডাঃ—পারবে বোধহয়।

শি—আমার সমস্ত ইতিহাস জানবার পরেও ?

ডাঃ—ইতিহাসটা তো আর বর্তমান নয় !

শি—(একটু চুপ) তোমার কথা শুনে প্রচণ্ড লোভ হচ্ছে বাঁচবার। এখুনি অন্তত মনে হ'চ্ছে অতীতটা সবটাই বুঝি কল্পনা।— কিন্তু নাঃ। হয় না তা।

ডাঃ—কেন ?

শি—নিজেকেই নিজের বিশ্বাস নেই।

ডাঃ—চারপাশের জগৎটা বদলে গেলে দেখবে বিশ্বাস আপনি ফিরে এসেছে।

শি—(প্রচণ্ড চাপা আবেগে) বিশ্বাস কর, হঠাৎ তোমাকে দেবদূত বলে মনে হচ্ছে। দুঃস্বপ্নের দৈত্যগুলো যেন সত্যি কল্পনা! আর এই রাতটা শুভরাত! না না তোমাকে দেখতে এসে আমি ভুল করিনি। অমল—। [হাতটা বাড়াতে যায় ডাক্তারের দিকে। কি যেন মনে পড়ে যায়। দুঃস্বপ্নের দৈত্য ফিরে আসে। কণ্ঠস্বব চাপা আর্তনাদে পরিবর্তিত হয়]

কিন্তু পলাশের ছেলে ?—হয় না, হয় না, তা হয় না! সেই তো তোমার কাছে এলাম! যেদিন তোমাকে প্রথম দেখলাম সেদিন এলাম না কেন ?

ডাঃ—সেদিন যদি হাত পেতে নিতে পারতে, তবে আজই বা পারবে না কেন ?

শি—তখনও পলাশেব ছেলে কোথাও ছিল না। আর পলাশও—।

ডাঃ—তাতে কিছু এসে যায় না। আব ও ছেলের বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাবার সম্ভাবনাই যদি থাকে—তবে—না জন্মালেও ক্ষতি নেই।

শি—(নেশাগ্রস্তের মত) না, না, তুমি আমাকে লোভ দেখিও না। আজকে রাত্রের মত ইঁদুরটা তো একটা গর্ত পেয়েছে, কাল আবার নাও পেতে পারে !

ডাঃ—কি বলছ বানী ? তার মানে ?

শি—আমার ভয় করে, ভীষণ ভয় করে। কাল সকালেও কি তুমি এই মানুষ থাকবে ? যদি না থাক !

ডাঃ—তাহলে বল যে ভয় আমাকে ?

শি—না, না, আমাকেও। এত বছরের পাকা দাগ। আমার মনের কি এত জোর

হবে? অনেকদিন আমি তোমাকে মনে মনে দোষ দিয়েছি—তোমার মনের জোর কম বলে। কেন তুমি বিয়ে করলে বলে! কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আমারও তো মনের জোর কমই ছিল। না হলে—তোমার ওপর রাগ করে—সে লোকটার সঙ্গে অমন ভাবে মিশলাম কেন?

ডাঃ—কে সে?

শি—যে বিয়ে করবার লোভ দেখিয়ে, আস্তে আস্তে আমাকে এইখানে দাঁড় করিয়ে দিলে! মনের জোর থাকলে সত্যি কি এমনভাবে এমনটা হত! না না, আজ রাত্রেই আমায় মরতে হবে!

ডাঃ—কি! মরবে?

শি—তা ছাড়া সত্যি আমার কোন পথ নেই!

ডাঃ—পথ নেই? এখন যখন আমি বুঝতে পারছি—সমস্ত ব্যাপারটাই সহজ হয়ে এসেছে—। সত্যি শিবানী, আমার মনের সমস্ত দ্বিধা কেটে গেছে। এমনকি মা পর্যন্ত তোমাকে মেনে নিয়েছে—।

শি—তুমি তো জান না, কেন তিনি মেনে নিয়েছেন!

ডাঃ—কেন?

শি—ভয়ে। তিনি পুলিশ ডাকতে চাচ্ছিলেন। আমি ভয় দেখালাম।

ডাঃ—কিসের ভয়?

শি—তোমার এবং তাঁর চিঠি আমার কাছে আছে! আমি সেগুলো দেখিয়ে কেলেঙ্কারী করতে পারি, সেই ভয়! কখনও কাঁদতে হবে, কখনও ভয় দেখাতে হবে, কখনও—হয়ত—। এমনি করে বেঁচে থাকতে হবে? কেন? অনর্থক এ সময় নষ্ট কেন? তারপর শরীরের এই অবস্থা, কুৎসিত রোগে—

ডাঃ—তার চিকিৎসা হতে পারে!

শি—পারব না, আমি পারব না। গায়ের দাগগুলোর দিকে তাকাব, আর তোমার পাশে দাঁড়াব? হয় না, হয় না। তার চেয়ে আমাকে একটু শান্তিতে মরতে দাও না কেন?

ডাঃ—আমার সামনে আমি তোমাকে মরতে দেব? তাও তো হয় না।

শি—আজকের মত রাত কি আর পাওয়া যাবে? উপায় নেই, আমার কোন উপায় নেই। এমন তো হতে পারে কাল সবাই আমাকে চিনে ফেলল। আরও কত কি হতে পারে। তাই অন্তহীন অশান্তি থেকে বাঁচবার জন্যে আমাকে মরেই বাঁচতে দাও।

ডাঃ—সত্যি বাঁচতে পার না তুমি? অশান্তি অন্তহীন হয়ে চিরকাল থাকবে কেন?

শি—বাইরের ভয়, ভেতরের ভয়, কত যুদ্ধ করব আমি?—আচ্ছা কাল যদি কেউ আমাকে চিনতে পারে, তখন তুমি পারবে আমার পাশে দাঁড়াতে?

ডাঃ—(স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে শিবানীর মুখের দিকে) যদি না পারি,

দ্বজনেই এক সঙ্গে মরা যাবে।—হয়তো এই বয়সে বাইরের লোকের কাছে হাস্যকরই লাগতে পারে। তব্—।

শি—(একটু যেন ভয়ে) না, না।—আচ্ছা ; আমি যদি হঠাৎ এখানে মরে যাই, তুমি শিবানী প্বরকায়স্থের নামে একটা ডেথ সার্টিফিকেট দিতে পার না ?

ডাঃ—দেব।

শি—আঃ বাঁচালে, না হলে ওরা আমার দেহটাকে নিয়ে কাটাছেঁড়া করত তো আবার। তোমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া তোমার বাড়িতে বেড়াতে এসে হঠাৎ মারা গেছে। তাই সৎকার তো তোমাকেই করতে হবে। এই ভিক্ষে-টুকু তোমার কাছে না চেয়ে আমার উপায় নেই।

ডাঃ—কিন্তু সে কথা—।

[পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে ওঠে। দ্বজনেই উৎকর্ণ। ডাক্তার বেরিয়ে যায়। শিবানী আবার জলের গেলাস তুলে নেয় ম্বখের কাছে। কাজের লোক ঢোকে।]

কা—আপনার জল খাওয়া এখনও হয়নি!

[শিবানী চমকে গেলাস নামায়]

শি—না।

কা—মা আপনাকে ওপরে এসে খেয়ে নিতে বলছেন।

শি—আচ্ছা তুমি যাও। আমি যাচ্ছি।

কা—জলটা খেয়ে নেন না, গেলাসটা নিয়ে যাই।

শি—(হতাশায়) যাচ্ছি! তুমি গিয়ে মাকে বল না যে আমি আসছি এখ্বনি।

[কাজের লোক চলে যায়। শিবানী আবার জলের গেলাস তুলে নেয়। বাঁ হাতটা উঠে আসে ম্বখের কাছে। ডাক্তার আসে। শিবানী বাঁ হাতটা ল্বকোয়]

ডাঃ—থানা থেকে টেলিফোন করেছিল।

শি—(ভয়ে) কেন ? জানতে পেরেছে নাকি ?

ডাঃ—হালিমকে ওরা গ্রেপ্তার করেছে খ্বনের দায়ে।

শি—হালিম চাচাকে ?

ডাঃ—হ্যাঁ। আর হালিম নাকি একবার আমাকে ডাকবার জন্য ওদের বারে বারে অন্বরোধ করছে। তাই—।

শি—হালিম চাচাকে ধরেছে ওরা ?

ডাঃ—হ্যাঁ, ঐরকম আঘাত একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে দেওয়া নাকি সম্ভব নয়। তাছাড়া পলাশের চ্যালারা নাকি বলেছে, পলাশকে ও অনেকবারই ভয় দেখিয়েছে!

শি—যদি দেখিয়ে থাকে তাহলে আমার জন্যেই দেখিয়েছে! (হঠাৎ হেসে ওঠে) হ'ল না, হ'ল না!

ডাঃ—কি হ'ল না!

শি—ইঁদুরটার একটা গর্ত পাওয়া হ'ল না। বড় আসা করেছিলাম, আজকের রাতটাই শেষ রাত হবে! কিন্তু না, আবারও সূর্যোদয় আমাকে দেখতে হবে। সূর্যোদয়ের ওপর এত ঘেন্না কোথাও দেখেছ কি?

ডাঃ—এ সমস্ত বলছ কেন?—আমি যাচ্ছি থানায়। দেখি কি করতে পারি।

শি—কিচ্ছু করতে পারবে না! ছোটবেলায় ঠাকুমার কাছে শুনেছিলাম—বাঘে আর পুলিশে ছুঁলে আঠার ঘা। পলাশের জীবনের পরিবর্তে আর একটা জীবন পুলিশেরও চাই, আর পলাশের লোকদেরও চাই। তাই পারুল না যাওয়া পর্যন্ত হালিম চাচার নিষ্কৃতি নেই! হ'ল না!

[বাঁ হাতটা খুলে বড়িগুলো ফেলে টেবিলের ওপর]

ডাঃ—একি! এ তুমি কোথায় পেয়েছিলে?

শি—তোমার আলমারিতে! কিন্তু দরকারে লাগল না! যাক্। তোমাকে হয়তো আমাকে নিয়ে বা আমার মৃতদেহটাকে নিয়ে বিপদে পড়তে হ'ত। ভগবান রক্ষে করলেন! আচ্ছা যাই!

ডাঃ—বানী! শোন।

শি—আর কোন উপায় নেই ডাক্তার! —আচ্ছা, তোমাকে ডাক্তার ব'লে অনেক চিঠি লিখেছিলাম একসময়ে, না?—ওঃ দাঁড়াও—পাকিস্তানে যাব বলে তোমার সব চিঠিগুলো এই ব্যাগটায় ভরে নিয়েছিলাম, রেখে দাও এগুলো! (চিঠি বার করতে থাকে)—যাওয়া মাত্র ওরা নিশ্চয়ই ব্যাগটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে!

ডাঃ—এগুলো এতদিন তুমি রেখে দিয়েছিলে?

শি—[কথাগুলো খুব স্বাভাবিকভাবে বলবার চেষ্টা করে]
হ্যাঁ, যে অবস্থাতে যেখানেই থেকেছি, এগুলো কখনো সংগছাড়া করিনি! প্রথম দিকে মাঝে মাঝেই প'ড়ে দেখতাম। তারপর এই দশবারো বছর পড়িনি, কিন্তু ফেলেও দিতে পারিনি! বাঁধবার রুমালটা ময়লা হ'লে বদলে দিয়েছি কেবল। ভেবেছিলাম মরবার সময় এগুলো কাছেই রাখব। রাখতে সাধ হয়েছিল! কিন্তু আজ যেখানে যেতে হচ্ছে সেখানে ওগুলো—। (হঠাৎ থেমে যায়, তারপর হাসবার চেষ্টা করে বলে) এখন দেখছি তোমার চেয়েও তোমার চিঠিগুলোর ওপরেই মায়া পড়েছিল বেশী! ওগুলো আমার অনেক দিনের সঙ্গী।

ডাঃ—(অত্যন্ত অভিভূত, বিচলিত) বানী দাঁড়াও, এমনি ক'রে সব শেষ হ'তে পারে না! না, না, একটা উপায়—। আমি আগে থানায় গিয়ে দেখি—!

শি—অনর্থক সময় নষ্ট করে লাভ নেই। (হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে) দেখছ না—

ভগবান আমার বিপক্ষে? আমাকে ঐ ইঁদুরের মতই মরতে হবে—গর্তের বাইরে! এই, এই আমার ভাগ্য! আমি নিজে কত চেষ্টা করলাম, তুমিও তো একটু আগে কত চেষ্টা করলে—হ'ল কি কিছু? হালিম, হালিম চাচা, আমার একমাত্র বন্ধু,—তাকে যত তাড়াতাড়ি পারি আশ্বস্ত করাই কি আমার উচিত নয়!

ডাঃ—কিন্তু—।

শি—হালিম চাচার বাড়ি গয়াজেলার কাছে কোথায় যেন! সেখানে ওর বো, ওর ছেলে-মেয়েরা থাকে। প্রত্যেক মাসে ও টাকা পাঠালে তবে নাকি চলে তাদের! তাই কোথাও আর কোন কিন্তু থাকলে চলবে কেন?—চলি—

[দরজা পর্যন্ত চলে গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ায়]

ডাঃ—বানী—। (গলা বন্ধ হ'য়ে আসে যেন)

শি—আমার ভয় করছে। ভীষণ ভয় করছে!

ডাঃ—[কাছে এগিয়ে যায়। হঠাৎ হাত ধরে] তবে থাক। বানী—।

[একটু স্তব্ধতা]

শি—নাঃ! আজকে তোমার কাছে যা পেলাম, তাই দিয়ে বাকী দিনকটা কাটিয়ে দিতে পারব মনে হয়। আমার জন্যে এইটুকু শুধু কামনা করো, ততটুকু মনের জোর শেষদিন পর্যন্ত যেন আমার থাকে।

ডাঃ—চল আমি তোমাকে পেঁৗছে দিয়ে আসি।

শি—না। এ যাত্রার ডাক কেবল আমার একলার জন্যে। একলাই যেতে হবে। —আচ্ছা ডাক্তার, চলি।

[দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। ডাক্তার চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে। পর্দা নেমে আসে]

স্নুতরাং

॥ চরিত্রলিপি ॥

লক্ষ্মীবুড়ো/অজিত/নারাণ

গোপালের মা/কুন্তলা/চামেলী

মন্টু/ফটিক/দীনু

ফুল্টু/অভী/কিবলিস

গুপ্ত/মদনবাবু

লোকটি

রামজী সিং

অন্যান্য

[কোলকাতার কাছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কোন জায়গা। নিম্ন মধ্য-বিত্তের বাড়ি। মঞ্চ সাজানোর কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। পর্দা উঠলেই দেখা যায়, অল্প আলোয় একটি ছেলে আর একটি মেয়ে উত্তেজিত হয়ে কোন আলোচনা করছে ; কিন্তু কোন কথা শোনা যায় না। আলো বাড়ল, এইবার তাদের স্পষ্ট দেখা গেল। ছেলেটির হাতে একটা পিস্তল।]

সত্য—হল তো ? এবার ধর। আরে না না, ও রকম করে না। এই রকম করে ধর। আরে কী হল ?

সুব্রতা—না রে আমি পারবো না। ও আমার দ্বারা হবে না।

স—হতেই হবে। অবস্থা দেখছিস না চারদিকের। নে ধর, একটা অনেস্ট এফার্ট তো করবি।

সু—আমার ভয় করছে, আমি পারবো না।

স—ওঃ আর চোখের সামনে যদি আমাকে খুন করে যায়—তখন দেখতে পারবি তো ?

সু—চুপ কর। অলুক্ষুণে কথা বলবি না।

স—অলুক্ষুণে! বেশ, না হয় নাই বললাম। কিন্তু অনন্তদার কথা মনে পড়ে না ?

সু—আঃ তুই চুপ করবি—

স—তোর জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল তবু—

সু—কিন্তু ভেবে দেখ। একটা জলজ্যান্ত মানুষকে কী করে আমি—অনেক রক্ত বেরুবে তো তার। তার মা থাকতে পারে, তার বোন থাকতে পারে—

স—আর যেমন অনন্তদার তুই ছিলি, কিংবা তোর চাইতে আর একটু ভাল অবস্থা তার। হয়তো সে বিবাহিতা স্ত্রী। আর তোর তো বিয়েই হল না!

সু—হ্যাঁ, আমার বিয়ে হোল না। সেদিন আমার নিজের চাইতে বাবার জন্যে বেশী কষ্ট হচ্ছিল। বাবা ধার দেনা করে আমার জন্যে গয়না গড়িয়ে এনেছিল।

স—আর যেদিন বাবা গয়নাগুলো বাড়িতে আনলো, সেই দিনই—মনে আছে, মনে আছে, দিদি ?

সু—আছে, আছে, সব মনে আছে।

স—তবে কিন্তু-কিন্তু করছিস কেন ?

সু—কিন্তু আমি যে শুনেছিলাম অনেক রক্ত পড়েছিল ওর। অনেক রক্ত। উঃ সেইদিন, সেইদিন ছিল একটা বিশেষ দিন। আমি সারাদিন রান্নাবান্না করে, গা ধুয়ে ও আসবে বলে অপেক্ষা করছিলাম।

স—কিন্তু অনন্তদা এল না। [সত্য অন্ধকারে মিলিয়ে গেল]
সু—তার বদলে এলি তুই। [দৃশ্যান্তর, আবহ সংগীত এবং আলোর বদল]
সুব্রতা গুনগুন করে গান গাইছে। সত্য খুব দ্রুত প্রবেশ করে।]
সু—কী রে, কী হয়েছে?
স—কী আবার হবে?
সু—কিছু যেন লুকোচ্ছিস্?
স—কী আবার লুকোবো?
সু—তুই যখন ঘরে ঢুকলি, মনে হল তোকে কে যেন তাড়া করেছে।
স—বাবা ফেরেনি?
সু—না, বাবা একটা টিউশনি নিয়েছে। হ্যাঁরে, অনন্তদা এখনো এলো না কেন রে?
স—রোজ তো আর অনন্তদা আসে না।
সু—বারে, আজ যে অনন্তদার জন্মদিন, আমি পায়েস রান্না করেছি।
স—ফেলে দে।
সু—ঐ রকম করে কথা বলছিস কেন রে? বদ ছেলেদের সঙ্গে মিশে খুব ওস্তাদ হয়েছ? না?
স—অনুদার সঙ্গে তোর বিয়ে হবে না।
সু—তোর হুকুমে, [কিছু লোকের গলাব আওয়াজ] কিরে, তুই অমন চমকে উঠলি কেন?
স—ও কিছু না।
সু—বিয়ে হবে না কেন বললি?
স—ওটা একটা কথার কথা। অনুদার বাবা কী সব টাকার কথা বলছিল না?
সু—ন্যাকা! অনুদা যেন বাবাকে কেয়ার করছে বিয়ের ব্যাপারে। এতদিন পরে অনুদার বাবার টাকা চাইবার কথা উঠছে কিসে রে?
স—না, মাঝে মাঝে কঞ্জুস বুড়োর মুখটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে।
সু—অবশ্য একটা কথা ঠিক। বাবা হয়তো ওই ভেবেই—টিউশনি নিয়েছে আর একটা।
স—আরও একটা? বাঃ বাঃ চমৎকার!
সু—আমি অনেক করে বারণ করেছিলাম। অনুদাও খুব রাগ করেছিল। বাবা বলে—আরে ওসব না। সুবি আমার একটা মেয়ে। আমারও তো গলায় কানে একটু সোনা দিতে ইচ্ছে করে, না কি!
স—তোমারও একটু লোভ ছিল। কিন্তু—
সু—কী কিন্তু?
স—না, কিছু না, এমনি—

সু—কী হয়েছে রে? বেশ বাবা, না বললি না বললি। একটা কাজ করবি?
স—কী?
সু—একটু দেখে আসবি অনুদা বাড়ি ফিরেছে কিনা?
স—আমি পারবো না।
সু—তুই আজ এমন করছিস কেন রে?

[বাইরে কথার আওয়াজ]

স—দিদি, কেউ ডাকলে বলিস, আমি বাড়ি নেই।
সু—কেন? [বাইরে কণ্ঠস্বর "সত্য, এই সত্য!"] সত্য বাড়ি নেই। [কণ্ঠস্বরঃ "সত্যি!"] সত্যি না তো কি মিথ্যে! ["ফিরলে বলবেন লালুদা ডেকেছে। বেশী ঢপ দেবার চেষ্টা না করে তাড়াতাড়ি যেতে বলবেন।"]
সু—এই সতু, কোথায় কী করে এসেছিস?
স—আমি কিছু করিনি।
সু—তবে? বল সতু, বল্।
স—আমি যে দেখে ফেলেছি রে দিদি, আমি যে শুনে ফেলেছি।
সু—কী দেখে ফেলেছিস্? কী শুনে ফেলেছিস?
স—ঐ ডোবাটার ও পাশের পোড়ো বাড়িটার কথা মনে আছে তোর? ছোটবেলায় আমরা ওখানে খেলতে যেতাম, আর কী ভয় করতো?
সু—আমার কিন্তু ভয় করতো না। না না, করতো। একটু একটু করতো। ভয় ছাপিয়ে একটা জিনিস মনে হোত। মানে আমি স্বপ্ন দেখতাম—হঠাৎ কোন গুপ্তধন পেয়ে যাবো ওখানে। যা আমাদের সবাইকে বাঁচিয়ে দেবে। মা-র তখন কী ভয়ানক অসুখ। কিন্তু ওখানে কী হয়েছে?
স—অনুদার সঙ্গে বিয়ের কথা ভুলে যা।
সু—কী হয়েছে? সত্যি করে বল সতু।
স—লালু পালেরা ওখানে অনন্তদার বিচার করছে।
সু—কী! দু বছর আগে তো অনুদা ওদের পার্টি ছেড়ে দিয়েছিল, দু বছর পর তার বিচার কেন? কিসের বিচার?
স—বিচারও ঠিক নয় রে দিদি—ওরা অনুদাকে খুন করবে!
সু—সতু—[সত্য সুব্রতার মুখ চেপে ধরে]
স—চেঁচাসনি দিদি। যদি বাঁচতে চাস, বিয়ের কথা ভুলে যা। অনুদার কথা ভুলে যা।
সু—আমি যাবো [যেতে চায়। সত্য আটকায়।]
স—পাগলামি করিস নি দিদি মরবি।
সু—আমি বাঁচতে চাই না। আমাকে ছেড়ে দে।

স—কিন্তু আমি বাঁচতে চাই। তুই ওখানে গেলে সবাই বুঝতে পারবে না আমি তোকে বলেছি?

সু—আমি তাহলে কী করবো?

স—কিছু না।

সু—আমার কথা ছেড়ে দে! অনন্তদা না থাকলে আমরা বাঁচতাম? তোর লেখাপড়া হত?

স—লেখাপড়া হয়ে কী হল ?

সু—কী হল?

স—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কতগুলো স্বপ্ন দেখতে শিখলাম! কিন্তু তারপর—

সু—কিন্তু সেজন্য কি অনুদা দায়ী?

স—হ্যাঁ। অনুদা, বাবা, তুই, তোরা সব্বাই। কিন্তু কী লাভ হবে এসব কথা ভেবে!

সু—আমায় যেতে দে। তুই কোথাও পালা।

স—কোথাও জায়গা নেই। আমি যে জেনে ফেলেছি।

সু—তাই যদি হয়, কোন উপায়ই যদি না থাকে, তাহলে কেন অনুদাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবি না?

স—লাভ নেই। পারবো না। অনুদা মার্কড্, চিহ্নিত। আমি চিহ্নিত হতে চাই না।

সু—আমি পুলিশে যাব।

স—পাগল, কী হবে। ওবা এসে বড় জোর ঐ 'কচি' বলে ছেলেটাকে ধরে নিয়ে যাবে। ঐ যে বিধবা মায়েব ছেলে সম্প্রতি ওদের দলে যোগ দিয়েছে। ওর মত দু-একজনকে ধরতে পারে। মার দিয়ে আধমরাও করতে পারে। কিন্তু লালুদাদের তাতে কিছু এসে যাবে না—অনুদাও বাঁচবে না।

সু—ওরে, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

স—ঘটনাটা ঘটে গেলে ওতে কিছু এসে যাবে না।

সু—তোর মন নেই, হৃদয় নেই।

স—তাই বেঁচে আছি।

সু—জানোয়ার, দরজা ছেড়ে দে বলছি!

স—সামান্য একটা মানুষ অনুদা—স্বপ্ন দেখতো, আমাদেরও স্বপ্ন দেখাত। কিন্তু কী এসে যায় তাতে বল? [বাইরে গুলির আওয়াজ। সুব্রতা আর্তনাদ করতে যায়। সত্য ওর মুখ চেপে ধরে। সুব্রতা অবশ হয়ে যায়। সত্য ওকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দেয়। তারপর সামনের দিকে একটু এগিয়ে আসে] সামান্য একটা মানুষ অনন্ত বসু। কী এসে যায়, এ্যাঁ! অনন্ত বসু—যে আমাদের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিল। ঐ যারা ওকে গুলি করল, তাদেরও শিখিয়েছিল। আজ যদি আমরা অনন্তদাকে বাঁচাতে যেতাম—

পারতাম না। একটা কথা আমি বুঝতে পেরেছি। এখুনি পারলাম। আমাকে আরও চালাক হতে হবে। বুদ্ধিটাতে শান দিতে হবে। যাতে এর শোধ একদিন নিতে পারি। অনন্তদাকে যারা মারল তাদের আমি ছাড়ব না দিদি। [সুব্রতা উঠে বসেছে। তার দৃষ্টিতে ভাষা নেই। সত্য দিদিকে ধরে নাড়া দেয়।]

স—দিদি, দিদি, আমার দিকে তাকা। শোন, অনন্তদা নেই। অনন্তদা মরে গেছে! মরে গেছে অনুদা। কিন্তু গুপ্তধন হয়ে ঐ পোড়ো বাড়িতে থাকবে। কেউ জানবে না। দিদি কেবল তুই আর আমি। অনুদাকে নিয়ে একটা লুকোচুরি খেলা শুরু হবে তোতে আর আমাতে। বুদ্ধিটাকে বাড়াতে হবে দিদি। অনুদা মরে গেছে [সুব্রতা হাহাকার করে কেঁদে ওঠে। আবার আগের জায়গায় সুব্রতা। সুব্রতা কাঁদছে। আগের দৃশ্য]

সু—কিন্তু গুপ্তধন হয়ে ত অনুদা থাকেনি।

স—না, পুলিশে লাশটা নিয়ে গিয়েছিল। বত্রিশটা ছোরার আঘাতের ওপর একটা পিস্তলের মোক্ষম মার ছিল মাথার পাশে। অনুদার মৃত্যুর ছ দিন পর পুলিশ দেহটা আবিষ্কার করলো, না?

সু—হ্যাঁ। তার তিন দিন পরে বাবার হার্ট অ্যাটাক হল। পুলিশ এমন ভাবে কথা বলছিল যেন আমাদের বাবাকে আমরাই খুন করেছি।

স—সত্যি। যারা খুন করে তাদের ধরতে পারে না।

সু—ইচ্ছে করলে সবই পারে।

স—এক বছর হয়ে গেল—আমাকে ধরতে পেরেছে?

সু—সত্য! ও কথা উচ্চারণ করিস না। এখানকার হাওয়ায় কথা উড়িয়ে নিয়ে যায়।

স—কিন্তু ভাবতেও ভাল লাগে রে দিদি, যে, ঐ লালু পাল আর পৃথিবীতে নেই।

সু—কিন্তু ওর চেলারা আছে।

স—তাই তো বলছি দিদি, ওর চেলারা যেদিন মারতে আসবে—

সু—আসবে?

স—আসবেই। সেদিন তোকে যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে না হয়।

সু—না। কাঁদবো না। কেঁদে যে কিছু হয় না তাতো জানি। কিন্তু তবু কাঁদি—আবার ভাত খাই। ভাত খাই বলে রেশনে লাইন দি, কেরোসিনে লাইন দি, জলে লাইন দি। কাঁদি, তারপর আবার উনুন ধরাই, কুটনো কুটি, ভাতের জল চাপাই—আবার কাঁদি—তরকারীতে স্বাদ আনার জন্যে বাগানে লঙ্কা তুলতে যাই—আবার কাঁদি! এই যা—একদম ভুলে গেছি!

স—কী ভুলে গেলি?

স্ব—তুই সকালে যাবার সময় বলে গেলি না, তোর বাগানে জল দিতে—বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হ'ল—

স—কী আশ্চর্য, তুই জল দিসনি! আর আমি নিশ্চিন্ত হয়ে তোকে পিস্তল চালানো—যাঃ চন্দ্রমল্লিকার চারাগুলো বোধহয়—[সত্য বাগানে চলে যায়। কোথাও কোন আশ্রম জাতীয় জায়গা থেকে সংকীর্তনের সঙ্গে প্রচণ্ড খোল করতাল বেজে ওঠে।]

স্ব—এই শোন তোর কুমড়ো পাতাগুলোতে বোধহয় পোকা লেগেছে, একবার দেখে নিস। প্রথম যখন এ পাড়ায় আসি তখন ১০-১২ বছর বয়স আমার।। পূর্ব পাকিস্তান থেকে কী একটা ব্যাপারে পালিয়ে নৌকো স্টীমার, রেল, তারপর হাঁটা পথ—বেনেপোল—একে টাকা, ওকে গয়না দিতে দিতে বাবা আর মা যখন আমাদের নিয়ে এখানে এসে পৌঁছালো তখন, তখন সব নিঃশেষ। সতু তখন এইটুকখানি, একটুকু এক বাচ্চা। তখন ঐ অনুদা, অনন্ত বসু নিজের বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে এই জায়গাটা আমাদের পাইয়ে দিল। কোথা থেকে কী ঋণ এনে দিল বাবাকে—ঘর উঠল—বাবা ওই ছোট বাগানটা করলো। কিন্তু মা-র কী যে অসুখ হল! বাগান করার ধাতটা সতু অবিকল বাবাব মত পেয়েছে। কিন্তু এই খুন করবার ধাত? সে বুঝি এই শহরতলির ধাত? নাকি রাজনীতির শিকারদের বুঝি এই রকম ধাত হয়। কিন্তু অনুদা, অনুদা তো কাউকে—তবে কেন এমনভাবে—উঃ মাগো! সত্য প্রতিশোধ নিয়েছে। লালু পালের দেহটাকে অনেক ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল। লালু পাল তো শহীদ! আর অনন্তদা—! সত্যকে ওরা ডাকতে এসেছিল—সত্য তখন জ্বরে অজ্ঞান। ওরা জানতো সত্য ওদেরই একজন। অনন্তদার মৃত্যু—বাবার মৃত্যু, সত্যকে ধূর্ত করে তুলেছে। আর আমাকে—আমি কী করতে চাই আমি জানি না। [কেঁদে ফেলে। সত্য ঢোকে—হাতে দুটো ফুল।]

স—এই নে! গাছে জল দিসনি বলে এই একটা পুরস্কার। (একটা ফুল দেয়) আর পিস্তল ছোঁড়া শিখতে পারিসনি বলে এই আর একটা...। এইবার একটু চা কর। নাকি আমি নিজেই করে নেব? তুই বরং বসে বসে ভাব আর একটু কাঁদ। ওরে কেন এমন হল রে! ওরে গত বছর কত ভাল ছিলুম রে! ওরে সত্যর চাকরিটা কবে পাকা হবে রে! হাসছিস কী? কাঁদ। আমি বলে তোকে হেল্প করবার চেষ্টা করছিলাম আর তুই হাসছিস। যাই চা-টা করে ফেলি—তোর চায়ে চিনি দেবো না নুন দেবো? চিনি দিলে চোখের জল পড়ে কিম্ভূত বিস্বাদ হবে, তার চাইতে নুন দিই।

স্ব—কোথায় যাচ্ছিস্—আয় আমাকে একটু হেল্প্ কর। তোর কথাই ঠিক। তৈরী থাকতেই হবে। প্রতিশোধের যুগ তো!

স—(হাসি মুখে এগিয়ে আসে)। শোন্ আগে কয়েকটা খুব দরকারী কথা বলি।। যদি একেবারে সরিয়ে ফেলতে হয়, আর খুব তাড়াতাড়ি, তাহলে সোজা বুকে এই রকম জায়গায়। আর কোন লোককে, ধর তুই কষ্ট দিতে না চাস, সরিয়ে ফেলতে চাস জানতেই দিতে চাস না—তাহলে ঘুমের মধ্যে মাথার ঠিক এই জায়গাটাতে। আর যদি সিচুয়েশন এমন হয় যে...তাহলে যে কোন জায়গায়। তলপেটে মারলে অনেকক্ষণ ছটফট করবে—আর বুঝতে পারবে তো যে এইবার মরতে হবে অথচ কিছু করবার থাকবে না। নে ধর, এইবার টান।

সু—কিন্তু আওয়াজ হবে যে!

স—ধুর! আজকাল এরকম আওয়াজ তো এখানে ওখানে কত জায়গায় হচ্ছে। পাশের আশ্রমে কীর্তন হচ্ছে, তার হরে কৃষ্ণ হরে রামের আড়ালে...

[গুলির আওয়াজ। অন্য দৃশ্য, দুটি ছেলে।]

১ম—সমস্ত ব্যাপারটাই বাজে। চারদিন হয়ে গেল একটা লোকের খবর নেই ...আর...

২য়—এ রকম কি প্রথম হল নাকি? যত ছেলে এখান থেকে নিখোঁজ হয়েছে সবার খবর পাওয়া গেছে?

১ম—ঠিক। আর যখন পাওয়া যায় তখন মানুষটা আর মানুষ থাকে না—লাশ হয়ে যায়।

২য়—ফের শালা লাশ। হাজারবার বলেছি না যে লাশ বলবি না, বলবি নিরুদ্দেশ।

১ম—সুবিদিটার কপালই খারাপ। অনন্তদাটা ওই রকমভাবে মারা গেল—বাবাটা তার পরেই গেল, এখন ভাইটার খবর নেই।

২য়—এখন কোনদিন আর খবর এলে হয়।

১ম—তাহলে মাইরি সুবিদিটা কী করবে?

২য়—কিছু ভাবনা নেই রে—কথায় আছে না—তুমি যাও বঙ্গে কপাল আছে সঙ্গে। কপাল ঠিক একদিকে নিয়ে যাবে। মেয়েছেলের কপাল সাংঘাতিক কপাল রে। কে জানে! লক্ষ্মী বুড়োর সেবা করে বাকী জীবনটা কাটাতে হবে কিনা?

১ম—সুবিদি!

২য়—আরে যাঃ যাঃ ওরকম অনেক দেখা যায়। জানি জানি প্রথমে আমরাই সিটি দেবো—রাস্তায় চলার বারোটা বাজাবো— তারপর সুবিদি যখন অনেক পয়সা করবে—তখন ফাংশনে সুবিদিকেই প্রেসিডেন্ট করে নিয়ে আসবো।

১ম—মাইরি। আমরা শালারা এক একটা চীজ রে!

২য়—শুধু তাই নয়রে। যে সব বড় বড় লোক প্রধান অতিথি হয়ে আসবে, তারা সুবিদির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করবে।

২য়—কথাটা ওরকম ভাবে বলবার কিছু নেই। যারা জাল করছে, খাবারে ওষুধে ভেজাল দিচ্ছে—ঐ লক্ষ্মী বুড়োরা, তাদের সঙ্গে যদি হ্যান্ডশেক করা যায় তবে এসব মেয়েরা তো তুচ্ছ, তুচ্ছ।

১ম—এই যা বলেছ রাজা।

২য়—বরং বল—আমাদের বলা উচিত, মাতৃগণ তোমাদের জন্য যাহা করার দরকার ছিল আমরা তাহা পারি নাই—সেজন্য আমাদের ক্ষমা করিও।

১ম—তুই শালা একেবারে ব্যাকডেটেড। আজকাল কারো জন্যে কেউ কিছু করে না। সব নিজের জন্যে। [সুব্রতা ঢোকে]

সু—এই যে ফুল্টু, কোন খবর এখনও পাওনি?

ফুল্টু—ভাবনা নেই সুবিদি, এরকম কত হয়।

সু—তাই জন্যেই তো ভয়।

ফু—না না তা বলছি না—হয়তো কোন কারণে আপনাকে ঠিক বলে যেতে—

সন্টু—সতুদা! সতুদা তো ইন্টারভিউ দিতে গেছে।

সু—ইন্টারভিউ? কোথায়? কই আমাকে তো—

সন্—কী করে বলবে? পোস্ট অফিস থেকে তো চিঠিটা নিল। আমি তো বাই চান্স্ সেখানে ছিলাম। বলল "সন্টু, কাউকে বলিস না, ফিরে এসে দিদিকে এ্যাইসা একটা স্টান্ট দেব না।"

সু—বাঃ! তোমাকে এই রকম বলে গেছে, আর তুমি আমাকে বলোনি। বাঃ আশ্চর্য!

সন্টু—কী করবো। সতুদা বারণ করল।

সু—তবু আমাকে তোমাব বলা উচিত ছিল। ছিঃ ছিঃ, আমি চারদিন ধরে পাড়াব লোকদের উব্যস্ত কবে বেড়াচ্ছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! [চলে যায়]

ফু—এই, এরকম ঢপ দিলি কেন রে?

সন্টু—মেয়েছেলের চোখে জল দেখলে আমার ভেতরটা হাঁচড় পাঁচড় করে। মাইরি এত কষ্ট হচ্ছে।

ফু—কিন্তু এখন কী হবে? এরপর যদি কিছু হয়, সুবিদি তো বলবে সন্টু অমুকদিন, অমুক সময় সতুকে দেখেছিল, তখন?

সন্টু—মাইরি, এ তো দেখছি একটা কেলো হয়ে গেল। একদম মনে হয়নি এই কথাটা, মনে হল সুবিদিকে তো কাঁদতেই হবে সারাজীবন—একটা পুরিয়া দিয়ে দি এখন—গিয়ে ভাতটাত খাক্—

ফু—তুই কিন্তু ডেঞ্জারাসলি সাপের গর্তে পা দিলি! এ যে কে কোনদিক থেকে কী করছে বোঝবার জো নেই!

সন্টু—যাক, যা হবার হবে। সাত বছর ধরে বেকার বসে আছে। বাড়িতে মা

বলে ভাত দেব না, ছাই দেব। বাবা শালা তো কথাই বলে না। যদি এই হাঙ্গামায় কিছু হয়ে যায় তো হয়ে যাক্। আর ভাল্ লাগে না। বোস্। সেই সকাল দিয়ে একটা কথা মাথায় ঘুরছে মাইরি—তোকে তখন বললুম বটে কিন্তু সতুদাটা গেল কোথায় ?

ফ—যায়নি। নিয়ে গেছে। একটা কথা কানে এসেছিল দোস্ত। কাউকে যদি না বলিস তো বলি।

সন্টু—বল্ না তাড়াতাড়ি।

ফ—অনেকে সন্দেহ করছে, লালুদার খুনের সঙ্গে ওর সম্পর্ক আছে।

সন্—যাঃ, তা কী করে হবে ? ও তো বলতে গেলে লালুদার ডান হাত ছিল।

ফ—আমিও তো তাই জানতাম। কিন্তু—

সন্—তুই যা বলছিস তা যদি সত্যি হয় তাহলে একটা জায়গায় খোঁজ করা যায়।

ফ—কোথায় ?

সন্—বেঁচে আছে কি না জানি না। ওদের টর্চার চেম্বার আছে না ? তার পাশের গলিটার কাছে।

ফ—পাগল হয়েছিস নাকি ? ওইখানে কে যাবে ? জানের ভয় নেই ? জানের মায়া থাকে তো এইখানে—

সন্—আরে না না। আমরা কি আর শোভাযাত্রা করে যাচ্ছি। তুই একদিক দিয়ে, আমি একদিক দিয়ে, গিয়ে শুকে নিয়ে ফের এইখানে এসে ডিসপার্স।

[ওরা চলে যায়। দৃশ্যান্তর। সুব্রতাদের বাড়ি]

সু—এ কী এক অন্ধকার যুগ ! ভয়, খালি ভয়। আমাদের সমস্ত অনুভূতি চাপা পড়ে একটা অনুভূতিই বড় হয়ে উঠেছে—ভয়। আমরা কিছুই তো পাই না, আমরা খেতে পাই না, কাপড় পাই না। শুধু নিজের লোকের একটু ভালবাসা, তাও পাব না। তাও আমরাই নষ্ট করে দেব ? [চিৎকার করে।] সত্য তুই কোথায়—সত্য ! [লক্ষ্মীবাবুর প্রবেশ]

ল—সত্য কোথাও নেই।

সু—কোথাও নেই ? আপনি জানেন নাকি ? খবর পেয়েছেন কিছু ?

ল—আমি কোত্থেকে খবর পাবো ? তুমি সত্য সত্য করে চেঁচাচ্ছিলে, তাই বললুম, সত্য এ জগতে কোথাও নেই। আমি তোমার ভাই সত্যর কথা বলিনি। তোমার দুঃখুর কথা কদিনই শুনছি, তাই ভাবলাম একটা খবর নিয়ে যাই। গোপালের মা, মানে আমার স্ত্রী, বলছিলো মেয়েটার দুঃখু দেখলে চোখে জল রাখা যায় না। একা একা বাড়িতে চমকে চমকে উঠছে। আমাদের বাড়িতে এসে কদিন থাকতে বলো।

সু—আপনাদের বাড়িতে ? না না, তাহলে সত্যর গাছে জল দেবে কে ?

ল—তুমি এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! সে আমার অনেক লোকজন আছে, পাঠিয়ে দেব। চল, চল।

সু—তাছাড়া ইন্টারভিউ দিয়ে যখন ফিরে আসবে—

ল—ইন্টারভিউ দিতে গেছে? সত্য? [খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসে] কে তোমায় বললে এসব কথা?

সু—[হঠাৎ সাবধান] ওঃ, তা ইন্টারভিউ দিতে যায়নি সে কথাই বা আপনাকে কে বললে?

ল—এখানে আর কে কী বলে বলো—সব বুঝে নিতে হয়।

সু—আপনি কী বুঝে নিয়েছেন?

ল—যে তুমি এবার থেকে আমাদের বাড়িতে থাকবে।

সু—কেন?

ল—একলা থাকা উচিত নয় বলে। বয়সটা তো ভাল নয়।

সু—আপনার বয়স তো বেশ ভাল জায়গায় পেশছেছে। আপনি একলা থাকেন না কেন?

ল—একলা, আমি? কোন্ দুঃখে? একলা থাকতে পারিও না, আর তোমাদেরও একলা রাখতে চাই না। শোন, ভাই আর ফিরবে না, এস। দুঃখ থাকবে না। কী করবো বলো আইনে আটকায়, নইলে বামুনের ছেলে শালগ্রাম শিলা রেখেই......

সু—তবে যে বলেছিলেন গোপালের মা দুঃখ দেখে আমাকে—

ল—ওটা বলতে হয়। তোমাকে একটু বুঝে নিচ্ছিলাম।

সু—তা কী বুঝলেন?

ল—সোজা আঙুলে না উঠলে বাঁকা আঙুল লাগে।

সু—তার দরকার হবে না। সত্যর খবর ঠিক করে বলুন। সত্যি করে বলুন। তাহলে আপনার সোজা আঙুল সোজাই থাকবে।

ল—সত্যি বিশ্বাস কর, সত্য আর কোনদিন ফিরে আসবে না।

সু—কেন?

ল—তোমার ভাই আর কোথাও নেই। কী করবে বল, সবই অদৃষ্ট! চল এবারে।

সু—কোথায়?

ল—ঐ যে বললে সোজা আঙুলেই হবে।

সু—ও আমি আপনাকে বুঝে নিচ্ছিলাম।

ল—দেখ, ভাল করলে না, ভেবেও দেখলে না। কারণ রেহাই তুমি পাবে না। ঐ লালুর চেলাচামুণ্ডারা তোমাকেও রেহাই দেবে না। তাছাড়া অনন্তর সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা তো কারো জানতে বাকি নেই—বলতে গেলে তুমি তো তার রক্ষিতাই ছিলে।

সু—আপনি একটা আস্ত শয়তান!

ল—হেঁ, হেঁ, ডাক্তারের কাছে কী সব করতে-টরতে গিয়েছিলে—

সু—মিথ্যে কথা। একেবারে মিথ্যে। কী সাংঘাতিক!

ল—আর সতীপনা দেখিও না। ডাক্তারের খাতায় সব লেখা আছে।

সু—বেশ, বেশ, যদি তাই হয়, তাতে আপনার কী এক্তিয়ার জন্মায় আমাকে এসব কথা বলার। শয়তান, বদমাশ, পাজী কোথাকার। [যেতে উদ্যত]

ল—আহা যাও কোথায়। তুমি রাগলে না আমার বেশ ভাল লাগে। বেশ ঠিক আছে, তুমি এখানেই থাক, আমি এখানেই সব ব্যবস্থা করে দেব। [দূরে একটা আওয়াজ, লক্ষ্মীবাবু চমকে ওঠে।] ওঃ ভালো মানুষের কাল নেই। মনে রইল শয়তান, বদমাশ, পাজী,—সবগুলোরই নম্বর ধরা হবে। মনে রেখো, এক মাঘে শীত পালায় না। [চলে যায়। ফুলটু ঢোকে।]

ফু—সুবিদি, সতুদার লাশ পড়ে আছে খালের ধারে।

সু—কী?

ফু—আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। কেউ দেখলে বিপদে পড়বো। পুলিশে যান। যা হয় করুন, চললাম।

[দৃশ্যান্তর। লক্ষ্মীবাবুর বাড়ির সামনের দাওয়া।]

সন্টু—ঠিক শালা কাজের সময় লেট, [ফুলটু শিস দিয়ে ঢোকে।] কী রে, দেরি কেন?

ফু—ফিন্ শালা সেই হারুর হাঙ্গামা। কীরে তোর লক্ষ্মীবুড়ো কোথায়?

সন্—বোস্ না শালা চেপে সিট্-ডাউন করে। বুড়ো যখন কথা দিয়েছে ঠিক টাইম্‌লি অ্যাপিয়ার দেবে। সতুদাটা মাইরি বেঁচে গেল। কী জান রে!

ফু—সেই অজয়দা একবার কোন রাজার পুরুত না কার কথা বলেছিল—সেই যে বিষ খেয়ে হজম করে দিয়েছিল।

সন্—রাজা না, রাজা না। জার, রাশিয়ার জার।

ফু—ওই হোলো। রাজাও যা জারও তা। পুরুতটাব নাম কিরে?

সান্—রাসপুটিন—বিষ খেয়ে হজম করে দিয়েছিলো আর আমাদের সতুদা গুলি খেয়ে হজম করে দিলে—তিন তিনটে বুলেট!

ফু—তবে বলা যায় না! এখনও হাসপাতালে। দেখ কী হয়।

সন্—আরে ডেন্‌জার যখন পেরিয়ে গেছে তখন ভয় নেই। ও ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াবে। চেহারাটা দেখিসনি? কী রকম পাট্‌টা জোয়ান!

ফু—সুবিদিরও মনের জোরের তারিফ করতে হয়। অত রাত্রে পুলিশ নিয়ে গিয়ে হাঙ্গামা করে লাশ নিয়ে এলো তো থানায়। আমি তো শালা বলেই ভোঁ দৌড়—রাত্রে শালা ভাত গিলতে পারি না। কেবলই মনে হয় কেউ বুঝি দেখে ফেলেছে—কেউ বুঝি দেখে ফেলেছে—সে এক কেচ্ছা।

সন্—তবে থানার দারোগাটা নতুন এসেছিল তাই—আগেরটা থাকলে অত রাতে পুলিশ নিয়ে খাল-ধারে যেত থোড়াই!

ফনু—কিন্তু বেঁচেই বা কী হবে বলো? সেই এইখানেই তো আসতে হবে। থাকগে পরের কথা অতো ভেবে কী হবে? দে, বিড়ি দে একটা।

[লক্ষ্মীবাবুর প্রবেশ]

লক্ষ্মীবাবু—এই যে সনটু ফলটু, শুনেছ, সতু আর সুবি নাকি আজ ফিরে আসছে কোলকাতা থেকে। তোমাদের দলের ঐ নিমে আর ফকরে আমার পিছনে লেগেছে। বলেছে, সতু ফিরে এলে নাকি আমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে। এসব কী অন্যায় কথাবার্তা বল দিকি। মেয়েটা একলা বাড়িতে চমকে চমকে মরছে দেখে গোপালের মা আমাকে বললে—

গোপালের মা—গোপালের মা তোমাকে কোন কথা বলেনি। গোপালের মায়ের তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—কোথায় কোন বয়স্থা মেয়ে চমকাচ্ছে, তাই দেখে দেখে বেড়াচ্ছে।

ল—তোমাকে কে এখানে আসতে বলেছে, এ্যাঁ!

গো মা—এত বোমা চারদিকে ফাটছে, তোমার মাথায় একটা ফাটে না গা।

সন্—স্যার, আপনাদের দাম্পত্য কলহের ব্যাপারে আমাদের আর কেন—আমরা যাই।

ল—না না, বসো। [গোপালের মা কাছে যায়।]

ল—(হিংস্রভাবে) ভেতরে যাবে কিনা? তোমার লেকচার শুনতে এখানে কেউ আসেনি। শংকর মাছের চাবুকের কথাটা ভুলে গেছ, না দাগটা মিলিয়ে গেছে।

গো মা—মাঝে মাঝে ভুলে যাই। সত্যি ভুলে যাই। যে কথা একলা তোমার সামনে বলতে ভয় পাই, সামনে লোক থাকলে সাহস আসে। তাই বলি তোমার সর্বনাশ হোক, তাই চাই! তবু কিছু হোক, কোথাও একটা কিছু হোক।

সন্—তা হলে আমরা যাই স্যার?

ল—আরে না না। তোমাদের কাকীমা তোমাদের জন্য চা করে আনছে। যাও তো একটু চায়ের ব্যবস্থা করো। [গোপালের মা চলে যায়] হ্যাঁ সনটু, যে কথা বলছিলাম—বোস বোস। দ্যাখ, তোমাদের মত ছেলেদের আমি চিরকালই সাহায্য করে এসেছি এবং এখনও করবো। লালুর দল তো তছনছ হয়ে গেছে, নাকি?

সন্, ফনু—আজ্ঞে তা তো গেছেই।

ল—এই দল—দল টিঁকিয়ে রাখা এও এক মস্ত আর্ট, মানে শিল্প, বুঝলে না—লালু মরে গেল কিন্তু আর একটা লালু হল না, তা না হলে তোমাদের এই সতুকে ঘাড়ে গর্দান নিয়ে ফিরতে হত—নাকি?

সন্—হ্যাঁ, সে তো একশোবার।

ল—তাই বলছিলাম, এমন একটা জোয়ান নেই যার পরে ভরসা করা যায়, সবই যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। কিন্তু এই এলোমেলো অবস্থাটা থাকা ঠিক বাঞ্ছনীয় নয়। লালুকে আমি সাহায্য করতাম। তাই তার দল শক্তিশালী হয়েছিল। তার শাগরেদগুলো কোন কাজের নয়। তা যাকগে। সনটু তুমি যদি বাবা দল করো, তবে আমি তোমাদের সাহায্য করবো—যত টাকা লাগে দেব। তারপর তা দিয়ে তোমরা কালীপুজো কর কি বোমা বানাও, তাতে আমার দেখার দরকার নেই! টাকা দিচ্ছি বলে তোমাদের স্বাধীনতায় আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না। তবে ঐ নিমে আর ফকরেকে একটু শাসনে রাখবে। কে ওদের রসদ যোগান দিচ্ছে—সেটা ওদের বুঝিয়ে দেওয়া চাই। [সনটু ফুলটু পরস্পরের দিকে তাকায়।] সতুটা একটা গুণ্ডা, শয়তান, শেয়ালের মত ধূর্ত। লালুকে ওই খুন করেছে। কিন্তু এমন ভাবে করেছে, কোন ব্যাটা ধরতে পারলো না! ওকে তোমাদের শাসনে রাখতে হবে। তারপর অন্য দিকের ব্যবস্থা। তার জন্যে তোমাদের বিরক্ত করতে যাবো না। আমার অন্যলোক আছে। কী রাজী? ঠিক আছে, ভেবে ঠিক কর। আমি ভেতরে গিয়ে দেখি তোমাদের চায়ের ব্যবস্থাটা—[চলে যায়]

সন্—কী শয়তান রে! উরি বাসরে!

ফু—কিন্তু চান্সটা ভেবে দ্যাখ। সতুদা বেঁচে উঠেছে শুনেই লালুদার পয়লা নম্বর শাগরেদ ভোলা সত্যি সত্যি নিরুদ্দেশ হয়েছে। এ এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে। ময়দান ফাঁকা। ভেবে দ্যাখ।

সন্—সাত বছর বেকার! চাকরি হবে না নিশ্চিত। কী করব রে শালা, বল না?

ফু—বলছি তো। হিম্মত থাকে ঝুলে পড়। তবে তখন সুবিদি বা অমুককে তমুককে সিম্প্যাথি দেখানো চলবে না।

সন—ঐ যে বললো না. তোমরা খালি সতুর ওপর নজর রাখবে। অন্য ব্যবস্থা আমি দেখবো—তার মানে বুঝছিস তো?

ফু—তাই তো বলছি রে। তা সুবিদির কপালে যা থাকবে হবে। আমাদের তাতে কী?

সন—ঠিক বলেছিস। আমাদের কী? হ্যাঁরে এই এরিয়াটা পুরো আমাদের হবে? মাইরি?

ফু—পেট ভরে খাওয়া, ভাল সিগারেট, ভাল মাল, উরি বাপরে বাপ।

[লক্ষ্মীবাবু ঢোকে]

সন—[উঠে দাঁড়িয়ে] সত্যি স্যার, আপনার কথাটা আমার মনে একটা উত্তেজনা

এনে দিয়েছে। এই এরিয়াটাকে তো এই রকম ল'লেস করে ফেলে রাখা যায় না। বিশেষ করে সতুর মত গুণ্ডা যখন ফিরে আসছে।

অ—এস ভেতরে এস। তোমাদের কাকীমা তোমাদের জন্য চা আর ফুলুরি নিয়ে বসে আছে।

[দৃশ্যান্তর। সন্ধ্যে। দূরে হিন্দুস্থানীরা হোলির গান গাইছে। সত্য খেতে বসেছে। মঞ্চের মাঝখানে সুব্রতার ওপরে আলো]

সু—সেই—সেইদিন যখন ফল্টু এসে খবর দিল—দৌড়ে গেলাম খালের ধারে। মরা ভাইকে দেখব বলে দৌড়োছিলাম। স্থানকালের জ্ঞান ছিল না। গিয়ে দেখি গা তখনও গরম। কেমন যেন একটা আওয়াজ হোল। বললাম, ভগবান সতুকে বাঁচিয়ে দাও। দৌড়লাম থানায়। মনে পড়ল ফল্টু বলে-ছিল, পুলিশে যান, যা হয় করুন। কোথা থেকে অত শক্তি এসে-ছিল কে জানে। আজ মনেই পড়ে না ভাল করে থানার ও. সি.-র মুখটা। কেবল মনে পড়ে কত দ্রুত পুলিশ নিয়ে তিনি বেরিয়ে এসে-ছিলেন। মাঝে মাঝে এক একটা ব্যতিক্রম থাকে বলেই বোধহয় মানুষ আলো দেখে। তারপর কেমন করে কোলকাতার হাসপাতালে পেঁছলাম আমার মনে নেই। কানে এল সতুর দেহে অপারেশন হবে। হল। জ্ঞান আসবে, না আসবে না! এক একটা মুহূর্ত যেন এক একটা যুগ। জ্ঞান এল। কোলকাতার ডাক্তারেরা চেষ্টা করে সতুর দেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনলেন। সতু চোখ মেলল। কিন্তু কোথায় সেই চোখ! চোখ যেন বোবা। পুলিশ গেল জবানবন্দী নিতে। সতু হাসতে লাগল। তারপর সত্যি কথাটা জানা গেল। ভগবান সত্যি সতুকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল। সতু চিনতে পারে. বলতে পারে, কিন্তু আগের মত নয়। অত বড় শরীর যেন ১০ বছরের ছেলে। সতুর বুদ্ধিতে আর শান দেওয়া হ'ল না! (আলো বড় হয়)

স—বুদ্ধিটারে দিও জোরে শান। চল্ চল্ শ্মশান। কী সুন্দর বাজনা বাজছে। নাচবি দিদি?

সু—না।

স—জল পড়ে, পাতা নড়ে।

সু—জানিস সতু—

স—না না আমি কিছু জানি না।

সু—এই সতু কী সব বলছিস! তোর বেলফুল গাছে কুঁড়ি আসছে।

স—কে আসবে? না, কেউ আসবে না।

সু—সতু তোর বাগান দেখতে যাবি?

স—বাগান! চল শীগগির চল।

সু—না, আগে খেয়ে নে, তারপর যাব।

স—বাগানে জল দিয়েছিস? সার আনতে হবে না? না হলে চন্দ্রমল্লিকা-গুলো বড় হবে কী করে?

সু—সতু, সতু তোর মনে পড়ছে? মনে পড়ছে? তুই আমাকে সেই পিস্তল ছোঁড়া শেখাচ্ছিলি। আমি গাছে জল দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। মনে পড়ছে?

স—[ভেংচি কাটে] মনে পড়েছে? কোন্ লগনে জনম আমার—কাছে আসুক না ঘাড় মটকে দেবো। [বিড়বিড় করে আঙুল চাটতে থাকে] হাত নোংরা হয়ে গেল।

সু—আয়, হাত ধুবি আয়! [লক্ষ্মীছেলের মত হাত ধুতে যায়।] আমার কথা সব শুনবি তো সত্য? দিদির কথা শুনতে হয় না? বাড়ি থেকে বেশী কোথাও যাবি না।

স—[একগাল হেসে] হ্যাঁ শুনবো। কী একটা যেন মনে আসছে।

সু—কী? কী? মনে আসছে?

স—বাগানে জল দেবো।

সু—কাল সকালে নিজে হাতে জল দিবি।

স—তুই একটা গল্প বল।

সু—কোনটা?

স—ওই যে, ওই যে, আঃ বল না একটা।

সু—সেই ছেলেবেলার মতো? অনন্তদার গল্প শুনবি? সে সবাইকে স্বপ্ন দেখাত।

স—অনন্তদা, কোন্ অনন্তদা? কত অনন্ত আছে। এক দুই তিন... [দৃশ্যান্তর সকাল। সত্য গাছে জল দিয়ে ফেরে। আলো কমে, তারপর সকালের আলো]

সু—সত্য বাগানে জল দিয়েছিস? গাছগুলো কেমন দেখলি রে?

স—জঙ্গল, একদম জঙ্গল। আমি রোজ বাগান পরিষ্কার করি তবু জঙ্গল। জঙ্গলগুলো কে লাগিয়ে দিয়ে গেল রে?

সু—অনেক দিন আমরা এখানে ছিলাম না।

স—ছিলাম না!

সু—মনে নেই? তুই হাসপাতালে গিয়েছিলি—কোলকাতায়!

স—হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কী হয়েছিল রে?

সু—তোকে ভোলারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর—

স—হ্যাঁ আমাকে মেরেছিল, খুব মেরেছিল। এই দিদি, আবার যদি মারে ওরা। তুই কিন্তু আমায় লুকিয়ে রেখে দিস। তারপর একদিন সবাইকে খুন করে দেবো।

সু—না না ওসব কথা কখনও বলবি না, সত্য, সেই বাবা যেমন বলতো, তেমনি

করে আমরা একটা বাগান করবো! আমরা হাঁস মুরগী সব পুষবো।
আমি বলে কয়ে দেখি মেয়েদের স্কুলে সেলাইয়ের টিচারিটা যদি পাই।
বিদ্যে তো নেই!—তার সঙ্গে যদি একটা গরু রাখা যায়।

স—হাঁস মুরগী! খুব মজা হবে। [সুব্রতার খোলা চুলে হাত রাখে] কী নরম তোর চুলগুলো! [চুলগুলোতে হাত বোলাতে বোলাতে হঠাৎ শক্ত করে ধরতে থাকে।]

সু—এই সত্য, লাগছে। ছেড়ে দে, এই সত্য, সতু, কী হচ্ছে! [সত্য আরও জোরে পাক দিতে থাকে—সুব্রতা আর পারে না। প্রাণপণে ওর গালে একটা চড় মারে। সত্য বাচ্চা ছেলেদের মত ভয় পেয়ে ছেড়ে দেয়, তারপর কাঁদতে থাকে।] আমার লাগছিল। তুই কী হয়ে গেলিরে, সত্য!

স—আর করবো না। তুই আর মারিস না। [সুব্রতা কেঁদে ফেলে। সন্টু আর ফুল্টু ঢোকে।]

সন্—যাঃ বাবা। ব্যাপারটা কী? ভাই বোনে মিলে নাটক হচ্ছে না কি রে?

স—আমি আর করবো না।

সু—সন্টু ফুল্টু, ভাল আছ তো?

ফু—কী হয়েছে সুবিদি?

সু—না, কিছু না। অনেকদিন পর বাড়িতে এসে—ফুল্টু, তুমি সেদিন যা উপকার করেছিলে।

ফু—আমি! আমি আবার কী করলাম?

সু—তুমি সেদিন সত্যর খবরটা—

ফু—কী সব আবোল তাবোল বকছেন? মাথা খারাপ হয়েছে না কি?

সন্—থাক থাক সে সব বাজে কথা। এই যে সতুদা কেমন আছ? অমন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছ কেন? কী হয়েছে?

স—কী হয়েছে?

সন্—কী, দেখছো কী? ভাবছ, সন্টু চোখে চোখ রেখে কথা কইছে কী করে? দিনকাল পালটে গেছে। এই পুরো এরিয়াটা এখন আমাদের আন্ডারে। শোন, এখানে যদি টিঁকতে চাও তো খাও দাও, আপনা কাম করো। আর কোথাও নাক গলাতে যেও না। আমি জানি অবশ্য—যে আমাকে তুমি বেখাতির করবে না। তবে ঘোড়া রোগে যেন তোমাকে আবার না পেয়ে বসে। বয়সে আমি ছোট, কিন্তু বুদ্ধি তোমার চাইতে আমার কম কিছু নেই। তাই আমার ছেলেদের বিগড়োবার বুদ্ধি তুমি কোর না। সুবিদি, আপনাকেও বলে দিচ্ছি, এখানে থাকতে গেলে এ'জায়গার চাল-চলন মেনেই থাকতে হবে। বেশী চোটপাট দেখাবেন না। একে শয়তান, ওকে পাজী, এ সব বলে বেড়াবেন না। বড়দের একটু সম্মান করে কথা বলবেন।

সু—তোমরা হঠাৎ এসে এসব কেন বলছ! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না!
সন্—বুঝবেন। শীগগিরই বুঝবেন। সতুদা! ঠিক আছে?
স—ঠিক আছে।
সন্—বেশ, খুব ভাল। আমি জানি তোমার বুদ্ধিটা ঠিক রাস্তা দিয়ে চলে। মাঝখানে ভোলার সঙ্গে কি যে কেলো করে বসলে—তবে ভোলা হাওয়া। আর আমায় ফলো করলে এখানে কোন শালা তোমার কিছু করতে পারবে না। তবে অন্য কোনো পথ নিয়েছ কি—(ভঙ্গী করে)। ভুল করে কোনো বেচাল করেছ কি কেচাইন হয়ে যাবে। পাছে করে বস, তাই আগে থাকতে কথাগুলো বলে গেলাম! ঠিক আছে?
স—ঠিক আছে।
সন্—এস হ্যান্ডশেক। আমরা ফ্রেন্ডস, কী বল।
[হাত বাড়িয়ে দেয় ; সত্য হাত ধরে।]
স—(হঠাৎ চিনতে পেরে) স-ন্-টু! সন্-টু!
[উৎসাহিত হয়ে জোরে হাত চেপে ধরে।]
সন্—ঠিক আছে ঠিক আছে—আরে ছাড় মাইরি। সতুদা, এবার লাগছে ছাড়, ছাড় বলছি।
[সন্টু যত চেঁচায় সত্য যেন ভয় পেয়ে ওর হাত আরো জোরে চেপে ধরে।]
স—আঃ চেঁচাচ্ছ কেন? সবাই যদি এসে পড়ে।
সন্—হাত ছাড় সতুদা। মাইরি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। সতুদা—।
[ওর মুখে যন্ত্রণা ফুটে ওঠে। ফুল্টু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। স্ট্রাগল্ চলে। সুব্রতা ব্যাপারটা বুঝতে পারে।]
সু—সতু, সতু! ছেড়ে দে বলছি। সতু!
ফু—সতুদা কী ইয়ার্কি হচ্ছে?
সু—হতভাগা, সন্টুর হাত ছেড়ে দে। ছাড়, মার খাবি সতু। [মারতে থাকে। সত্য সম্বিৎ পেয়ে সন্টুর হাত ছেড়ে দেয়।]
সন্—কাজটা ভাল করলে না, সতুদা। গায়ের জোর দেখাচ্ছ আমাকে? আজকাল গায়ের জোর দরকার হয় না, বুদ্ধির জোর চাই। মনে হচ্ছে কলকাতায় বুদ্ধিটা বাঁধা দিয়ে এসেছ। ভালো, বোঝা গেল। আবার দেখা হবে, চলি। [ওরা চলে যায়]
সু—হতভাগা কী করলি?
স—আর করব না! সত্যি বলছি তোকে, দিদি, আর করব না। ও চেঁচাল কেন? আমার মনে হলো যদি চিৎকার শুনে ভোলারা এসে পড়ে! তুই আমায় মার, মার, মার।

সু—ভোলারা আসবে না। এবার সন্টু ফন্টু আসবে। ওদের চোখ মুখ আমার ভাল লাগল না। ওরা যদি আবার তোকে মারে!

স—ওরা আবার আমাকে মারবে?

সু—তোকে নিয়ে আমি কী করবো! বুঝতে পারছি এখানে আর থাকা যাবে না। ওদের চোখ মুখ আমার ভাল লাগল নারে। কিন্তু কোথায় পালাব?

স—চল দিদি আমরা পালাই।

সু—কথা দে আমার কথা শুনবি? আমি যেটা বারণ করবো সেটা কখনো করবি না। বল, করবি না?

স—কখনো করবো না।

সু— মনে থাকবে?

স—থাকবে।

সু—তাহলে চল এখুনি বেরিয়ে পড়ি।

স—চল! কী কী সঙ্গে নিবি রে দিদি?

সু—এই তো বেশ কথা বলিস। তবে মাঝে মাঝে তোর কী হয়? শোন, মনে থাকবে তো?

স—থাকবে রে দিদি, সত্যি থাকবে দেখিস। [ওরা আড়ালে যায়। মঞ্চে কিছুক্ষণ কেউ থাকে না। একটা সুর ভেসে আসে শুধু। তারপর ওরা দুজনে বেরিয়ে আসে।]

স—সব দরকারী জিনিস নিয়েছিস তো দিদি?

সু--হ্যাঁ। সব দরকারী জিনিস। কিন্তু সতু, এ রকম ভাবে যাওয়া যাবে না। দুজনে জিনিসপত্র নিয়ে একসঙ্গে বেরোলেই লোকে সন্দেহ করবে। একটা কাজ করতে পারবি?

স—কী? বল।

সু—এই দিক দিয়ে—এই ভেতরের রাস্তা দিয়ে পশ্চিমের ঝিল অবধি যেতে পারবি?

স—একা?

সু—হ্যাঁ একা। পারবি?

স—পারবো। তারপর?

সু—সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবি। এই দুপুরে কেউ সন্দেহ করবে না। তারপর আমি গিয়ে 'কু' দেব। তখন রেল লাইনের দিকে চলতে থাকবি। প্যারবি?

স—পারবো। তাহলে দে, আমাকে পোঁটলাটা দে। তুই সুটকেসটা নিস।

সু—না। তুই এমনি যা। যেন বেড়াতে বেড়াতে যাচ্ছিস। জিনিস আমি নিয়ে যাব। মনে আছে তো সব?

স—আছে। ভেতরের রাস্তা দিয়ে পশ্চিমের ঝিলে যাব। তারপর তুই গিয়ে 'কু' দিলেই রেল লাইন।

সু—এই তো! কে বলে তোর বুদ্ধি নেই। এগো। [সত্য ধূর্তের মত হেসে চলে যায়।] পারবে তো? তাছাড়া আর উপায়ও তো নেই। নাঃ, দুটো নেওয়া চলবে না। [দ্রুত সুটকেসটার কিছু জিনিস পোঁটলার মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। তার মধ্যে একটা পিস্তল দেখা যায়। তারপর চলতে থাকে। ঘুরে ঘুরে মঞ্চের সামনে আসে। আলো বদলাতে থাকে। কু...কু। [সত্য আসে]

স—দেখেছিস, কিছু ভুলিনি? সব মনে আছে।

সু—[চারিদিক চেয়ে] কাঁচকলা মনে আছে। কথা ছিল 'কু' শুনে শুনে তুই রেল লাইনের দিকে হাঁটবি। আমার সঙ্গে কথা বলবার কথা ছিল না। [সত্য কোনো কথা না বলে দ্রুত হাঁটতে থাকে। সুব্রতাও। ট্রেন আসবার শব্দ।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[মঞ্চসজ্জার সামান্য বদল দেখা যায়। একটা ট্রে-র ওপর অনেকগুলো গ্লাস নিয়ে সত্য মঞ্চ পেরিয়ে চলে গেল। সুব্রতা এল। কোনো একটা ঘরোয়া কাজ করতে করতে সেও চলে গেল। সমস্ত কাজের মধ্যে একটা ব্যস্ততা। একটু পরেই সুব্রতা আর ঐ বাড়ির কর্ত্রী কুন্তলা ঢুকলেন।]

কুন্তলা—সুবাসিনী, এইবার আইসক্রীম পাঠিয়ে দাও।

সু—এক্ষুণি দিচ্ছি (চলে যায়)।

ক—উঃ বাব্বাঃ। এক একটা পার্টি হয় আর প্রাণ বেরিয়ে যায়। [ছোট একটা পাখা নিয়ে নিজেকে বাতাস করেন।] তবু ভাগ্য, এই মেয়েটা এসে পড়েছিল!

অজিত—[হাতে গ্লাস] তুমি এখানে এসে বসে পড়লে! আর ওদিকে—

ক—ওদিকে যা হয় হোকগে! আর পারি না।

অ—তা বললে কি চলে নাকি!

ক—এখন থেকে চলবে।

অ—কী ব্যাপার! হঠাৎ মেজাজ খারাপ।

ক—হঠাৎ আবার কী? প্রত্যেকবার তোমার ঐ গুপ্তা সাহেবের ঐ একই রসিকতা শুনতে শুনতে আর ভালো লাগে না। আচ্ছা লোকটা ইংরেজিতে ঐ অসভ্য রসিকতা করা ছাড়া আর কিছু জানে না?

অ—হোঃ হোঃ হোঃ! এই ব্যাপার? এতদিনে আমি ভেবেছিলাম এগুলো তোমার গা সওয়া হয়ে গেছে।

ক—সহ্য করে নিই বলেই গা সওয়া হয়ে যায় না?

অ—কুন্তী! এভাবে এখানে বসে থাকলে ব্যবহারটা খুব অভদ্র দেখায়।

ক—কিন্তু অজিত, এই সব করব বলে কি আমরা জীবন শুরু করেছিলাম?

অ—না, দেশের চেহারা পাল্টে দেব বলে শুরু করেছিলাম, কিন্তু তা যখন পারলাম না তখন নিজেরাই পাল্টে গিয়ে বেশ খাপ খাইয়ে নিলাম।

ক—তুমি কবিতা লিখতে, গান লিখতে—

অ—আঃ এতদিন বাদে এ সমস্ত কথা কেন? আজ কী হুইস্কিটা বেশী খেয়েছ?

ক—কোনো সত্যি অনুভূতির কথা বললেই কি তোমাদের মনে হয় হুইস্কির জন্যেই মানুষ ঐ সব কথা বলে?

অ—আসলে কথাগুলো বাজে, মিথ্যে। সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র।

ক—ফর ইয়োর ইনফর্মেশন, আজ আমি এক ফোঁটাও হুইস্কি খাইনি।

অ—তাই বল! তাহলে এটাই তোমার এখন বিশেষ দরকার, আরে! আমার গেলাসটাও তো ওখানে ফেলে এলাম।

ক—সব সময় এই সব কথাগুলো অ্যাভয়েড করো কেন বল তো?

অ—কারণ পোস্টমর্টেম আমার কোনো দিনই ভালো লাগে না।

ক—কিন্তু ঐ পোস্টমর্টেমই আজ বিশেষ দরকার। [অজিত চলে যায়। সত্য ঢোকে।]

স—কবে পোস্টমর্টেম হবে? পোস্টমর্টেম করে ব্যাটারা কিছু ধরতে পারে নাকি!

ক—(আশ্চর্য) তুমি পোস্টমর্টেম সম্পর্কে কী জান?

স—আমি আবার কী জানব? আমি কিছু জানি না। [সুব্রতা ঢোকে]

সু—গুপ্তা সাহেব তোকে কী নিয়ে যেতে বলেছিলেন?

স—ও হ্যাঁ, একটা গেলাস।

সু—তুই বোতল থেকে কিছু খেয়েছিস?

স—না না [দ্রুত চলে যায়।]

সু—ও আপনাকে বিরক্ত করছিল?

ক—না না তোমার ভাই মাঝে মাঝে বেশ কথা বলে। দু'চারটে ইংরিজিও তো বলে। পোস্টমর্টেম কথাটা বেশ বুঝতে পারল।

সু—ও! আমরা ছোটবেলায় যখন পাকিস্তানে ছিলাম তখন একটা খুন হবার পর ঐ কথাটা সবাই খুব বলাবলি করত। সেইটা ওর মাথায় ঢুকে গেছে।

ক—তোমাদের দেখে খুব আশ্চর্য লাগে!

সু—কী?

ক—আচ্ছা, তোমার ভাই-এর কি জন্ম থেকেই এইরকম পাগলামি ভাব? না—

সু—এ্যাঁ? হ্যাঁ। ছোটবেলায় ওর একবার ভীষণ টাইফয়েড হোলো......

ক—কাজ তো ভালোই করে। বাগানটার চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে।

সু—হ্যাঁ। বাগান করতে সবচেয়ে ভালোবাসতো। তবে ওর সঙ্গে যত কম কথা বলা যায় ততই ভালো। বেশী কথা বললেই ও যেন কেমন হয়ে যায়।

ক—তুমি তো দেখি মাঝে মাঝে খুব কথা বল।

সু—হুঁ, আমাকে বলতে হয়। আমি ওর ছোটবেলার কথাগুলো ওকে শোনালে ও খুব শান্ত থাকে।

ক—সাইকোলজিক্যাল কেস্। বোঝ? মনের ব্যাপার। [দুহাতে মাথা চেপে ধরে।]

সু—আপনার কি আবার মাথা ধরেছে?

ক—হ্যাঁ, আমার ড্রেসিং টেবিলের ওপর সেই ছোট্ট শিশিটায় ছোট্ট ছোট্ট ট্যাবলেট আছে—যাও তো নিয়ে এস।

সু—আপনি এত রাতে আবার ওগুলো খাবেন? সকালে দুর্বল হয়ে পড়বেন যে।

ক—তবু এসব ছাইপাঁশ গেলার চাইতে অনেক ভালো।

সু—কাল সকালে যে কি মিটিং আছে বললেন?

ক— ও, হ্যাঁ, (হাসে) রাত্রে পার্টি কর, মদ খাও। আর সকাল বেলা বালিকা বিদ্যালয়ের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে মেয়েদের কর্তব্য সম্বন্ধে বড় বড় লেকচার দাও।

সু—তাহলে? আনবো?

ক—আনো! পারব না! শেষকালে সেবারের মতো হয়তো জিনিসপত্র ভাঙতে শুরু করব।

সু—কী বললেন?

ক—নাঃ তুমি তখন ছিলে না। [সুব্রতা চলে যায়।] কী যে করব! [একটা গান ধরে।]

অব নভ্‌মে পতাকা নাচত হ্যায়—[অজিতের প্রবেশ। হাতে গ্লাস।]

অ—এই নাও। চল ওদিকে।

ক—চল! কত কথাই বলতাম। থিসিস, অ্যান্টিথিসিস, সিনথেসিস—মদের গ্লাসে চমৎকার সিনথেসিস তৈরী হয়েছে।

অ—এমন ভাবে কথা বলছ যেন তুমি কোন এক সরলা বালিকা ছিলে। আমিই তোমাকে জোর করে এই খারাপ পথটা ধরিয়ে দিয়েছি।

ক—আমি এতটা চাইনি।

অ—চাওয়া শুরু করলে, তখন তোমার মর্জি মত জায়গায় এসে সব কিছু থেমে যাবে নাকি?

ক—কিন্তু তোমার মর্জিমত সব কিছু বেড়ে যাবে এরই বা কী কথা ছিল?

অ—পছন্দ যখন হচ্ছিল না, তখন চলে গেলেই পারতে।

ক—চলে তো যেতে চেয়েছিলাম একবার। তখন পায়ে ধরে সেধে রাখনি!

অ—সেটা কি এই পার্টি ইত্যাদির কারণে, না একটা পেটি জেলাসির জন্যে? তবে সেদিন বড় ভুল করেছিলাম। একবার দেখলে পারতাম কত দূরে যেতে, বা যেতেই কি না অ্যাট্ অল্!

ক—কী! তুমি কী মনে কর—দোষগুলো লোকের সামনে বড্ড চেপে রেখে দিই,. তাই না! তাই এখনো সকলের শ্রদ্ধেয় অজিতদা! না?

অ—চুপ কর!

ক—চুপ করে থেকে আর সহ্য করেই তো তোমার প্রগ্রেস এত বেড়ে গেছে। মস্ত বড় প্রগ্রেসিভ! কোন্ জিনিসটা বাকী আছে?

অ—ইউ স্লাট্...যখন আদর্শের জন্যে না খাওয়ার পথ ধরেছিলাম, না খেয়েও যখন কবিতা লেখা ছাড়িনি, তখন কে বলেছিল যে ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া ছেলের এরকম ভাবে শুকিয়ে মরবার কোনো মানে হয় না। কে মাথায় ঢুকিয়েছিল যে চারিদিকের সবই যখন ভেস্তে যাচ্ছে, যে যার গুছিয়ে নিচ্ছে, তখন তোমার বোকার মত পড়ে পড়ে মার খাওয়ার কোনো মানে হয় না? কে? কে?

ক—তার মধ্যে নিশ্চয়ই এই কথা ইমপ্লায়েড ছিল না যে তুমি তোমার বন্ধুর স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক প্রেম করতে যাবে?

অ—ওঃ তাইতে বড্ড গায়ে লাগে, না? আর, কুন্তী, ব্ল্যাক মানি দিয়ে গয়না গড়াতে তো ৪৭ সালের সেরা প্রগতিপরায়ণা মেয়েটির এতটুকু বাধে না! কী! বল, উত্তর দাও? তারপর ফাউ হিসেবে আমি যাই করি না কেন!

ক—শাট্ আপ্। ইউ ডিবচ্। [ওদিকে রেকর্ডে রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছে। হৈ হৈ আওয়াজ। ফটিকের প্রবেশ।]

ফটিক—অজিতদা। ও এখানে! ডিসটার্ব করলাম। আমি যাই।

অ—আরে না না। এটা এমন একটা কিছু ব্যাপার না। তুমি এমন ভাবে পালাচ্ছ যেন ভীষণ একটা কোমল প্রেমে বাধা দিলে! কী ব্যাপার বল।

ক—না, একটা নতুন কবিতা লিখেছিলাম, আপনাকে না শুনিয়ে—

অ—পড় পড়। [সুব্রতা ঢোকে। কুন্তলার হাতে শিশিটা দেয়, কুন্তলার এক হাতে মদের গ্লাস, উত্তেজনার মুহূর্তে যা সে মাঝে মাঝে খাচ্ছিল। হঠাৎ যেন তার মনে পড়ে যায়।]

ক—এই, বল না, এটা খেয়েছি, এর সঙ্গে কি আবার এই ওষুধটা খাওয়া ঠিক হবে?

অ—না না, কী আশ্চর্য, ওতে বারবিটোন আছে না! [কুন্তলা সুব্রতার হাতে ওষুধের শিশিটা দিয়ে দেয়, সুব্রতা চলে যায়।] কী হলো? পড়, ফটিক পড়। [ফটিক পকেট থেকে সিগারেটের ছেঁড়া প্যাকেট বার করে

সেটা সোজা করতে থাকে।] উঁরি বাবাঃ কী দারুণ ইনসপিরেশন। সিগারেটের খোলা কবিতা।

ক—আপনাদের বাড়িতে এলে এমন একটা ইনসপিরেশন পাই সত্যি। বিশেষ করে কুন্তীদিকে যখন দেখি—

অ—কুন্তী! ইউ আর দি ইনসপিরেশন! পড় পড়।

ক—নিশ্চুপ সমুদ্র যেন/চোখের তারায় আজো কাঁপে/বর্ষার আবেগে বন্যার বর্বর প্রতিশ্রুতি/উর্বশী কি ক্লান্ত হলো?/উন্মনা পৃথিবী চক্রাকারে ঘুরে চলে।/বন্দী শুধু তুমি। উর্বশী! উর্বশী!

অ—তারপর?

ফ—না, এই পর্যন্তই।

অ—এ্যাঁ, এতখানি ইন্‌সপিরেশন-এর অপমৃত্যু ঘটালে!

ফ—আপনার ততটা ভালো লাগল না, না?

অ—কে বললে, আরে কুন্তী সম্পর্কে কেউ এতটুকু ভালো কথা লিখলেই আমার দারুণ ভালো লাগে।

[অভী বলে একটি ছেলে দৌড়তে দৌড়তে আসে। হাসি যেন আর ধরে রাখতে পারছে না।]

ক—আরে, কী বলবে তো?

অভী—গুপ্তদা আপনাদের ঐ সতুকে খুব খাইয়েছে। উঃ উঃ! আর তারপর সরসীদিকে পার্টনার করিয়ে বলডানস শেখাচ্ছে। রবীন্দ্র-সংগীতের সঙ্গে বলডানস, উঃ বাবা, আর পারছি না!

ক—সরসী! সরসীও মাতাল হয়ে গেছে নাকি? উঃ, তোমার ঐ গুপ্তা আজ কি করছে?

[বাইরে সত্যর উত্তেজিত আওয়াজ। অভী চলে যায়। অজিত ফটিকও উঠে দাঁড়ায়। সুব্রতার কণ্ঠস্বরঃ "ছেড়ে দিন, আপনি ছেড়ে দিন।" বলতে বলতে সতুকে নিয়ে আসে। সতুর মুখটা আঁচল দিয়ে চেপে ধরেছে। ওপাশে গুপ্তার গলা—"আই উইল কিল দ্যাট সান অফ এ বিচ!"]

ক—কী হয়েছে? কী হলো?

সু—আমি জানি না। গিয়ে দেখি গুপ্তা সাহেব সতুকে এলোপাথাড়ি মারছে। যখনই ওকে গেলাস নিয়ে যেতে বলেছেন আমার তখনই—। সতুকে মদ খাইয়ে মজা দেখবার কী দরকার ছিল?

ক—আমি জানি, পারভার্ট কোথাকার!

অভী—(ঢোকে) কুন্তীদি, আপনার স্মেলিং সল্টটা দিন তো! সরসীদি অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

ক—সে কী?

অ—আমি আসছি। [বেরিয়ে যায়। গুপ্তা আসে।]

গুপ্তা—কোথায়, কোথায় গেল শয়তানটা? আমি ওকে খুন করব!

স—দিদি! আমাকে লুকিয়ে রাখ দিদি।

ক—কী হচ্ছে কী, গুপ্ত, নিরীহ ছেলেটাকে—

গু—নিরীহ! পাক্কা বদমায়েস ডু ইউ নো, সরসী অজ্ঞান হয়ে গেছে?

সু—আপনি কেন ওকে মদ খাওয়াতে গেলেন?

গু—কুন্তী, আমি তোমার মেইড এর কাছে অপমানিত হবার জন্যে আসিনি। ছোটলোক!

সু—তা ছোটলোককে মদ খাওয়াতে, নাচ শেখাতে গিয়েছিলেন কেন?

ক—জবাব দাও, গুপ্ত?

গু—তুমি তোমার ঝিএর পক্ষ নিয়ে আমায় অপমান করছ? কোথায় নেমে যাচ্ছ, কুন্তী। [অজিত দ্রুত এ পাশ থেকে ওপাশে চলে যায়।] অলরাইট। তোমাদের সাথে এই শেষ।

ক—ডোণ্ট বি সিলি গুপ্ত। কী হয়েছে?

গু—স্কাউনড্রেলটা সরসীকে এমন জড়িয়ে ধরেছে—

স—মিথ্যে কথা, আমি কাউকে জড়িয়ে ধরিনি।

গু—দেখ তোমার নিরীহ ছেলেকে—পাক্কা শয়তান। হোয়াইট ফেসড লায়ার! গরীব হ'লেই সরল হয় না কুন্তলা। আব তোমার এই সরলা ঝিটির সম্পর্কেও সাবধান। হারামজাদী আমার হাত কামড়ে দিয়েছে।

সু—এতদিন ভাবতাম, এই সমস্ত গালাগালি বুঝি আমাদের গরীব ঘরেই চলে। আপনারাও কম যান না।

ক—[ধমকে] সুবাসিনী, তোমাদের ঝি চাকরের মত রাখি না বলে বড় বেড়ে যাচ্ছ, না? আমার সামনে আমার অতিথিকে—

সু—মাপ করবেন। মাথাটা ঠিক—

গু—আমি বলছি, দে আর নট স্ট্রেট পীপল্। সত্যি ভাই বোন কিনা কে জানে।

ক—তুমি অনর্থক উত্তেজিত হচ্ছ।

গু—এতটা বিশ্বাস করে ভালো করছ না।

ক—তুমি তো আমার চেয়ে বেশী বিশ্বাস করে সরসীকে ওর সাথে নাচতে পাঠিয়েছিলে।

গু—তাইতেই তো বোঝা গেল! [অজিত ঢোকে]

অ—সরসীর জ্ঞান ফিরে এসেছে। ওকে বাড়িতে পেঁছে দেওয়া দরকার। আমি না তুমি, গুপ্ত—

ক—ও! তুমি এতক্ষণ সরসীকে নার্স করছিলে!

অ—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের গেস্টদের সম্পর্কে আমাদের একটা কর্তব্য আছে। আমার সরসীকে নার্স করা কর্তব্য, আর তোমারও গুপ্তাকে ঠাণ্ডা করা কর্তব্য।

ক—চল তাহলে আমি তুমি গুপ্তা সরসী সব একসঙ্গেই যাই! অভী ফটিক আর অন্যেরা—

অ—মিস্টার ও মিসেস রায় তো আগেই চলে গিয়েছেন। দুজন ঘুমিয়ে পড়েছে। আর ভাদুড়ী—

ক—থাক। হিসেব চাইছি না, তুমি এক-এক সময় এমন করো না, চল, তাহলে আমরা সবাইকে পৌঁছে দিয়ে আসি। সুবাসিনী, এসে যেন সমস্ত ঠিক-ঠাক দেখি!

গু—তোমরা ওদের বেশী ইনডালজেনস দিচ্ছ। [সবাই বেরিয়ে যায়।]

সু—হতভাগা, ওসব খেতে গিয়েছিলি কেন? বল! তোকে ইশারায় বারণ করলাম না আমি?

স—আর করব না রে দিদি। সত্যি বলছি আর করব না।

সু—প্রত্যেক বার তোর ঐ "আর করব না" শুনতে ভালো লাগে না, আর করব না কোন্ জায়গায় বলতে হয়, সেদিকে তো টনটনে জ্ঞান আছে। কেন নাচতে গিয়েছিলি?

স—আমাকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করছিলো। তুই তো আমাকে বলতে বারণ করেছিলি।

সু—তাই তুই নাচতে গিয়েছিলি?

স—হ্যাঁ—না, ঐ মেয়েটা বললো, এস না, কী হয়েছে? আমাকে এক, এক, দুই, তিন করে সব শেখাতে লাগল। তারপর তারপর...

সু—তারপর?

স—মনে নেই, হ্যাঁ, আমাকে বললো, ভয় পাচ্ছো কেন? আমি বললাম, কোনো শালা আমাকে ভয় দেখাতে পারবে না। ঐ লোকটা যে আমাকে মারছিল, "বাক আপ্ বাক আপ্" বলে চেঁচাল। আমি বললাম ওকে চেঁচাতে বারণ কর। গানটা তাহলে শোনা যাবে না। নাচব কী করে। মেয়েটা আমার মুখের কাছে মুখ এনে বললো, সুইট সুইট। আমি বললাম, মেয়েরা মদ খেলে আমার বিশ্রী লাগে। তা বললে, তোমার বউকে মদ খেতে দিও না, কেমন। আমি বললাম আমি তোমাকে বিয়ে করবো। তারপর তারপর কী হলো—দেখি ওই লোকটা আমাকে মারছে। ভীষণ মারছে।

সু—তোকে নিয়ে মজা করছিলো। ঠাট্টা করছিলো। বুঝতে পারিস না? তোকে একশ বার বলেছি—খালি নিজের কাজ করবি, আর কিছু করবি না।

স—করিনি তো—আমাকে জোর করে—

সু—করিনি তো আমাকে জোর করে—কেন? একটা মিথ্যে কথা ওদের বানিয়ে

বলতে পারলি না? আমার বেলায় তো খুব মিথ্যে বলতে পার—জিজ্ঞেস করলাম বোতল থেকে কি খেয়েছিলি, তখন তো না, না, না, কিছু খাইনি বলে বেশ পাশ কাটিয়ে চলে গেলি। কেন রে? কেন? তখন বুদ্ধি আসে [কান ধরে] কোত্থেকে রে তোর?

স—আর করবো না দিদি, সত্যি বলছি আর করবো না।

সু—[এক চড় মারে] ন্যাকার মতো সব সময় 'ঐ আর করবো না' শুনে আমার গায়ে জ্বর আসে সতু! ন্যাকা! এর আগে তিন জায়গায় তুই একটা না একটা কাণ্ড করেছিস, আর আমাদের পালাতে হয়েছে। এর আগে ব্যারাকপুরে যাদের বাড়িতে ছিলাম—সেখানে তো মরতে মরতে বেঁচেছিস। তাদের ছেলে তো তোকে গুলি করে মারতো, বার বার সেখানে বারণ করিনি যে ওদের কুকুর নিয়ে ওরকম আদিখ্যেতা করবি না। না, রেক্স আমাকে ভালবাসে। ভালবাসে তো সেটার ঘাড় মুটকে মারলি কেন?

স—বা রে, রেক্সই তো আগে আমার হাত কামড়ে দিল! আমি কত করে বললাম, রেক্স কামড়াস না, লক্ষ্মী ছেলে রেক্স কামড়াস না, তবু—

সু—মিথ্যে কথা বলছিস, শয়তান। আমি দেখিনি কিছু ভাবিস? তুই বিস্কুট দেখিয়ে ওকে ভুলিয়ে ছাতে নিয়ে যাসনি! বল, বল হতভাগা—

স—হ্যাঁ নিয়েছিলাম সে তা ওর সাথে খেলব বলে। তা ও আমাকে কামড়াবে কেন?

সু—তোমার খেলার রকম আমি জানি না?

স—[হাসে] খুব নরম নরম লোম ছিল রেক্সের। আর আমি যদি বলতাম, দে একটু চেটে দে, অমনি আমার হাত চেটে দিত।

সু—শোন সতু, তুই যদি একটার পর একটা এই রকম কাণ্ড করিস, তাহলে কিন্তু এবার কোথাও চাকরি পাব না, কী করে খাব বল তো?

স—না না, না খেয়ে আমি থাকতে পারবো না। উঃ কী খিদে পেয়েছে দিদি।

সু—না, আজ তোর খাওয়া বন্ধ!

স—বারে কেন? আমি কী করলাম? রেক্সই তো আমাকে আগে কামড়ে দিয়েছিলো।

সু—উঃ সতু, আজকে কী কাণ্ডটা করলি—এরই মধ্যে ভুলে গেলি?

স—আজকে?

সু—একটু আগে কার সঙ্গে নাচছিলি?

স—ও হ্যাঁ হ্যাঁ। দিদি আমি ঐ মেয়েটাকে বিয়ে করবো। কী নরম ওর চুল। ঠিক এই পর্যন্ত। কী সুন্দর।

সু—মেয়েটা মেয়েটা কী? তোর চাইতে বয়সে অনেক বড়, আর বিয়ে করবি কী? এঁদের সব মেমসাহেব বলতে হয়। তোকে আমি কত শেখাব! সতু ঠাট্টা নয়, আবার কোথায় পালাব বল দেখি? কত পালাব?

স—পালাবি দিদি? আবার পালাবি? এবার কোথায় গিয়ে লুকিয়ে থাকবো বল?

সু—পালাবি? খুব মজা না? কী করে চাকরির যোগাড় করতে হয়! না পালাব না। যেমন করে পারি এই মেমসাহেবের হাতে পায়ে ধরে এখানেই থাকব। এই মেমসাহেব তবু অনেকের চেয়ে ভালো। শরীরে একটু দয়ামায়া আছে। জানিস সতু, তুই অনুদা তোরা সব যেমন পার্টি করতিস, এরাও আগে তেমনি পার্টি করত। এখন অবশ্য এই রকম পার্টি করে। কী করব বল, ঝি যখন হয়েছি, ঝি-রা যা যা করে সব শিখতে হবে। কথা ছিল অনন্ত বোসের বৌ হয়ে আমি সংসার করবো! জানিস সতু, যদি আমার বিয়ে হত, তাহলে দেখতিস ঠিক আমি ঐ কঞ্জুস বুড়োকে, আর ঐ অনন্তদার বাবাকে বশ করে ফেলতাম। আমার ওপর রাগ করতেই পারতো না, তুই বল সতু, এতগুলো বাড়িতে কাজ করলাম, কেউ কি আমার ওপর রাগ করতে পেরেছে? শোন, তোকে একটা কাজ করতে হবে। তুই বলবি, আমি গুপ্তা সাহেবের কাছে মাপ চাইব—বল কী বলবি?

স—'আমি গুপ্তা সাহেবের কাছে মাপ চাইব।'

সু—রোজ যেটা আমাকে বলিস সেটা বলবি।

স—কী?

সু—ঐ যে "আর করব না।"

স—কিন্তু ঐ লোকটা আমাকে খুব খারাপ কথা বলেছে। আমার মনে পড়েছে, আমার বাপ তুলে গালাগাল দিয়েছে। আমাকে 'এলিফ্যান্ট, এলিফ্যান্ট' বলেছে। আর ঐ মেয়েটাকেও আমার নামে কী সব বলেছে! আমি ওর কাছে মাপ চাইব না।

সু—চাইবি না তো?

স—না, চাইব না।

সু—চাইবি না?

স—না, চাইব না।

সু—বেশ তুই তা'লে থাক। আমার যেদিকে চোখ যায় আমি চলে যাই।

স—নারে, আমাকে ছেড়ে তুই যাস না।

সু—তাহলে মাপ চাইবি বল?

স—তখন থেকে বলছি আমার খিদে পেয়েছে, তা তোর কোন গরজই নেই।

সু—দেখি কী কী বেঁচেছে!

স—অনেক বেঁচেছে রে দিদি। সব ঐ টেবিলের ওপর আছে। চল্ আমি টেবিলের ওপর বসে খাব।

সু—টেবিলে বসবি কিরে, বল চেয়ারে বসে টেবিলে খাবি। না বাবা, তুমি

এখানে বস, আমি নিয়ে আসি। একদিন চেয়ারে বসলে কবে ওদের সামনেই চেয়ারে বসে পড়বি। তোমার গুণের তো ঘাট নেই।

স—কেন, আমি কি চেয়ারে বসতে জানি না? আমাদের বাড়িতে কি চেয়ার ছিল না? না, এত ভালো ভালো চেয়ার ছিল না। কিন্তু আমি কি চেয়ারে বসে টেবিলে বই রেখে পড়াশুনা করিনি?...আমাকে কি কেউ কোন দিন ভেরি গুড্ বলে নি? ঐ...ঐ...কে?

সু—বল কে? বল সতু!

স—সেই যে চশ্মা চোখে ছিল।

সু—হ্যাঁ তারপর...অনন্ত বসু।

স—অনন্ত বসু। অনন্তকুমার বসু।

সু—অনুদা, আমাদের অনুদা, যে আর একটা চেয়ারে বসে তোকে পড়াতো—ইংরেজী, গ্রামার, অঙ্ক, এ্যালজেব্রা। মনে পড়ে সতু, মনে পড়ে? যে হঠাৎ এসে বলতো, পড়াবার মজুরী দাও সুব্রতা, এক কাপ চা, আর...আমি চায়ের সঙ্গে মুড়ি দিয়ে এলে বলত—দেখ সতু, তোমার দিদি বাড়তি জিনিস দিচ্ছে কেন? নিশ্চয়ই আর একটা বাড়তি কাজ করিয়ে নেবার মতলব আছে—আর তুই হাসতিস। যে তোকে প্রথম...

স—[চিৎকার করে] অ্যঁ, অ্যঁ, অ্যঁ—অনুদা, অনুদা গো, তুমি কোথায়?

সু—চুপ কর। মনে পড়ছে কি তোর?

স—হ্যাঁ, মনে পড়ছে, সব মনে পড়ছে। ঐ বেটা গুপ্তা, ঐ তো খুন করে-ছিল!

সু—আবার কী যা তা বলছিস্? ও কেন খুন করবে! সে তো লালু পাল।

স—লালু পাল না। গুপ্তা, গুপ্তা, না লালু পাল না। এরা সবাই বদমাশ রে দিদি, এরা সবাই বদমাশ। আমাকে বলে কিনা বাস্টার্ড্। আমি ওকে খুন করব। আমি ওকে ছাড়ব না।

সু—সতু, সতু।

স—আমি তো কিছু পারি না। আমাকে তুই লুকিয়ে রাখিস।

সু—তোকে নিয়ে সবাই মজা করে, ঠাট্টা করে, তুই কিছুই বুঝতে পারিস না। ——প্রথম যে বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় চেয়েছিলাম—সুব্রতা নাম আর স্কুল ফাইনাল পাশ শুনে সে বাড়ির গিন্নী বললেন—বাবাঃ, তোমার মত বিদ্যেবতীকে আমি কি কাজ দেব বল! তারপর কত সন্দেহ!...অবিশ্যি দেখা মাত্রই মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করবে সে-অবস্থা তো মানুষ রাখে নি। তবু বড়লোকেরা—ভদ্রলোকেরা, নিজেদের কোনো কাজই তো নিজেরা করে নিতে পারে না, তাই সুযোগ পাই! যদি বিশ্বাস করাতে পারি যে আমি চোর নই, অলস নই, আমি অল্প মাইনে নেব। হরে দরে তোমরা আমাকে সস্তাই পাচ্ছো—তাহলে টিঁকে যাই। কিন্তু টিঁকতে পারি না ঐ

সতুর জন্যে। সতু তো নয়, শত্রু, শত্রু! [গাড়ির আওয়াজ, কুন্তলা ও অজিতের প্রবেশ।]

ক—ডাইনিং রুমে সব তেমনি পড়ে আছে, তুমি কী করছিলে সুবাসিনী?

সু—সতুর মাথার খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল আর—

ক—বাঃ তাই বলে—

সু—আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। [চলে যায়।]

ক—বোগাস। এদের জন্য যে বলবো এরা সে মুখও নষ্ট করে দেয়।

অ—হুঃ! কী করবে এদের নিয়ে?

ক—ভাবছি।

অ—ভাবাভাবির আর কী আছে। আন্‌ফেয়ার হবার দরকার নেই। এক মাসের মাইনে বেশী দিয়ে—

ক—বাঃ চমৎকার! মদ খেয়ে গুপ্তার হ'ল উচ্ছ্বাস—চাকরের সঙ্গে বেরাদরী করতে গেলেন—এখন তার খেসারত দিতে হবে ওদের আর আমাকে?

অ—তোমার আবার এতে কী?

ক—নাঃ,আমার তো কিছু না। তোমার এইসব পার্টি সামলাতে হবে। তোমার সঙ্গে পার্টিতে যেতে হবে।

অ—থাম। সব সময় তোমার ঐ এক কথা ভাল লাগে না। এসব যদি সত্যি বন্ধ হয়, তখন আবার এসব কেন হচ্ছে না বলে ঘ্যানঘ্যান শুরু করবে।

ক—বেশ, পার্টির কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। সামনের মাসে বাবুল ছুটি নিয়ে আসছে না?

অ—সে কচি খোকাটি নয়। মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে পড়ছে—তার জন্যে তোমার এতো ভাবতে হবে না।

ক—আর রিঙ্কু? তার সামার ভেকেশন্ আসছে না? না কি ভেকেশন্-গুলোতেও তাকে এবার থেকে আনবে না?

অ—বাঃ বাঃ বাঃ! বাড়িতে ঝি চাকর না থাকলে বাড়ির মেয়ে বাড়িতে আসবে না?

ক—ঝক্কিটা সামলাবে কে? সে এলেই তো তার আবার একপাল বন্ধুবান্ধব আসতে থাকবে। আর তারা তো না খেয়ে যাবে না।

অ—হোটেল থেকে আনিয়ে দেওয়া যাবে।

ক—ঐ ভাবে খরচ করলে জমানো টাকা কদিন শুনি?

অ—মেয়ে ভেকেশনগুলোতেও আসবে না বলে কান্নাকাটি করছিলে। এখন যখন ব্যবস্থার কথা বলছি তখন টাকার জন্য হা-হুতাশ শুরু করে দিলে।

ক—তবু এদের তাড়াতেই হবে!

অ—কটা দিন কষ্ট হবে। আবার লোক জুটে যাবে। এরা আসার আগে এক-মাস কী করেছিলে?

ক—সেটা জানি বলেই তো বলছি। উঃ! উইদাউট্ হেল্পার আমি আর পারবো না। ছেলেটা তোমার বাগানের চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছে। দিয়েছে কি না বল? আর সুবাসিনী—এরকম ঝি পাওয়া কিন্তু শক্ত হবে বলে দিচ্ছি। ক্লাস ফাইভ-সিক্স্ পর্যন্ত পড়েছে, যে কোনো কাজের বইয়ের নাম করলে এগিয়ে দিতে পারে। রান্না-বান্না, কাপড় জামা ইস্তিরি করা থেকে কি না করছে। তার উপর যদি বলি মাথাটা টিপে দাও, পাটা টিপে দাও—কখনো বিরক্তি প্রকাশ করে না।

অ—ওদিকে দেখ কত কী সরাচ্ছে।

ক—না, আমি খুব লক্ষ্য করে দেখেছি—ও দোষ তুমি ওকে দিতে পারবে না। এরকম লোক আর একবার পাবে না এ আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি।

অ—কিন্তু কী করা যাবে। দেখলে তো গুপ্তার নেশা ছুটে যাবার পরও কী রকম ভিহিমেণ্টলি বলছিল—ওরা বাড়িতে থাকলে কিছুতেই আসবে না। সরসীও ভীষণ ভয় পেয়েছে।

ক—থাম। [কেঁদে ফেলল!] ওই বা কোন্ বুদ্ধিতে নাচতে গিয়েছিল? দুবার ডিভোর্স করেছে—কচি খুকি তো নয়। আর অভী বলল—

অ—কী বলল?

ক—কী আবার! খুবই ইয়ে করছিল আর কি?

অ—লজ্জাবতী লতা হয়ে গেলে নাকি!

ক—গুপ্তা সরসীকে বিয়ে করলেই তো পারে।

অ—হি ইজ্ নট্ দ্য ম্যারিয়িং টাইপ্। কিন্তু যাকগে। ওরা যখন এতো বেশী ইয়ে করছে—ধর ওদের বাড়ির চাকর যদি তোমাকে এরকম করে। সেই চাকর থাকলে আমরাই কি যেতে পারতাম ওদের বাড়িতে?

ক—কিন্তু বার বার বলছি যে ওকে ও রকম করতে বাধ্য করা হয়েছে।

অ—না না কুন্তী, এখানে তোমার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। যত যাই হোক, ওর ওরকম করে জড়িয়ে ধরার কোন জাস্টিফিকেশন নেই।

ক—জানই তো ওর মাথায় ছিট আছে।

অ—যতই ছিট থাক। কচি খোকা তো নয়। তাছাড়া ঐ রকম একটা ইম্বেসিলের জন্য আমি আমার বন্ধু-বান্ধব ত্যাগ করতে পারবো না।

ক—ওঃ, ভদ্রলোকের ফ্র্যাটারনিটি! "লিবার্টি. ইকুয়ালিটি, ফ্র্যাটারনিটি। দুনিয়ার মজদুর এক হও"-এর বদলে "কোলকাতার ভদ্রলোক সব এক হও।"

অ—হাঃ, হাঃ, হাঃ! দারুণ বলেছ কুন্তী। আমি একটু অ্যামেন্ড্ করি কুন্তী। বল—"কোলকাতার অভিজাত মাতালেরা এক হউন।"

[সুব্রতা ঢোকে]

ক—হয়েছে? ওদিকে গেছলে? খেয়েছ তো?

অ—কুন্তী, বলে দাও ওকে—

সু—আপনাদের কথা আমি একটু শুনে ফেলেছি। আমি কথা দিচ্ছি ও আর কখনো ও রকম করবে না।

অ—তুমি কথা দিলে তো হবে না।

সু—সতু গুপ্তা সাহেবের কাছে মাপ চাইবে।

ক—কী, এতেও হবে না?

অ—দেখি, ডাক তো ওকে। [সুব্রতা মঞ্চের যেদিকে সতু ঘুমোচ্ছে সেদিকে এসে ওকে অনেক কষ্টে তুলে নিয়ে অজিতের সামনে আনে। সত্য উদ্‌ভ্রান্ত।]

অ—আমি কী বলব, তুমিই বল কুন্তী।

ক—বাঃ, বেশ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে। সুবাসিনী, তুমিই ব্যাপারটা ওকে বুঝিয়ে বলো।

স—সতু, তুই আজ খুব অন্যায় করেছিস তো? গুপ্তা সায়েব এলে তুই তাঁর কাছে মাগ চাইবি।

স—কী?

সু—গুপ্তা সায়েবের কাছে তুই মাপ চাইবি। বলবি, আর কখনো এরকম করবো না।

স—হ্যাঁ।

অ—না, খালি মাপ চাইলেই হবে না। কখনো গুপ্তা সায়েব এলে তার সামনে যাবার সাহস যেন ওর না হয়।

সু—শুনলি তো?

স—হুঁ, হুঁ।

অ—কাল বিকেলে আমি গুপ্তা সায়েবকে নিয়ে আসব। তার পায়ে হাত দিয়ে মাপ চাইবে।

ক—তুমি গুপ্তাকে কাল নিয়ে এসো।

অ—ঠিক আছে। কাল বিকেলে গুপ্তাকে নিয়ে আসব। চলো। [অজিত, কুন্তী যেতে থাকে।]

স—তাহলে কাল বিকেলে গুপ্তা সায়েব এলে তুই মাপ চেয়ে নিবি, কেমন?

স—কোথায় গুপ্তা সায়েব? কোথায় গুপ্তা সায়েব? ওকে আমি খুন করবো।

[সবাই স্তম্ভিত। পর্দা নেমে আসে।]

তৃতীয় অঙ্ক

[কোম্পানীর মালিক মদনবাবু টেলিফোনে]

মদন—হুঁ হুঁ, ও তো আমি সমঝে নিলাম নাবানবাবু। আপনি যে তিনজনের কথা বলেছেন তাদের ভি আমি আমার লিস্টে ইন্‌ক্লুড্ করেছি। আরে

ছিঃ ছিঃ! তারা কামে আসুক না আসুক পে-র কোনো গড়বড় হোবে না।
হুঁ হুঁ সমঝলাম, সমঝলাম। এক্‌স্‌ক্লুডিংলি বিটুইন্‌ আওয়ারসেল্‌ভ্‌স্‌
—তারপর বলুন, আর খবর বলুন। আমার যাওয়া হলো না। আপনার
ভাতিজার জামাই কেমন হলো? ভেরি গুড। হ্যাঁ একটা কথা, রামজী
যেন ছাড়া না পায়। একটু খেয়াল রাখবেন। যেখানে আছে আছে।
ওটা যেন গড়বড় না হয়। হাঃ হাঃ হাঃ, ভেরি গুড। হাঁ আরে আসুন না
একদিন। একটু আড্ডা দিব। হাঃ হাঃ আপনাদের বাঙালীদের এই আড্ডা
আমার ভারী পছন্দ। কিন্তু আমরা শালারা ওটার দাম দিতে এখনও
শিখলাম না। কাম, কাম, কাম! এত কাম করলে কি আর্ট, কালচার কিছু
হোয়? বিজনেস্‌ করছি, টাকা কামাচ্ছি। আখির কী লাভ হলো! বোলেন
তো? হাঃ হাঃ, ফিকর করবেন না। সব ঠিক হবে! রাম রাম। [ফোন
ছেড়ে দেয়। বেল বাজায়। কাউকে উদ্দেশ্য করে বলে]—'আনে বোল'।
['দীনু'র প্রবেশ। একটা খাম দীনুর হাতে তুলে দেয়। তারপর একটা
কাগজে কিছু লেখে—দীনুকে পড়তে দেয়—পড়া হলে কাগজ ছিঁড়ে
ফেলে। দীনু চলে যায়। অন্য জায়গা। কিব্‌লিস্‌ দাঁড়িয়ে আছে।
দীনু আসতে ওকে ফলো করে। ও চলতে থাকে। তারপর এক জায়গায়
দু'জনে দাঁড়ায়।]

দীনু—এই নে। [টাকা দেয়।]

কিব্‌লিস—এ কি—মাত্র ৫০ টাকা? না, না দীনুদা। আর কিছু দাও। না
হলে মাইরী মরে যাব।

দ—দ্যাখ্‌ কিব্‌লিস, সব সময় ওরকম ঘ্যানঘ্যান করবি না। যা দিলাম সোনা
মুখ করে নিয়ে যা।

কি—জান্‌ রিস্‌ক্‌ করে কাজ করব আর—

দ—কিব্‌লিস্‌, জানের রিস্‌ক্‌ দীনু চক্রবর্তীকে দেখাবি না। অনেক রিস্‌ক্‌
নিয়ে এই দীনু তৈরী হয়েছে। টপ্‌-এ আসতে চাও তো রিস্‌ক্‌ নিতে
হবে।

কি—দেখ দীন্‌দা, তোমাকে সব কন্ডিশন বলেছি। বাবাটার এক্‌স্‌-রে করাতে
হবে। তাছাড়া ছোট ভাইটার স্কুলের মাইনে—

দ—ওসব ইস্কুল-টিস্কুল করে কি হবে! দলে ভিড়িয়ে নে না।

কি—কী যে ঠাট্টা কর মাইরি। ন বছর তো বয়স মোটে।

দ—আরে এই বয়সে ট্রেনিং নিলে ভালো হবে বুঝলি না। পাক্কা মাল হয়ে
বেরুবে!

কি—তার ওপর দুটো পোষ্য এসে জুটেছে! বাবার গ্রামের লোক। দুদিন
ধরে খাচ্ছে। বাবা বলে ওদের বাবার কাছে নাকি পড়াশোনা করেছিলো।

বলেছে, কাজ দেখে দে, চলে যাবে। বল দীনদা কি করি। আর কুড়িটা টাকা দাও—মা কালীর দিব্যি, না হলে মরে যাব দীনদা।

দ—তুই এমন কুকুরের মতো কেঁই কেঁই করিস না—এখন বোঝাই যায় না যে জান কবুল করে তুই রামজী সিংকে মারতে গিয়েছিলি।

কি—বল তাহলে, তোমার দলের আর ক'জন আছে যে অমনি করে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাইতেই তো রামজী সিং ধরা পড়ল। মদনবাবুর কত সুবিধে হল বলো? যদি মরে যেতাম সেদিন! রামজী তো চেম্বার বার করে-ছিলো। যদি ছুঁড়তো গুলিটা!

দ—তাহলে আপদ চুকতো। কেঁই কেঁই শুনতে হতো না।

ক—দীনদা—ওরকম করে কথা বলবে না বলছি—আর কোন শর্মাকে পেয়েছিলে রামজীর সামনে দাঁড় করাবার জন্য? আমি তোমাকে ভালবাসি দীনদা আর তুমি—

দ—এ্যাই দেখ! এই কিবলিস, তুই একটা ক্যাবলা। এই নে ধর। দশ টাকা নে। আর পারবো না। অনেক জায়গায় ভাগ দিতে হবে।

কি—না না, আমি টাকার কথা বলছি না। এখন রামজী যদি জামিনে ছাড়া পায় তখন রিস্‌ক্‌টা কার বল? আমাকে ছাড়বে না কি ও?

দ—আবে জামিন-ফামিন পাবে না।

কি—কী করে জানলে? ও তো নারানদার দলের লোক। আর নারানদাব আবার উপর তলায় শোঁকাশুঁকি আছে।

দ—এই চক্কোত্তি সব জানে রে সব জানে। মালিক নারানদাকে বলে দিয়েছে।

কি—এ্যাঁ।

দ—তবে বলছি কী? মালিক নারানদার আরো তিনটে পোষ্যকে পুষবে। ঠিক হয়ে গেছে। মদনবাবুর কাছে পে-রোল আমি দেখে এসেছি।

কি—ইস্‌—আমি শালা একটা চান্‌স্‌ পাই না।

দ—তোর চান্‌স্‌টাই বা কম কী হচ্ছে? মাসে পাচ্ছিস কত? কম কী হলো?

কি—তুমি পাওয়াটা দেখছ দীনদা। আর দোব্যমূল্য বিদ্ধি দেখছ না, তোমার আর কী। তুমি তো একটা দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই তোমার বাড়িতে সুড় সুড় করে জিনিস চলে যায়।

দ—আরে লেগে থাকতে হবে। আমারই কি একদিনে হয়েছে নাকি? যে কোন কাজে সাক্‌সেস্‌ পেতে হলে লেগে থাকতে হয়। সিন্‌সিয়ারিটি। কিন্তু ক্যাবলা একটা লোক চাই।

কি—লোক? কী হবে?

দ—নারানদার হাঁড়ির খবর চাই।

কি—ঐ দুটোকে নিয়ে আসবো দীনদা একবার?

দ—তাদেরকে বিশ্বাস করবো কী করে?

কি—না, না বিশ্বাস করা যায়!

দ—বিশ্বাস করা যায়?

কি—তুমি চেষ্টা করলে কী না হয়? নইলে রামজীকে পুলিশে ধরে? আনব দীনদা?

দ—দাঁড়া। প্ল্যানটা করতে দে! আচ্ছা মালগুলোকে নিয়ে আয় দেখি কেমন।

[কিবলিসের প্রস্থান। একটু সময় যায়, কিবলিসের সঙ্গে সুব্রতা ও সত্য আসে।]

দ—তোমরা কোত্থেকে আসছ?

সু—কোলকাতা। ওখানে এক বাড়িতে কাজ—

দ—কাজ গেল কেন?

সু—তাদের পুরোনো লোক এসে গেল তাই।

দ—রেফুজী?

সু—আজ্ঞে হ্যাঁ।

দ—ওটা কে?

সু—আমার ভাই, মাথায় ছিট্ আছে।

দ—কেন?

সু—টাইফয়েড হয়েছিলো।

দ—বাড়িতে আর কে আছে?

সু—কেউ না।

কি—আমার বাবা তো ওদের খুব ভাল বললে।

সু—আমার বাবাকে এনারা চিনতেন।

ম—নাম কি?

সু—আমার নাম সুবাসিনী, ওর নাম সত্য।

দ—লেখাপড়া?

সু—আমি ক্লাস সিক্স্, ও ক্লাস এইট্।

দ—ওটা কী কী করতে পারে?

সু—বাগানের কাজ, গাড়ি ধোওয়ার কাজ।

দ—একটা বাড়িতে তোমাদের লাগাবার চেষ্টা করব কিন্তু—। কিব্লিস্, এই-টাকে নিয়ে সর তো। [কিব্লিস্ সত্যকে নিয়ে যায়।] আমার সম্পর্কে কিছু শুনেছ? [সুব্রতা ঘাড় নাড়ে] কী শুনেছ?

সু—আপনার অনেক প্রতিপত্তি। আপনি ইচ্ছে করলেই আমাদের চাকরী হয়ে যেতে পারে।

দ—তোমাদের জন্য আমি চেষ্টা করব। কিন্তু তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। নারান চৌধুরীর নাম শুনেছ?

সু—না, আমরা তো সবে এসেছি।

দ—নারান চৌধুরী এ এলাকার খুব নামকরা লোক। নেতা। তাছাড়া অনেক রকম কাজ কারবার আছে, সে আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে বলব। আমি এখন তোমাকে যে কাজটি করতে বলবো তাতে রাজি হও ভালো, না হলে এখুনি তোমাদের টিকিট কেটে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

সু—না, না, আপনি বলুন।

দ—ঐ নারান চৌধুরীর বাড়িতে লোকের দরকার। বৌদি মানে নারানদার বৌ—ভাল লোক—তাকে বলে ও বাড়িতে আমি তোমাদের লাগিয়ে দেব। মাইনে কড়ি নিয়ে বেশী ঝামেলা কোরো না। যা বলবে, দু'একবার গুঁইগাঁই করে তাতেই রাজী হয়ে যাবে। তারপর নারানদা কী করে—তার বাড়িতে কে আসে না আসে—কী ধরনের কথাবার্তা হয়—বৌদি কখন কোথায় কতটাকা রাখেন—না, না কোন অসুবিধে হবে না। এসবগুলো একটু চালাকি করে জানবে আর আমাকে জানাতে হবে।

সু—তার মানে? আমি......

দ—তা না হলে তো বললুম—ফেরত যেতে হবে। তোমার ভয় নেই। এ কথা কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। আমার সম্পর্কে তুমি বেশী জান না। তবে দীনু চক্কোত্তি কথা দিলে কথা রাখে—

সু—না, না তা নয়। আমি যদি সব পেরে না উঠি, অত বুদ্ধি যদি আমার না হয়? তখন যদি আপনি মনে করেন—

দ—আমার তো মনে হচ্ছে তুমি পারবে। আর সত্যিই তুমি পারছো না, না, ইচ্ছে করে করছ না—ও আমি ঠিক ধরতে পারবো। লোক চরিয়ে খেতে হয় আমাকে। যদি সত্যিই না পারো—তোমাদের এখুনি চলে যেতে বলবো—আর যদি চালাকি করো—তাহলে...বুঝতেই পারছো।

সু—না না, আপনার সঙ্গে আমি চালাকি করবো, ছিঃ!

দ—চলো তা হলে।

[দৃশ্যান্তর—টেলিফোন।]

না—সত্য, এই সত্য আমার জুতো জোড়া নিয়ে আয়, হ্যাঁ হ্যালো, হ্যালো, আমি নারান চৌধুরী বলছি, আমি যা বলছি তাই হবে। ...ক'টিন?...হ্যাঁ ...না অত ছাড়তে পারবো না...টাকার খুব দরকার—হ্যাঁ হ্যাঁ—ইলেকশানে দাঁড়াবো। দাঁড়াবোই...[সতুকে] হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কী?...পরিয়ে দে, ঐ কথাই রইলো...না, এবার ছাড়তে পারবো না। আমি আসছি। [সতুকে] বললাম না জুতোটা পরিয়ে দিতে? [সত্য জুতো পরাতে থাকে—টেলিফোন বেজে ওঠে]। হ্যালো—হ্যাঁ আমি বলছি। কী? খাতাগুলো নিয়ে পুড়িয়ে ফেল—হ্যাঁ। [উঠে দাঁড়ায়] অত সোজা না। [চলে যাচ্ছে—সুব্রতা ঢোকে।]

সু—বৌদি আপনাকে একবার ভেতরে ডেকেছেন।

না—বল সময় নেই। সত্য, ব্রিফ কেস্ গাড়িতে দে। [সত্য, নারান বেরিয়ে যায়। সুব্রতা দাঁড়িয়ে থাকে। চামেলী আসে।]

চামেলী—কী হলো? বলেছিলে আমার কথা? [সুব্রতা ঘাড় নাড়ে।] তা কী বললে?

সু—একটা টেলিফোন এল তাই বোধহয়–

চ—তোমাকে কেউ ওকালতি করতে বলে নি—কী বললেন তাই বল।

সু—সময় নেই।

চ—চিরকাল শুনছি সময় নেই, সময় নেই, তা বিয়ে করতে কেন গিয়েছিলে? কেন? পার্টিতে গিয়ে, মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দেবার সময়ে তো সময় হয়, তাদের সব নিয়ে গাড়িতে পৌঁছে দেবার সময়ে সময় হয়। আমার বেলায় শুধু সময় নেই—কেন?

সু—আপনি বরং ভেতরে চলুন।

চ—তুমি আমাকে ভেতরে যেতে বলার কে? একদিন সব আগুন লাগিয়ে দেব। পলিটিক্স্ করছেন! আমিও পলিটিক্স্ করনেওয়ালা ঘরের মেয়ে। আমাকে চেনে না। আমার বাবা এম. পি. হয়েছিলো। এম. এল. এ. হতে গিয়ে হেরে ভূত তার আবার। [সত্য ঢোকে, হাতে একটা ফুলের তোড়া।] দেখি দেখি কী! আমার জন্য এনেছ? বাঃ, সত্যি তুমি কি সুন্দর বাগান করতে পার। এত সুন্দর কাজ শিখলে কোথায়?

সু—আমার বাবার খুব বাগানের শখ ছিল।

চ—আমার বাবারও শখ ছিল। আমাদের বাড়ির বাগান—সে কত বড়। তিন-জন মালী খাটতো। এদের মতো এতটুকু বাগান নাকি? সত্য, তোমাকে একদিন আমার বাপের বাড়িতে নিয়ে যাব। রানাঘাটে। বাগান কাকে বলে তুমি একবার দেখবে। যাবে? [সত্য ঘাড় নাড়ে।] আচ্ছা, তুমি কথা বল না কেন? সব সময় দিদিকে এত ভয় পাও কেন? দিদির দিকে তাকিয়ে আছ কেন?

সু—নিশ্চয় যাবে আপনি যখন বলেছেন।

চ—সত্যকে কথা বলতে দাও। কী, সত্য?

স—আপনি যখন বলেছেন।

চ—ওঃ তোতা পাখীরে! সন্ন্যাসী, যাও নিজের কাজ দেখ গে। [সুব্রতা চলে যেতে গিয়ে পেছন থেকে ইশারা করে সত্যকে চলে যাবার জন্য।] সত্য, এ জায়গাটা তোমার কেমন লাগছে?

স—খুব ভালো, যাই বাগানে জল দিই গে।

চ—ধুর, দুটোর সময় কেউ জল দেয় নাকি!

স—তাহলে অন্য কাজ করি গে।

চ—বোসো, তুমি ভাল করে খেয়েছ তো?

স—না, আমাকে ভাত কম দেয়! আমার পেট ভরে না, আমি আরো খাব।

চ—সে কী? তোমাকে পেট ভরে খেতে দেয় না! সুবাসী, সুবাসী—

স—দিদিকে ডাকবেন না, দিদি নিজের ভাত থেকে তো আমাকে দিয়েছিলো। তবু আবার আমার খিদে পেয়ে গেল। আমি আরো খাবো। [সুবাসী আসে।]

চ—শরীরটা তো কম নয়, খিদের দোষ কী? আমার বাপের বাড়িতে এ রকম দশ বারো জন লোক খায়। কই, সেখানে তো শুনিনি যে কারুর পেট ভরে না। ঐ বাড়ির হাওয়াই আলাদা। সুবাসী, তুমি বেশী করে চাল নেবে। দেখবে সত্য'র যাতে খাবারে কম না পড়ে। [বাইরে থেকে দীনুর গলা।] এস, এস দীনু' কী খবর? সেই যে এদের দিয়ে গেলে আর পাত্তাই নেই।

দ—সময় পাই না বৌদি। তা এরা কেমন কাজকর্ম করছে?

চ—সুবাসী, তুমি সত্যকে নিয়ে গিয়ে কিছু খেতে দাও। [ওরা ভেতরে যায়।]

দীনু—কেন, খায়নি বুঝি?

চ—আরে নাঃ। আমাদের বাড়িতে খাবার অভাব নাকি? আমার বাবা সে রকম ঘর দেখে তো আর বিয়ে দেয়নি। আসলে খাঁই। অতবড় চেহারাটা তো! আর বলতে কি—খাটেও কম না। ঐ দেহে যেন মোষের শক্তি।

দ—কমিশন্ দিন বৌদি, কমিশন্ দিন। এত কম মাইনেয় দু'দুটো লোক। তার ওপর মোষের মত খাটছে।

চ—ফাজলামি করো না। আর খবর বল।

দ—খবর তো আপনি দেবেন বৌদি। দাদার মন মেজাজ কেমন?

চ—তোমার দাদার কথা আর বোলো না। সে তার কাজ নিয়ে রয়েছে। এই মিটিং, এই কে ফোন করল, এই কী হলো। আমি এসে পড়লে আবার ফোনে সাটে কথা বলে। আমার বাবাও পলিটিক্স্ করতো। কিন্তু এমন ব্যবহার বাবার কাছে তোমরা পাবে না। যেমন লম্বা চওড়া চেহারা, তেমনি কথায়, কি কাজে, কি রসিকতায় সমান তাল।

দ—কিন্তু বৌদি, আজ একটা প্রার্থনা নিযে এসেছি। মঞ্জুর করতেই হবে।

চ—কী?

দ—একশোটা টাকা দিতে হবে বৌদি।

চ—না ভাই, এত ঘন ঘন টাকা চাইলে—

দ—বৌদি, মনে করে দেখুন দেড় মাস আগে একবার চেয়েছিলাম। সেবার অর্ধেক দিয়েছিলেন—এবার ভাইয়ের মুখটা একটু রাখবেন বৌদি।

চ—ফাজিল ছেলে। কিন্তু তোমার দাদাকে কিছুতেই এ টাকার কথা বলতে পারবে না।

দ—সে কি আমি জানি না বৌদি। ওঃ বৌদি, আপনার ঐ সুবাসীকে দিয়ে এক গ্লাস জল পাঠিয়ে দেবেন তো। বাপ্‌রে যা রোদ বাইরে। [চামেলী ভেতরে যায়। দীনু গান ধরে। একটু পরে সুবাসী জল নিয়ে আসে।] চট্‌পট বলো কি খবর ?

সু—এদের ভাবগতিক কিছু বুঝতে পারি না।

দ—চট্‌পট বল। সময় বেশী নেই।

সু—অনেক টাকা বৌদির কাছে আছে। কিন্তু কোথায় তা এখনও বুঝতে পারিনি। একটু আগে—বাবু কার সঙ্গে ফোনে কথা বলতে বলতে বললেন 'পুড়িয়ে ফেল।' কিন্তু কী, আমি বুঝতে পারিনি আর আমি এলেই বাবু ইংরাজীতে ফোনে কথা বলেন।

দ—কিছুই বুঝতে পারো না ?

সু—যা বুঝতে পারি তাতে কিছুই আন্দাজ করতে পারি না।

দ—যাক্‌গে পরশু রাতে সজাগ থাকবে। অনেক মাল এ বাড়িতে আসবে—অবশ্য প্ল্যান যদি না বদলায়। আমার বিশ্বাস এ বাড়িতে চোরা কুঠরী কিছু আছে। সেই পুরো খবরটি আমাকে ভাল করে বলতে হবে।

সু—আমার ভীষণ ভয় করছে। এ আপনি কী বলছেন! এ আমি কী করে করব ?

দ—করবে, না করলে তো চলবে না। এর জন্য তোমাকে আলাদা মজুরী দেওয়া হবে। এই যে বৌদি চট্‌পট আসুন। [সত্য আর চামেলীর প্রবেশ।] তখন থেকে এই ভোঁদাটার সঙ্গে কী কথা বলছিলেন!

চ—তুমিই বা সুবাসীর সঙ্গে কী বলছিলে ?

দ—জিজ্ঞেস করছিলাম, কী রকম লাগছে? ও তো আপনাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বলছে এর আগে এমন মনিব পায়নি।

চ—তা আমার বাড়িতে তো কোনো ঝামেলা নেই। আর আমার মনও তেমন নয়। ঝি-চাকরকে ঝি-চাকরের মত আমি দেখতে পারি না। এই নিয়ে আমার ওর সঙ্গে কত সময় তর্ক হয়। মুখে বলবে সোস্যালিজম, আর ঝি-চাকরের সঙ্গে ব্যবহারের বেলায়—

দ—বৌদি, দাদা সম্পর্কে এটা বাজে কথা।

চ—এই নাও ভাই, [টাকা দিলেন] এর মধ্যে ১০০টা টাকা বেশী দিলাম। সত্যকে একটু নিয়ে যাও। ওর একটা প্যান্ট, শার্ট কিনে দিও। ওর কাপড় আর জামার যা অবস্থা! দেখলে তো বাজে বকছিলাম না। কাজে কথায় এক।

দ—নারানদার যোগ্য সহধর্মিণী আপনি, বৌদি। নারানদা বক্তৃতা দিচ্ছেন—আর আপনি কাজে করে দিচ্ছেন—নারানদার পরিপূরক। সুবাসিনীর জন্য একটা শাড়ী হবে নাকি ?

চ—তোমার কি শাড়ীর দরকার আছে?
সু—না না আমার কিছু দরকার নেই।
দ—তাহলে চলো সত্যপদ, দেখি!
সু—আপনি ওকে বাড়ি পেঁাছে দেবেন, নইলে—
দ—কোন ভাবনা নেই। যদি ম্যানেজ করতে পারি তোমারও একটা শাড়ী হয়ে যাবে।
চ—দীনু, বাজে খরচ করবে না একদম!
দ—আর একটা জিনিস—একটা বেবী ফুড।
চ—বেবী ফুড? বাড়িতে বেবীই নেই তার—
দ—হয়ে যাক একটা বেবী ফুড সত্যর জন্য। কি বলেন বৌদি? বাড়িতে স্টক আছে?
চ—কি যে সব হেঁয়ালি কর বুঝি না। তোমার দাদা সেই কোন্ কালে বেবী ফুডের ব্যবসা করেছিল।
দ—ঠিক বলেছেন বৌদি, আবার যে করবে না তার ঠিক কী? ওটা বাদই দি। [দীনু আর সত্য বেরিয়ে যায়।]
চ—দীনুর সঙ্গে সাবধানে মিশো। অত গদ্‌গদ হওয়া ভালো না, ওর চরিত্র সুবিধের নয়।
সু—উঁন আমাকে কাজের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।
চ—কাজেই তো অকাজের শুরু।
সু—আপনার বাবার বাড়িতে লোকের দরকার নেই?
চ—কেন?
সু—না, তেমন হলে আমরা সেখানে গিয়েও কাজ করে দিতে পারি।
চ—যেই শুনেছ আমার বাবা আরো বড়লোক, অমনি লোভে সুড়সুড়ি লেগেছে না? এখানের মত আপনা হাত জগন্নাথ সেখানে হবে না। তবে তুমি যদি চাও, আমি তোমাকে ওখানে পাঠিয়ে দিতে পারি।
সু—আমাকে একলা? কিন্তু সতু?
চ—তোমার ভাই কি কচি খোকা নাকি?
সু—তা নয়। কিন্তু ওর মাথায় একটু—
চ—কিছু নেই। তুমি বলে বলে এ রকম করেছ। একটু বোকা আছে। তাই বলে—দাঁড়াও, মাকে একটা ফোন করে দেখি। মা কেবলই বলে একটা ভাল লোক দেখে দে।
সু—না, শুনুন, ওকে ছেড়ে আমি যেতে পারব না।
চ—আদিখ্যেতা! এখানেও কাজ, সেখানেও কাজ?
সু—আমি যাব না।
চ—যাবে না মানে? তোমাকে যেতেই হবে। মা আমার বাতের ব্যথায় কষ্ট

পাচ্ছে। কত বার বলেছে, একটা ভাল লোক দে। আমি যদি বলি তোমাকে যেতে হবে।

সু—দেখুন ভুল করে কথাটা বলে ফেলেছিলাম। আমি কোথাও যেতে চাই না, এখানেই থাকবো।

চ—আহা হা, কেন বলো তো! এখানে নিশ্চয় কারো না কারো সঙ্গে একটা ফ্যাসাদ বাঁধিয়েছ। কী, দীনুর সঙ্গে!

সু—এসব কী বলছেন?

চ—ঐ সবই হয়। দীনু যখন শাড়ীর কথা তুললে তখনই বুঝেছি। [নারান ব্যস্ত হয়ে ঢোকে ।]

ম—তোমরা এখানে কী করছ—ঘর থেকে বেরোও তো।

চ—অমন কুকুরের মত তাড়াচ্ছ কেন!

ন—কেন আসো এই ঘরে! [চামেলীরা যায়।] হ্যালো। ৪৪-৩৯৮৭, আমি একটু মিঃ ভৌমিকের সঙ্গে কথা বলতে চাই। বলুন, আমি কল্যাণীর চৌধুরী কথা বলছি—নারান চৌধুরী। দাদা—আমি নারান কথা বলছি। সেদিন গাড়িতে সেই যে একটা কথা বলেছিলাম না, রামজি সিং-এর জামিনের ব্যাপারে। ব্যাপারটা খবই তুচ্ছ। এ্যাঁ, হ্যাঁ, লোয়ার কোর্টে মুভ্ করবার জন্য উকিলবাবুকে আসতে বলেছি। আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি কেমন আছেন? আচ্ছা, রাখছি তাহলে নমস্কার। [বসার পর উকিল-বাবু ঢোকে।]

উকিল—কী ব্যাপার! একেবারে জোর তলব?

ন—রামজির কথা নিশ্চয়ই মনে আছে।

উ—হ্যাঁ, মনে আছে।

ন—ওর একটা জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে।

উ—জামিন! মানে রামজি সিংএর! আরে মশায় ওর নামে যে অনেক কেস্ ঝুলছে। তাছাড়া গোড়ার দিকে আপনিই তো বলেছিলেন ও যাতে ছাড়া না পায় সেই ব্যবস্থা করতে?

ন—হ্যাঁ ঠিক। কিন্তু সিচুয়েশন এখন পালটে গেছে। রামজি সিং ছাড়া আমি একেবারে অচল।

উ—বেশ, কাল কোর্টে একটা মুভ্ করে দেখছি। কিছু টাকা পয়সা দিন। বুঝতেই তো পারছেন। ওদিকে আবার অনেক খরচ পত্তর রয়েছে।

ন—খরচ-পত্তরের জন্য আপনি ভাবছেন কেন? এই নিন [খাম এগিয়ে দেয়] এতে পাঁচশো টাকা আছে।

উ—আপাতত এই দিয়েই চলুক। পরে দেখা যাবে। একটা কথা। রামজি ছাড়া পেলে কিবুলিস্ ছেলেটার খুব বিপদ হবে। গত ইলেকশনে কিবুলিস্ আপনার হয়েই খেটেছিল।

ন—আরে মশাই কিব্লিসের চেয়ে রামজি অনেক বেশী কাজের লোক। আর ইলেকশন হচ্ছে মস্তবড় একটা যজ্ঞের মত, বা যুদ্ধের মত। এতে দু একটা বলি এদিক ওদিক হয়েই থাকে। ও আমাদের কিছু করবার নেই। [উকিল যায়, টেলিফোন বাজে।] হ্যালো। হ্যাঁ, হ্যাঁ পরশু অ্যাট মিড-নাইট। না মোড়ের মাথায় থামবে, নিয়ে আসার অন্য ব্যবস্থা। হ্যাঁ হ্যাঁ। [ছেড়ে দেয়] এই মালগুলো আটকে রেখে যদি ঠিক সময়ে ছাড়তে পারি তাহলে—আশা করা যায় ফিফ্টি থাউজ্যাণ্ড। সত্যি সত্যি! [সুব্রতা ঘরে ঢোকে।]

সু—সত্য বাড়িতে নেই।

ন—বেরিয়েছে? কার হুকুমে?

সু—বৌদি পাঠিয়েছেন।

ন—কোথায়?

সু—দোকানে।

ন—কেন? [চামেলীর প্রবেশ।]

চ—ওর জামা কাপড়গুলো একদম ছেঁড়া ছিল—তাই পাঠিয়েছি। কী হয়েছে তাই?

ন—আমি যখন বাড়ি আসব আমার চাকব তখন আমাকে অ্যাটেণ্ড্ করার জন্য এইখানে থাকবে।

চ—বল না তোমার কী চাই? সুবাসী করে দিচ্ছে।

ন—আমার কী চাই, বাড়িতে এতক্ষণ পরে এসে আমাকে বলতে হবে?

সু—একটু চা করে আনব?

ন—হ্যাঁ যাও। [সুব্রতা চলে যায়] তোমার চাইতে তোমার ঝি-এর বুদ্ধি অনেক বেশী।

চ—অমনি করে কথা বলছো কেন? ও যদি শুনে ফেলতো। আমি কি তোমার দু চোখের বিষ হয়েছি? বিয়ে করেছিলে কেন?

ন—পলিটিক্সের ঘর দেখে বিয়ে করলাম। ভাবলাম একটু সাহায্য হবে।

চ—তুমি তো আমাকে কিছুই করতে দাও না!

ন—কাকে দেব? দিনরাত তো খালি হিন্দী সিনেমা দেখবে।

চ—এই দ্যাখ, এ পোড়া জায়গায় হিন্দী সিনেমা ছাড়া তো আসেই না, তা কি দেখব?

ন—উঃ ভগবান। সে সব কথা নয়। তোমার মন অন্য দিকে। এ ব্যাপারটা তুমি বোঝোই না। থাক্গে, কথা বলে সময় নষ্ট করে তো কিছুই লাভ নেই।

চ—আমার সঙ্গে কথা বললে তোমার সময় নষ্ট হয়, না?

ন—প্যানপ্যানানি ভাল লাগে না যাও। আমার অন্য চিন্তা আছে।

চ—অন্য চিন্তা মানে তো কী করে কার সর্বনাশ করবে তাই!

ন—চামেলী, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

চ—একদিন তোমার ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবো।

ন—চেষ্টা করো। এই নাও দু হাজার আছে এখানে, হিসেব রেখো।

চ—এত টাকার হিসেব রাখা যায় নাকি?

ন—তা হলে দাও।

চ—ইঃ, একবার যখন দিয়েছ ফেরত পাচ্ছ যেন—[হাসতে হাসতে বেরিয়ে যায়।]

ন—ইডিয়ট। এই বুদ্ধি নিয়ে আমাকে হেলপ্ করতে এলেই হয়েছিল আর কি! [সুব্রতা চা নিয়ে ঢোকে।] এতদিন তোমাকে ভাল করে লক্ষ্যই করিনি। তোমার তো বেশ বুদ্ধি আছে মনে হয়। শুনেছিলাম ভদ্রঘরের তোমরা। তুমি কি বিধবা?

সু—না, আমার বিয়ে হয়নি।

ন—কেন?

সু—আমাদের অবস্থা ভাল ছিল না।

ন—ওঃ! অন্য কোন কারণ নয়?

সু—আজ্ঞে না।

ন—তোমাকে বিশ্বাস করা যায় কি? বিশ্বাস করা যায় তোমাকে?

সু—অবিশ্বাসের কাজ তো কিছুই করিনি।

ন—দীনু বলে যে লোকটা আসে এখানে, ও এসে এখানে কী করে না করে, একটু লক্ষ্য রাখবে। কী, পারবে না?

সু—আচ্ছা, আমাকে আর কোথাও পাঠিয়ে দেবেন না, আপনাদের এখানেই যেন কাজ করতে পাই!

ন—আচ্ছা সে দেখা যাবে।

দীনু—[বাইরে] আসছি বৌদি।

ন—এস এস দীনু।

দ—আরে দাদা যে, অনেকদিন দাদার খবর নেই। খুব ব্যস্ত না দাদা?

ন—তোমার খবর কী?

দ—আপনার আশীর্বাদে চলে যাচ্ছে। বাজারে একটা খবর শুনলাম। সত্যি? দাদা, আপনি নাকি ইলেকশানে দাঁড়াবেন?

ন—তুমি কী বল? দাঁড়ালে কেমন হয়?

দ—ভালই হবে দাদা।

ন—এই সত্য, জুতোটা পালিশ করে দে। তোমরা কোন দিকে থাকবে?

দ—আপনি যেমন বলবেন।

ন—তোমাদের ভারত মিলে কেমন কাজ হচ্ছে? মদনবাবু আছেন কেমন?

দ—আমি চুনোপুঁটি, মালিকের খবর কী করে রাখবো দাদা, দেখি কলকাতা থেকে গাড়ি করে এল, গাড়ি করে চলে গেল।

ন—হুঃ অনেক টাকা করলো লোকটা......যাই বেরোই, তুমি যাবে নাকি?

দ—চলুন—এক মিনিট—দাদা—বৌদিকে একটা কথা বলেই আসছি। [দৃশ্যের অন্যদিকে। সতু নতুন জামা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে আছে। সুব্রতা আর চামেলী দেখছে। সতু খুব খুশী।]

দ—এই নিন বৌদি, ঐ একশো টাকার থেকে ফেরত চল্লিশ টাকা। সুবাসী, তোমার জন্য আর শাড়ী কিনলাম না। ওটা বৌদির বাজে খরচ হয়ে যেত।

চ—অতই যদি ইয়ে নিজের পয়সা দিয়ে কিনে দিও।

দ—সুবাসী, এক গ্লাস জল। যাই বৌদি, দেরি হলে দাদা খেপে যাবে। [চলে যায়।]

চ—সে তো খেপেই আছে। বাঃ চমৎকার দেখাচ্ছে। সত্য বসো, এই চেয়ারটাতেই বসো না।

স—এই চেয়ারে?

[অন্যদিকে—]

দ—আজ কে এসেছিল?

সু—একটা লোকের সঙ্গে অনেক কথা বললেন।

দ—পুলিশের লোক?

সু—এমনি জামা কাপড় ছিলো তো।

দ—চোখ কান খোলা রাখবে। [নারানের গলা—কই দীনু!] যাচ্ছি দাদা। [বেরিয়ে যায়। অন্যদিকে—]

চ—চমৎকার দেখাচ্ছে, কে বলবে তুমি চাকর—একেবারে যেন আমাদের মত। বসো চেয়ারটাতে।

স—অনেকদিন পর চেয়ারে বসলাম। আপনি রাগ করবেন না তো?

চ—ও মা, রাগ করবো কেন?

স—না, অনেকে করে।

চ—আমি করি না। মুখে বলব, সোস্যালিজ্ম্। আর ঝি-চাকরের সঙ্গে ব্যবহারের বেলায়?

সু—(চুকে)। এ কী ওঠ্! ওঠ্! [সত্য উঠতে যায়।]

চ—আঃ, কী হচ্ছে কী? বোসো সত্য। যাও, তুমি বরং আমাদের জন্য দু পেয়ালা চা করে নিয়ে এস। সুব্রতা চলে যায়।] এই শার্টটাতে তোমাকে খুব ভাল দেখাচ্ছে। [হাত ধরে] বোসো ; আমি যা বলবো তাই শুনবে। দিদিকে অত ভয় পাও কেন?

স—দিদি বকবে।

চ—আমার সামনে বকুক তো, তোমাকে বলে বুদ্ধু। মাথায় ছিট আছে।
স—কোন্ শালা বলে মাথায় ছিট আছে।
চ—তোমার দিদি তো সব সময় সকলের কাছে বলে। নিশ্চয় কোন মতলব আছে। তোমাকে পাগল সাজিয়ে কোনদিন কার সঙ্গে ভেগে পড়বে।
স—মতলব বার করে দেব না।
চ—হিঃ হিঃ, রেগে গেলে তোমাকে বেশ দেখায়। তোমার দিদি তোমাকে মাথা খারাপ বলে কেন?
স—জানি, আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চলছে। আমাকে মারতে এলে আমিও এইসা দেবো।
চ—মারতে এলে তুমি সহ্য করবে কেন?
স—একবার দিয়েছিলাম একটাকে। খুব পাজি ছিলো লোকটা—কে? কে যেন? ভেবেছিলো কেউ আর দেখেনি। কিন্তু আমি তো দেখে ফেলেছিলাম, তারপর কী সব হয়েছিল। আমাকে খুব ভালবাসতে লাগলো লোকটা। আমিও খুব ভালবাসলাম—কিন্তু মনে মনে। তারপর? তারপর সেদিন ওদের বাড়ীর সবাই সিনেমা গেছে—আমি চুপি চুপি পিছন দিক দিয়ে গিয়ে, আমাকে তখনও দেখতে পায়নি—শয়তান! ওকে যদি আবার পাই—আবার পাই—
চ—বিড়বিড় করে কী বলছো? [চুলে হাত দেয়।]
স—দিদিকে বিধবা করেছিলো, শয়তান—[সুব্রতা ঘরে ঢোকে।]
চ—তোমার দিদি বিধবা নাকি?
সু—আমি বিধবা হতে যাব কেন?
চ—এই যে তোমার ভাই বলছিলো?
সু—ও! [হাসে] ওঃ সেই কথা। আমার বিয়ের দিন বিয়ের আগেই আমার বর কলেরাতে মারা যায়। সবাই বলতে লাগল বিয়ে না হতেই মেয়েটা বিধবা হয়ে গেল। তাই ওর মাথায় ঢুকে গেছে বিধবা।
স—মিথ্যে কথা বলবি না দিদি।
সু—তোর মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গেছে।
স—খবরদার বলছি দিদি, ও রকম বলবি না।
চ—হিঃ হিঃ। তোমরা ভাইবোনে ঝগড়া কর আমি মাকে একটা ফোন করি।
[চলে যায়]
সু—তুই কী সব যা তা বলছিলি!
স—বেশ করবো বলবো, আমি কি তোর চাকর? দূর, গল্পটা ওকে বলাই হলো না।
সু—কোনো গল্প তোকে বলতে হবে না।

স—কেমন জামাকাপড় দিয়েছে! আমার জামা ছিঁড়ে গিয়েছিলো তোর যেন গরজই ছিল না।

সু—ফাঁদে পা দিস না। ও ভাল নয়।

স—না, ও খুব ভাল। আমাকে বলেছে, যত ইচ্ছে চেয়ে নিয়ে খেও, আমি বলে দেব। তোর খুব হিংসে হচ্ছে। হিংসুটে কোথাকার।

সু—এই, কী বলছিস!

স—বলবই তো। তুই কেন বলিস আমার মাথা খারাপ? ও বললো আমার মাথায় কিছু হয়নি। মাথা খারাপ তো সেটাকে সাবড়ালাম কী করে?

সু—সতু, কেউ শুনে ফেলবে।

স—ব্যাটা লালু পাল মেঘ দেখ্‌ছিলো।

সু—লালু পালের কথা থাক্‌ সতু, থাক্‌।

স—চমকে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে গুড়ুম। বাজ পড়ল। মেঘ ডাকল। আমি বদলা নিলাম।

সু—তখনই মেঘ ডেকেছিল—বাজ পড়েছিল—তাই কেউ ধরতে পারেনি সেদিন তোকে। কিন্তু সতু—

স—আমি তো কিছুই পারি না!

সু—বাগানে যাবি না? জল কে দেবে?

স—ওঃ হ্যাঁ। গাছে তো জল দিতে হবে। [চামেলীর প্রবেশ।]

চ—পাওয়া গেল না। রানাঘাট লাইন খারাপ বললে। এ কী, চললে কোথায় সতু?

সু—গাছে জলটা দিয়ে আসুক। না হলে গাছগুলো শুকিয়ে যাবে যে।

চ—যাও, গাছে জল দিয়েই কিন্তু ছুটে আমার কাছে চলে আসবে। কেমন? সুবাসী, এখানে দাঁড়িয়ে কেন? রান্নাবান্না দেখ গে। যত সব ফাঁকি দেবার চেষ্টা।

[দৃশ্যান্তর]

কিব্‌লিস্‌—রামজী ছাড়া পাচ্ছে কথাটা ঠিক?

দীনু—আমি জানি না।

কি—যা বলেছিলে, সব ঝুট?

দ—জানি না, যা।

কি—তোমার নারানদা কী বলে?

দ—নারানদা কিছু জানে না।

কি—আর মদনবাবু?

দ—কিছু জানে না!

কি—আমি কী করবো বলো? তোমরা তো কেউ সামনে যাওনি। আজ যদি আমাকে—

দ—টাকা দিচ্ছি—পালিয়ে যা এখান থেকে।

কি—কোথায় পালাব? বাবাটা ধ্বকছে, ভাইটা পড়ছে। মা-টা সর্বক্ষণ খাটছে —ওদের ছেড়ে আমি কোথায় পালাব দীনুদা? ওদের কে খাওয়াবে?

দ—অত মায়া তো মস্তান হতে এসেছিলি কেন?

কি—আমি এসেছিলাম না তুমি আমাকে এনেছিলে?

দ—ইঃ কচি খোকারে! মায়ের কোলে শুয়েছিলি তোকে আমি ফুসলে নিয়ে এলাম!

কি—তোমার কথায় পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছিলাম।

দ—ফের কেঁই-কেঁই। যা ইচ্ছে করগে যা।

কি—আমাকে রামজী মেরে ফেলবে!

দ—আমাদের কপালই এই। ঐ মোটা লোকগুলোকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য আমাদের মরতে হবে।

কি—কেন? কেন তা হবে?

দ—এই নে একশোটা টাকা। গা ঢাকা দে ক'দিন। সুবিধা বুঝলে—

কি—আমার মা বাবার—

দ—চেষ্টা করবো কিছু করতে। তুই এখন যা। [অন্ধকার। একটা তীক্ষ্ণ আওয়াজ। আবছা আলোয় দেখা যায়—কিব্‌লিস পালাচ্ছে, কিন্তু রামজী সিং ও তার দল ঘিরে ফেলেছে। তাদের হাতে রিভলভার, ছোরা, কিব্‌লিসকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল। সুব্রতার প্রবেশ।]

সুব্রতা—এই যে এখন আমি সেখানে যাচ্ছি—মিষ্টি কিনতে—মিষ্টি কেনার দরকার কতটা ছিলো, জানি না, আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবার দরকার ছিলো। যখন কাজে ঢুকলাম তখন বলেছিলো "বেশী বার হওয়া আমি পছন্দ করি না।" ওখানে কী হচ্ছে? খুন, খুন হচ্ছে! ওরা একটা ছেলেকে গাছের সঙ্গে বেঁধেছে। দুজন আছে—আঃ ওরা একটু একটু করে মারছে। ওকী, ওর হাত গেল—পা গেল, এবার চোখ—ও মাগো! অথচ আমার কিছু করার নেই।—একী, এ যে কিব্‌লিস! আমি জানি না এখানে কোথায় পুলিস, থানা! আমি কিছুই জানি না! আর জেনেও বা কি?—এই যে শুনছেন—শুনুন—ও দীনুবাবু এই গাছের আড়ালে আসুন। ঐ দিকে তাকান! দেখুন কী হচ্ছে!

দ—তুমি ওদিকে তাকাচ্ছ কেন? তাকিও না।

সু—তার মানে আপনি জানেন!

দ—আমি কিচ্ছু জানি না। তুমিও কিচ্ছু জান না। যদি বাচতে চাও তাহলে —তাহলে এসব জান না। রামজী সিংকে চেন না। ঐ রামজী, ওর সম্পর্কে কিছু জানতে নেই।

সু—হায় ভগবান, কেউ কিছু জানে না। কেউ কিছু জানে না। একটা ছেলেকে

—কেউ কিছু জানে না। ভগবান, তুমি বলতে পার না একবার যে এই পৃথিবীটাকে সৃষ্টি করেছিল কে আমি জানি না। চন্দ্র-সূর্যের আলোটা একবার বন্ধ করে দিতে পার না?

দ—ভগবান! শালা! এটা পৃথিবীর ঘরোয়া ব্যাপার। ভগবানের এখানে কিছু করবার নেই। বাড়ি যাও! নিজের কাজ করো। নিজের জান্ সম্পর্কে খেয়াল রাখো। যেমন করে হোক বাঁচো। যা দেখলে সব ভুলে যাও। [দীনু চলে যায়।]

সু—ভুলে যাও। যেমন করে হোক বাঁচো। এমন বেঁচে থাকতে আমি চাই না।

[দৃশ্যান্তর]

[টেলিফোনে নারানবাবু।]

নারান—[টেলিফোন] না, না, তা কেন? জামিনে যখন ছাড়া আছে হাজিরা দেবে বৈকি, দেয়নি? আমি দেখছি এখুনি। কোন স্টেপ নেবেন না। কিব্‌লিসের ডেড্‌বডি পাওয়া গেছে! রামজীই যে এটা করেছে এমন তো কোন প্রমাণ নেই? সন্দেহের বশে অবশ্য আপনারা অনেক কিছুই করতে পারেন। ওঃ, চলে আসুন।

[সতু অন্যমনস্কের মত এসে দাঁড়ায়। হাতে মিষ্টির ঠোঙা।] এ কী? তুমি এখানে এসেছ কেন? কখন এসেছ? তুমি টেলিফোনের কথা শুনেছ?

সত্য—না।

ন—তুমি তো কিব্‌লিসকে চিনতে না?

স—হ্যাঁ, ওর মা আমায় খেতে দিত। বলত, এই রাক্ষস কবে যাবে। হা, হা—।

ন—যাও এখান থেকে। হয় তুমি সত্যি পাগল, নয় তুমি আস্ত শয়তান, নাঃ কাউকে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। দেখি আজকে রাতের ব্যাপারটা মিটে যাক্ তারপর। [প্রস্থান]

[অন্য দৃশ্য। সুব্রতা অবসন্ন। বসে আছে। সত্য ঢোকে। হাতে একটা প্লেটে অনেক মিষ্টি।]

স—চামেলীদি আমাকে কত মিষ্টি খেতে দিয়েছে!

সু—চামেলীদি!

স—হ্যাঁ, আমাকে বললো তুমি আমাকে বৌদি বোল না—চামেলীদি বোল। মাঝে মাঝে চামেলী বললেও আমি কিছু মনে করব না। নে দিদি, তুই দুটো খা।

সু—তুই খা সতু, আমি খাব না।

স—তুই আমার ওপর রাগ করেছিস? তবে খাবি না কেন? খা দিদি।

সু—সতু, আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না।

স—বুঝেছি। আমাকে জামাকাপড় দিয়েছে, ভাল খেতে দিচ্ছে, তোর সহ্য

হচ্ছে না।

সু—তোর পায়ে পড়ি, তুই যা।

স—তা ভাল লাগবে কেন? ঐ যে দীনু, ও দিলে বুঝি খুব ভাল লাগতো?

সু—কী বললি? যত বড়ো মুখ নয় তত বড় কথা! বদমাইশ! [চড় মারে।] কবে খুন হয়ে যেতিস। আগলে আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছি। বড়ো বাড় হয়েছে, না? এত লোক মরছে তুই মরিস না, তুই খুন হয়ে যা।

স—কেউ খুন করবে না—না। আমি লুকিয়ে পড়বো, আমি মরব না।
[চামেলীর প্রবেশ]

চ—কে খুন করবে? কী সব কথাবার্তা? ওকে ও রকম করে ভয় দেখাচ্ছ কেন, সুবাসী!

সু—আপনি কেন আমার ভাইকে নিয়ে এ রকম করছেন!

চ—কী করেছি? দেখো আমার নামে বদনাম দেবার চেষ্টা কোর না, নষ্ট মেয়েছেলে! নিজে দীনুর সংগে ফষ্টিনষ্টি করছ বলে—

সু—চুপ করুন, আমার ভাইকে নষ্ট হতে দেব না। এখুনি এখান থেকে চলে যাব।

চ—সতু, চলে যাবে নাকি? আমাকে ফেলে?

স—না।

সু—সতু।

স—না। ও আমাকে কত আদর করে। চুলে হাত বুলিয়ে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল কালকে।

[নারানের প্রবেশ]

ন—কী হয়েছে? চেঁচামেচি কিসের?

চ—হুট করে বলছে, "আমরা চলে যাব।"

ন—তার মানে? মতলব কী?

চ—আমিও তো তাই বলছি। হুট করে এখনই লোক পাই কোথায়।

ন—ভেবেছিলাম সরল লোক, তা নও। সত্য, তুমি ও ঘরে দাঁড়িয়েছিলে কেন? এ্যাঁ, তারপরেই চলে যেতে চাইছ। ব্যাপারটা—

চ—না, না ওর এখানেই কাজ করার ইচ্ছে। এই সুবাসীই যত নষ্টের মূল।

ন—তা যেতে চাইছো কেন?

চ—আমি বলছি ও মেয়েছেলে মোটেই সুবিধের নয়। দীনুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি...।

ন—তাই নাকি?

সু—একদম মিথ্যে কথা। বিশ্বাস করুন—আমার কোন বদ মতলব নেই, কেবল ভাইকে নিয়ে এখান থেকে ভালয় ভালয় চলে যেতে চাই।

ন—ব্যস্ত কেন? যাবে। আজ তো কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না। সপ্তাহ

অনেক জাক। যদি দেখি সব ঠিকঠাক আছে তখন যাবে।

চ—চল সতু, তোমার অনেক কাজ পড়ে আছে। সেরে নেবে চল।

[সতু, চামেলী যায়।]

ন—দীনুর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কী?

সু—আঁ, কিছু না। বিশ্বাস করুন, উনি আমাকে চাকরী যোগাড় করে দিয়েছেন।

ন—চাকরী যোগাড় করে দিয়েছিল না অন্য কথা বলে পাঠিয়েছিল?

সু—না, অন্য কিছু বলে পাঠায়নি।

ন—রামজী সিং সম্পর্কে কিছু জান?

সু—কিছু জানি না। এখানে একদিন দেখেছি।

নারান—দেখা নয়। দেখো, ঐ রামজী দীনুর চেয়ে অনেক বেশী সাংঘাতিক। মনে রেখো! যাও! [প্রস্থান]

সু—বাড়িতে বাড়িতে কাজ করে ভদ্রভাবে জীবনটা কাটাব ভেবেছিলাম। এরা ভদ্রলোক! হায় ভগবান!

[দৃশ্যান্তর]

সত্য—এটা কোন্ জায়গা? এখানে আমি কী করছি? সুন্দর বাড়ি। আমার মাথাটা—আমার মাথাটা—উঃ উঃ, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সিগারেট কিনছিলাম। ভোলা আমাকে ডাকল। তারপর—হুঁ হুঁ—তারপর নিয়ে গেল। সেই ঘরে—মারল আমাকে। প্রচণ্ড মার। বল শালা বল। লালুদাকে কে মেরেছে বল? আমি জানি না। জানি না, তোর বাপ জানে। বদলা নেওয়া কাকে বলে জানিস না সতু? ছেড়ে দে। আমি কিছু জানি না। আঃ আঃ দিদি, কী অন্ধকার, অন্ধকার! মনে পড়েছে—অনুদা, দিদি। দিদির বিয়ে হবে। বাবাঃ, অনুদা—খুন, খুন, সব খুন হয়ে যাবে।

চ—কী হলো? দিদি মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছে তো? আমি থাকতে কে তোমার গায়ে হাত দেবে? এসো, এসো বলছি!

স—দিদি, দিদি কই?

চ—তোমার দিদির কত ঢং। মাথা ধরেছে বলে শুয়ে পড়লো। আমি বলি ভালই হয়েছে। তোমার সাথে একটু নিশ্চিন্তে কথা বলা যাবে। পান খাবে? এই নাও।

স—পান আমি খাই না।

চ—কেন?

স—এমনি। দিদি বলে, যত খরচ বাড়াবি তত বাড়বে। টাকা না জমালে কোন দিন তো মুক্তি পাব না। তাই আমি সিগারেট খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছি।

চ—[সত্যর গায়ে হেলান দিয়ে বসে] সুবাসীর যত উদ্ভট কথা। পয়সা জমাতে হবে বলে মানুষ শখ ছেড়ে দেবে? খাও! [পানটা মুখে দিয়ে দেয়]

স—না। বাঃ পানটা তো বেশ ভাল।

চ—একদিন তুমি আর আমি দুজনে মিলে রানাঘাটে যাব। এই দেখ তো আমার এইখানটায় কী? [সত্য তাই করে।] তুমি এখান থেকে কখনও যেও না। সুবাসীর এখন কারো সঙ্গে ভেগে পড়বার মতলব।

স—দিদি ভেগে যাবে বলছ কেন?

চ—যাবে যখন দেখবে। তোমার বোন হলে কী হয়—আমি বলছি সুবাসী নষ্ট।

স—সুবাসী বলছ কেন? সুব্রতা বলতে পার না?

চ—সুব্রতা আবার কে?

স—নষ্ট বলছ কেন? ভাল বলতে পার না?

চ—আঃ আমার চুলে লাগছে। ছাড় বলছি।

স—আঃ চেঁচিও না। সবাই এসে পড়বে। [আরো জোরে চুল টানতে থাকে]

চ—ছাড়, ছাড় বলছি! লাগছে!

স—বলছি চেঁচিও না। ওরা এসে পড়বে। [চামেলীর মুখ চেপে ধরে। চামেলী ছটফট করে। ক্রমশ অসাড় হয়ে যায়। সত্য ছেড়ে দেয়। সুব্রতা আসে। চামেলীকে দেখে।]

সু—কী করেছিস হতভাগা—কী করেছিস?

স—ও চেঁচাল কেন? ও চেঁচাল কেন? ওরা যদি এসে পড়ত।

সু—[এদিক ওদিক দেখে] এখন আমি কী করি! শোন! আসার সময় তোকে যে ভাঙা শিবমন্দিরটা দেখিয়েছিলাম মনে আছে? [সত্য ঘাড় নাড়ে।] ঐখানে গিয়ে লুকিয়ে থাকতে পারবি? [সত্য ঘাড় নাড়ে।] তবে এই জানলা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে ওই রাস্তাটা ধরে সোজা চলে যা। যতক্ষণ না আমি যাই, ওখানে বসে থাকবি। আমি যাবই। [দুজনে দুদিকে যায়। নারান ও রামজী ঢোকে।]

ন—রামজী তুমি মোড়ের দিকে লক্ষ্য রাখো। আমি চাবিটা নিয়ে আসছি।

র—ঠিক হ্যায় বাবুজী। [রামজী চলে যায়।]

ন—চামেলী, চামেলী—কুঠুরির চাবিটা দাও। এ কী? সত্য, সত্য, সুবাসী! [চামেলীকে গিয়ে নাড়া দেয়, নিঃশ্বাস অনুভব করে। ডাক্তারকে ফোন করে] কী হয়েছে বুঝতে পারছি না, ডাক্তার। তুমি এক্ষুণি এসো। ঝি আর চাকরটা পালিয়েছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমার বৌদি। তাড়াতাড়ি এসো, আর শোন, কাউকে বোল না। [ফোন ছাড়ার একটু পরেই আবার

ফোন বাজে।] হ্যালো। অ্যাঁ! তোমার আবার কী! স্টার্ট করেছে! দশটা পনেরো মিনিটের মধ্যে আসছে? ঠিক আছে। [ফোন ছাড়ে। চামেলীর কাছে যায়।] চাবিটা—না চাবিটা ঠিকই আছে। সোনাদানাও নিয়ে যায়নি কিছু। চামেলী, চামেলী! আঃ আজকেই এই কাণ্ড করলে! ক'দিন থেকে দেখছিলাম ঐ ইডিয়ট ছেলেটার সঙ্গে একটু বেশী—ইডিয়ট, শয়তান কোথাকার! নারান চৌধুরীকে চেনেনি এখনও, আর রামজীকেও জান না। রামজী, রামজী, [রামজী ঢোকে।]—

র—জি, ক্যা হুয়া? ভাবীজিকো ক্যা হুয়া? কুছ খাস জখমি তো নেহী হুয়ী?

না—না, না, বেঁচে আছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে। ও দুটো পালিয়েছে। মদনবাবুর লোক। দীনু দিয়েছিলো।

র—পুলিশ কো খবর তো নেহী দিয়া? মাল আনেওয়ালা।

ন—ডাক্তারকে ডেকেছি। শোন, প্রথমে স্টেশনটা দেখে এসো। লাস্ট ট্রেন যদি চলে যায় তবে কিছু করার নেই। ঐ দুটোকে যেমন করেই হোক ধরতে হবে। শুধু ধরলেই চলবে না। একেবারে শেষ করে দেবে। ঐ ছেলেটাকে এমন ভাবে মারবে যেন ও বুঝতে পারে যে ও মরছে।

র—ঘ্যায়সা কিবলিস কো?

ন—কিবলিসকে কী করেছ জানি না, যাও—মোড়ের মাথা আমি দেখছি। মোট কথা কাল সকালে ওদের যেন চেনা না যায়।

[অন্য দৃশ্য। শিব মন্দির। সত্য প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে। সুব্রতা আসে।]

সু—[হাতে রিভলভার নিয়ে] সতু, এইটে হাতে নিয়ে তুই একদিন বলেছিলি বুদ্ধিটাকে শান দিতে হবে! কিন্তু শান দেওয়া আর হল না! অনন্তদা স্বপ্ন দেখতে শেখাল—সে স্বপ্ন অনন্তদার সঙ্গে সেই পোড়ো বাড়িতে গুপ্তধন হয়ে রয়ে গেল। আর তুই আর আমি আজ এই শিব মন্দিরে গুপ্তধন হয়ে থাকব। কিন্তু তবু ঐ গুণ্ডাগুলোর হাতে তোকে আমি কিছুতেই তুলে দেব না। এই সতু! সতু! তবু ঐ গুণ্ডাদের হাতে তোকে আমি ছেড়ে দিতে পারব না।

স—[ঘুম ভেঙে] দেখেছিস দিদি, আমি কিছু ভুলিনি ঠিক জায়গায় এসেছি। বড়ো শীত করছে রে দিদি।

সু—নে এই শাড়ীটা গায়ে জড়িয়ে নে। [একটা শাড়ী দেয়। সত্য জড়িয়ে নেয়।] তুই কি ঘুমিয়ে পড়েছিলি?

স—হ্যাঁরে। ঘুমিয়ে একটা স্বপ্ন দেখছিলাম।

সু—কী স্বপ্ন?

স—আমাদের বাড়ির স্বপ্ন। একটা মস্ত বাড়ি, বিরাট বাগান। আমি সেই বাগানে কাজ করছি। যাবি?

সু—হ্যাঁ যাব। আজই যাবো। সেখানে আর একটা নতুন বাড়ি তৈরী করবো। মস্ত বাড়ি, তাতে কতো ঘর থাকবে। আর সঙ্গে মস্ত বড় বাগান। তার মধ্যে আম-কাঁঠালের গাছ, জাম, লিচু, ফলসা, নারিকেল আরো কত গাছ। একটা মস্ত বড় পুকুর। তাতে কত মাছ খেলা করে বেড়াবে। এই পাশে থাকবে হাঁস মুরগী রাখার জায়গা।

স—হাঁস, মুরগী? আর?

সু—আর একপাশে থাকবে গোয়াল—কত গরু থাকবে তাতে। কত দুধ হবে। সেই দুধ আমরা বিক্রি করব।

স—দিদি, রেক্‌স্‌-এর মত একটা কুকুর রাখবি? আমি নিজে তাকে চান করিয়ে দেব, খাওয়াব। না, না, দেখিস, এবারে আর মারবো না।

সু—জানি, তুই আর কখনো কারুর গায়ে হাত দিবি না। কেবল ভালবাসবি, আদর করবি।

স—কেবল ভালবাসব আর আদর করব।

সু—কতরকমের পাখি থাকবে। সকাল সন্ধ্যে তুই তাদের ছোলা খাওয়াবি। তারা তোকে দেখলে আনন্দে চিৎকার করে বলবে—এই যে সত্যব্রত এসেছে—যে আমাদের ভালবাসে। আর অতবড় বাড়িতে আমরা দুজনেই থাকব নাকি ভেবেছিস? অনেক বাচ্চা, বাচ্চা ছেলেমেয়ে, যাদের কেউ নেই, তাদের নিয়ে আসবো। তারা সবাই সেখানে থাকবে, বাগানে কাজ করবে, আর গান করবে। আর সেই গান শোনার জন্য কত লোক আসবে। তারা বলবে, এত সুন্দর গান তোমরা কোথায় শিখলে? ছেলেমেয়েরা বলবে—ওই তো, সত্যব্রতর কাছে, যে আমাদের ভালবাসে। বাগানের ফুলগুলো বলবে এত সুন্দর করে কে আমাদের ফুটিয়েছে!—ওই সত্যব্রত। ক্ষেতের মধ্যে ছোট ছোট চারাগাছগুলো বলবে, আমরা এত তেজী হয়েছি কেন? ওই সত্যব্রত করেছে, যে আমাদের ভালবাসে। আর তাই দেখে আকাশটা খুশী হয়ে শীতকালে দেবে শিশির আর রৌদ্র—আর গরমে যখন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে সব, তখন দেবে মেঘ আর বৃষ্টি। আর তাইতে খুশী হয়ে গাছগুলো আরো লম্বা আরও তেজী হবে আরও...ল-ম্বা। আরোও তেজী। [পিস্তল বের করে সত্যর মাথার দিকে নিয়ে যায়। মঞ্চের উপরিভাগে রামজি সিংকে দেখা যায়। সে তার দলবলকে ইশারায় ডাকে। প্রত্যেকের হাতে অস্ত্র। সুব্রতা সত্যকে গুলি করে। রামজি সিং'রা একটু এগিয়ে আসে। সুব্রতা রামজিদের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরে। পর্দা।]

প্রহর শেষে

॥ চরিত্রলিপি ॥

বৃদ্ধ পিতা

বৃদ্ধা মা

জ্যেষ্ঠ পুত্র পার্থ

স্ত্রী পুতুল

জ্যেষ্ঠা কন্যা রত্না

জামাতা স্বদেশ

রত্না-স্বদেশের পুত্র বুবাই

বুবাইয়ের বন্ধু দুজন

কাজের লোক সত্য

[ধরা যাক,—উত্তরবঙ্গের কোন মহকুমা টাউনের কোন পদস্থ সরকারী অফিসারের বসবার ঘর, সেইভাবে সব সাজানো, অভিনেতাদের ডানদিকে দর্শকদের দিক দিয়ে বাইরে যাবার দরজা।

ডানদিকের পেছনে একটু সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। সেখানে একটা দরজা। অভিনেতাদের বাঁদিকে পেছনে একটা এবং একেবারে পেছনে একটা দরজা। একটি চেয়ারে বসে এক সধবা বৃদ্ধা একটি সোয়েটার বুনছে দু-তিন রঙের উল দিয়ে। বাইরের দরজা দিয়ে এক বৃদ্ধ প্রবেশ করে; গায়ে হাতাওলা গেঞ্জি বা ছোট হাতওলা পাঞ্জাবী আর ধুতির-খুঁটে কিছু তরকারী ফল ইত্যাদি বাঁধা। সময় সন্ধ্যা।]

বুড়ি—[শশব্যস্তে]—একি! এমনি করে কি সদরের দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়! কে কখন এসে পড়ে ঠিক আছে? জামাই-মেয়েই যদি হঠাৎ ফেরে তবে কি মনে করবে তারা? দাও তাড়াতাড়ি আমার আঁচলে ফেলে দাও। চট করে রান্না ঘরে দিয়ে আসি। [বুড়ো জিনিসগুলো দিতে থাকে] আর কি দরকার এইসব গুচ্ছের কিনে।

বুড়ো—না মানে, সন্ধ্যের মুখে এগুলো খুব সস্তায় যাচ্ছিল। ধর, আম তো শেষ হয়ে এল। ভাবলাম নিয়ে যাই। টাকায় দুটোর বেশী তো পাওয়া যায় না, তা এই সন্ধ্যের মুখে বাড়ী যাবে বলে তিনটে করে দিচ্ছিল। পকেটে দেখলাম—

বুড়ি—থাক থাক। তুমি এত কষ্ট করে আনলে এ আম হয়তো কেউ মুখেই তুলবে না। তুমি তো নিজে আম খাও না।

বুড়ো—তা হলে তুমি একটু খেও।

বুড়ি—মাথা খারাপ। কেউ খাবে না আর আমি খাব? তাও যদি বুবাইটা আম ভালবাসত।

বুড়ো—কেউ খাবে না বলেই তো তুমি খাবে। তুমি তো আম ভালবাস। যখন আমি কিনি তখন সে কথা কি একবারও ভাবিনি বলছ?

বুড়ি—থাক, থাক। ওকথা আর চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বলতে হবে না। বিপ্লবের পাঠানো হাতখরচ দিয়ে আমার সখের জন্য কিছু কিনেছ শুনলে রত্না আর রক্ষে রাখবে না।

বুড়ো—কেন? রত্নার এই যে সেদিন সরপুঁটি সরষে দিয়ে খাবার ইচ্ছে হল সেকি আমি জেলেদের বলে বলে খুঁজে পেতে এনে দিইনি? না হলে এখানে কি চাইলেই সরপুঁটি মাছ পাওয়া যায়? অঘোর জেলেকে বলে বলে—অঘোর একদিন বলেই বসল—বাবু আপনি যেমন করে মাছের

তাগাদা দিচ্ছেন বাকি টাকার জন্যেও লোক এমন করে তাগাদা দেয় না!

বুড়ি—খেয়েদেয়ে তো আর কাজ নেই, কেবল ঘুরে বেড়ানো আর ঐ ছোট-লোকদের সঙ্গে যত বন্ধুত্ব!

বুড়ো—ছোটলোকদের মুখেই তো এই ভাষাটা শুনতে পাই গো। পার্টিশন হবার পর রংপুর ছেড়ে চলে যেতে হল কলকাতায়, ওকালতি ছেড়ে করতে হল ইস্কুল মাষ্টারী। ভেবেছিলাম সেই এঁদো পচা বস্তিমত বাড়ীতেই বুঝি জীবন কাটবে—শেষ হবে জীবন। তা হল না, ভগবান মুখ তুলে চাইলেন।

বুড়ি—ভগবান ভগবান বোল না, নিজে কি করেছ তাই বল। সর্বস্ব ছেলে-মেয়েদের পেছনে ঢেলে—আজ নিঃস্ব ভিকিরি হয়ে বসে আছ। নিজের স্বাস্থ্য পর্যন্ত—

বুড়ো—এখন ওসব কথা বলে আর লাভ কি?

বুড়ি—তা ভগবান ভগবান বলেই বা লাভ কি? লাভ তো আমার খুব হয়েছে। ঘরদোর বেচে গয়নাপত্তর বেচে ছেলেমেয়ে মানুষ করে খুব লাভ হয়েছে—

বুড়ো—আসলে দোষ আমাদেরই, যুগটা যে কত তাড়াতাড়ি পালটাচ্ছে সেটা ঠাওর করতে পারিনি।

বুড়ি—কথা বললেই গুচ্ছের তত্ত্ব কথা, ও আর ভাল লাগে না। যাই এগুলো রেখে আসি।

বুড়ো—[ঝাঁঝের সঙ্গে] বুড়ো হলে যে মানুষ খিটখিটে হয়ে যায় তোমাকে দেখলে টের পাই।

বুড়ি—আর তোমাকে দেখলে মনে হয় বুড়ো হলে মানুষ পাথরের বুদ্ধ হয়ে যায়। —না হলে আজ এই দশা—

বুড়ো—মনের কথাটা ঠিক করেই বল না,—বল যে বুদ্ধু হয়ে যায়।

বুড়ি—থাক থাক চেঁচিও না। রত্না বাড়ী নেই, রক্ষে। সদানন্দ শুনলে বলবে ঐ বুড়ো-বুড়িতে লেগেছে।

[পিছনের ডানদিকের দরজা দিয়ে ভেতরে যায়]

বুড়ো—[আপন মনে পায়চারী করতে করতে]—তা বললেও তো কোন দোষ হয় না। আমার মত বোকা আছেটা কে? বল, যত পার বল। তবে ভুলটাই বা কি করলাম। মানুষ সংসার করে, রোজগার করে কেন? সত্যি তো কেন? এক নম্বর ভাল করে থাকবে বলে। দুই নম্বর ছেলেমেয়ে ভাল করে মানুষ করবে বলে। তিন নম্বর শেষ বয়সে কিছু সংস্থান করবে যাতে মৃত্যুটা সহজ হয়ে যায়। ঐ ঐ তিন নম্বরে এসে গোলমাল হয়ে গেল। ঐ সংস্থান—আমার বাবা আমাকে মানুষ করে বলে-

ছিলেন,—"পয়সা জমাবার দরকার কি, উপযুক্ত ছেলে আমার, ঐ তো আমার এ্যাসেট"। না আমার বাবাকে আমি কষ্ট পেতে দিইনি। আর আমার —আমার দুই ছেলে উপযুক্ত। আমার দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছি, উপযুক্ত জামাই পেয়েছি। সব উপযুক্ত, সবাই উপযুক্ত,—তবে?

[বুড়ী ফিরে আসে]

বুড়ি—কি বলছ? কিসের উপযুক্ত?

বুড়ো—বলছি আমার দুই ছেলে উপযুক্ত, দুই জামাই উপযুক্ত—তবে এত কষ্ট কেন?

বুড়ি—আমরা ওদের কাছে উপযুক্ত নই, উপসর্গ। তাই—

বুড়ো—উপসর্গ, আমরা উপসর্গ?

বুড়ি—না তো কি? তবে কষ্ট কষ্টই বা বলছ কেন? খেতে পরতে তো এখনো দিচ্ছে।

বুড়ো—কিন্তু এই কি জীবন? তিন মাস রত্নার কাছে, তিন মাস ঝর্ণার কাছে—

বুড়ি—তিন মাস পার্থর কাছে তিন মাস বিপ্লবের কাছে। কেমন সুন্দর বছর গড়িয়ে যায়।

বুড়ো—হ্যাঁ। গ্রীষ্ম, বর্ষা. শীত, বসন্ত—কেটে যাচ্ছে বেশ।

বুড়ি—বেয়াল্লিশের বিপ্লবের পর পরই বিপ্লব হল বলে তুমি নাম রাখলে বিপ্লব।

বুড়ো—ও যখন পেটে তখন তুমি আন্দোলন করতে গিয়ে জেলে গেলে—

বুড়ি—তাই তো আমি নাম রাখতে চেয়েছিলাম কৃষ্ণ নয়তো বাসুদেব—

বুড়ো—না না তাহলে যে ভুল হ ত গো। কারাগারে তো আর জন্ম হল না।

বুড়ি—সব সময় তোমার ঐ চুলচেরা বিচার চাই।

বুড়ো—আঃ হা—কৃষ্ণ, বাসুদেব এসব নাম সেকেলে। বি-প্ল-ব কত একেলে হল বল তো।

বুড়ি—কাঁচকলা। একেলে আর সেকেলে। ডিসকোতে সবাই ওকে মিঃ চৌধুরী বলে, অবশ্য কেউ কেউ চৌধুরী সাহেবও বলে। বাড়ির ফটকে ওর নেম-প্লেটে লেখা আছে মিঃ বি. চৌধুরী। বিপ্লবের আর বাকি থাকলো কি?

বুড়ো—অথচ ভেবেছিলাম ওরা মানুষ হবে, ওরা—

বুড়ি—তোমার যত কথা! মানুষ হয়নি? দশ হাজার টাকা মাইনে পাচ্ছে। বাড়ী—আবার কি চাও?

বুড়ো—চাই মনুষ্যত্ব। চাই বিবেচনা। যা আমাদের ছিল। একটা মদ-মাতাল। একটা—

বুড়ি—আঃ থাম।
বুড়ো—শুনলাম দিল্লীতে ঝর্ণাও নাকি মদ ধরেছে?
বুড়ি—এ খবর তোমাকে আবার কে দিল?
বুড়ো—পার্থর মেয়ের কি নাম ঐ—কি নাম?
বুড়ি—ঝিমলি।
বুড়ো—ঝিমলি নাকি মডেল হয়েছে?
বুড়ি—তাতে হয়েছেটা কি?
বুড়ো—পয়সার কি ওদের অভাব আছে যে মডেল হয়ে পয়সা রোজগার করতে হবে?
বুড়ি—তুমি দেখছি আমার চেয়েও সেকেলে। পয়সার জন্যে এসব করছে সে কথা তোমাকে কে বললে?
বুড়ো—তবে?
বুড়ি—প্রবিত্তি। ওদের প্রবিত্তি।
বুড়ো—প্রবৃত্তি? তুমি এ সব সাপোর্ট কর?
বুড়ি—করি। যে যুগের যা। তুমিই তো বলতে যুগের হাওয়া অস্বীকার করা যায় না।
বুড়ো—হাওয়া বিষাক্ত হলেও তাকে স্বীকার করতে হবে?
বুড়ি—হবে।
বুড়ো—[রেগে] বিষাক্ত হলেও?
বুড়ি—[রেগে] তা কি করা যাবে? যুগের হাওয়া যে।
বুড়ো—তাই বলে অসভ্যতা, বেলেল্লা—
বুড়ি—বোকার মত ঐ সব কথা বোল না।
বুড়ো—তা হলে তুমি সাপোর্ট কর?
বুড়ি—করি, করি, করি।

[আর একটু কথা কাটাকাটি চলবার পর বুড়ো হঠাৎ প্রচণ্ড জোরে একটা চড় মারে বুড়ির গালে, তারপর হাতটা চড়ের ভঙ্গীতে ধরে রেখেই বলে]

বুড়ো—আবার বলো সাপোর্ট কর।
বুড়ি—[গালে হাত বোলাতে বোলাতে] বড্ড জোরে মেরেছ কিন্তু।
বুড়ো—[কেঁদে ফেলে] এই জন্যে তুমি জেলে গিয়েছিলে, এই জন্যে সূর্য সেনের ফাঁসি হয়েছিল? এই জন্যে গান্ধীজী—
বুড়ি—বোধহয় এই জন্যেই, আমরাই কি ঠিক করে জানতাম আমরা কি চেয়েছিলাম? কি জানি! ছেলেরা পাশ করলে চাকরী পেলে খুশী হয়ে পুজো কি দিইনি? মেয়েদের ভাল বিয়ে হবে বলে মানত কি করিনি?

বুড়ো—সেই সঙ্গে ওদের উচ্চশিক্ষা কি দিইনি? শিক্ষার বেলায় ছেলেমেয়ে বিচার তো করিনি।

বুড়ি—উচ্চশিক্ষার ফল উচ্চহারে টাকা রোজগার—সে তো ওরা করছে।

বুড়ো—উচ্চশিক্ষার ফল হিসাবে এইটুকু কি আশা করতে পারি না, যে ওরা মানুষকে মানুষজ্ঞান করবে, বাবা মাকে সম্মান দেবে?

বুড়ি—ঐ যে বলছিলে যুগটা কত তাড়াতাড়ি পাল্টাচ্ছে বোঝা যায়নি, ওটাই আসল কথা। ওরা যেটুকু করে ওরা মনে করে যথেষ্ট।

বুড়ো—কিংবা যথেষ্টর চেয়েও বেশী। এত হতাশ লাগে। [বুড়ির গালে হাত দিয়ে] কি? এখনও লাগছে।

বুড়ি—[আঁচল দিয়ে চোখ মুছে]—নাঃ। ভাবি কেন সব এত অন্যরকম হয়ে গেল, কেন?

[দুজনে চুপ করে বসে থাকে, চোখে জল। বুবাই প্রবেশ করে। বয়স ১৭ থেকে ১৯-এর মধ্যে।

বুবাই—কি হল দাদু। তোমরা কি শোকসভা করছিলে নাকি? আরে কাঁদছিলে নাকি?

বুড়ো+বুড়ি—নাঃ, চোখে যেন কি পড়ল।

[কথার মাঝখানে দুজনেই এক কথা বলছে বলে থেমে যায়]

বুবাই—[সশব্দে হেসে]—দাদু টেলিং লাই? হ্যাঁগো দিদু, ইউ অলসো? কি হয়েছে দিদু? ধরা পড়িয়াছ বন্ধু—ওঃ না দিদু তো আমার বান্ধবী। হ্যাঁগো দাদু, বান্ধবীকে কি মাঝে মাঝে বন্ধু বলা যায়? দাদু কি হয়েছে? ব্যাপারটা যেন কি রকম সিরিয়াস লাগছে।

বুড়া+বুড়ি—নাঃ, ঐ পুরোন দিনের একটা কথা।

[আবার দুজনে একসঙ্গে বলছে বলে থেমে যায়]

বুবাই—কি ব্যাপার? আজ কোরাসে কথা বলবে বলে ঠিক করেছো নাকি গো, সখা-সখি। এত ভাল রিহার্সেল কখন দিলে?

বুড়ো—দাদুভাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকলে রিহার্সেলের খুব বেশী দরকার হয় না।

বুড়ি—[এতক্ষণে সামলে নিয়েছে] তা আমার হর্ষ সখা, কোন্ অভিসার থেকে ফিরতে সন্ধ্যে গড়িয়ে প্রায় রাত হল?

বুবাই—ক্রমশ প্রকাশ্য। কিন্তু বৃদ্ধা বান্ধবী আমি যে আজ অনেক দিন যাবৎ এই রকমই রাত্র করিয়া ফিরিতেছি তাহা কি তুমি লক্ষ্য কর নাই? আমি ভাবিয়াছিলাম একদিন তুমি ঈর্ষান্বিত হইয়া মুখভার করিয়া বসিয়া থাকিবে, আর আমি দেহি পদপল্লবমুদারম্ বলিয়া তোমার পদযুগল বক্ষে—[বলতে বলতে বৃদ্ধার পা ধরতে যায়]

বুড়ি—[প্রায় লাফ দিয়ে সরে গিয়ে]—ভাল হবে না বুবাই, আমার পায়ে সুড়সুড়ি লাগে।

বুবাই—[খুব নিষ্ঠাভরে যেন]—আমি ছাড়িব না, কোথায় ঈর্ষা? বরং আমি দেখিলাম আমার এই বৃদ্ধ প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিই তোমার মুগ্ধ নেত্র পতিত রহিয়াছে। আর আমিই অহরহ ঈর্ষায় দগ্ধ হইতেছি।

[আবার পা ধরতে যায়]

বুড়ি—[বুড়োর পেছনে প্রায় দৌড়ে চলে যায়]—তুমি ওকে বারণ করছ না কেন? জান তো, বরাবর আমি মোটে সুড়সুড়ি সহ্য করতে পারি না। বুবাই ভালো হবে না।

[বৃদ্ধ হাসি হাসি মুখে এই দৃশ্য খুব উপভোগ করে]

বুড়ো—আমি উহার হইয়া মাপ চাহিতেছি হর্ষবর্ধন, এইবারকার মত তোমার এই অবিশ্বাসিনী প্রেমিকাকে মাপ করিয়া দাও—

বুবাই—হল না, মাপ নয়, ক্ষমা বলা উচিত ছিল।

বুড়ো—বুবাই এর বদলে হর্ষবর্ধন বললাম আর মাপের বদলে ক্ষমা—ইস্! বুড়োদের সব বাতিল করে দেওয়া উচিত। (হেসে ওঠে)

[বুবাই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বুড়োর পায়ে ঠেসান দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ে]

বুবাই—কি হয়েছিলো গো দাদু, দুজনে মিলে কাঁদছিলে কেন? মাতৃদেবী আবার কিছু বলেছে নাকি তোমাকে?

বুড়ো+বুড়ি—না, না, সে কথা আবার তোকে কে বললে?

বুবাই—কি জানি দাদু, আমার মনে হচ্ছে তোমাদের বিরুদ্ধে কি রকম একটা ষড়যন্ত্র শুরু হইয়াছে।

বুড়ো—আমরা তো দাদু সিংহাসনে বসে নেই, আমরা তো সারেন্ডার কবেই বসে আছি।

বুবাই—বৃদ্ধ তোমরা বড্ড সেকেলে, তোমরা আছ কেন বলতে পার? যাক গে, আমাকে এখুনি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে যেতে হবে।

বুড়ো+বুড়ি—কেন?

বুবাই—কলিকাতা হইতে তোমাদের বড় পুত্র ও বধূমাতা আসিতেছেন, ট্রেন প্রায় বার ঘণ্টা লেট করিয়াছে। রাস্তায় পিওন এই টেলিগ্রামটি হাতে ধরাইয়া দিল।

বুড়ো+বুড়ি—কে, পার্থ আর পুতুল ?

বুবাই—হ্যাঁ, বড় মামা আর বড় মামী। তা আমার পরম পূজনীয় পিতা আর স্বর্গাদপি মাতা কোথায় গেলেন ?

বুড়ি—কি শনিবারেই তো ডেপুটির বাড়ীতে তাস খেলতে যায়।

বুবাই—কারেক্ট্! আজ শনিবার এবং আজ তাস না খেলা মহাপাপ। শোন দাদু, আমি স্টেশনে যাচ্ছি। ইতিমধ্যে যদি আমার এক বা একাধিক বন্ধু আমার জন্য একটি পুঁটুলি বিশেষ দিতে আসে তোমরা গ্রহণ করিবা এবং সযত্নে লুকাইয়া রাখিবা।

বুড়ো+বুড়ি—কিসের পুঁটুলি ?

বুবাই—[নাটকীয় ভঙ্গীতে] এইবার তোমরা তোমাদের দক্ষিণ হস্তদ্বয় আমার মাথার উপর স্থাপন কর এবং বল—পুঁটুলির কথা আমরা কাহাকেও বলিব না।

[দুজনের হাত নিজেব মাথায় দেয়]

বুড়ো+বুড়ি—কি পুঁটুলির কথা—

বুবাই—কোরাসে বল, দেরী কোর না। আমাকে স্টেশনে যেতে হবে, হরিসিংকে জীপের কথা বলে এসেছি, সে অপেক্ষা করছে—

বুড়ো+বুড়ি—এই পুঁটুলির কথা আমরা কাহাকেও বলিব না।

বুবাই—বুবাই ওরফে হর্ষবর্ধনকে এ সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না।

বুড়ো+বুড়ি—বুবাই ওরফে হর্ষবর্ধনকে এ সম্পর্কে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিব না।

বুবাই—O.K. আমি যখন চাইব কেবল নিঃশব্দে আমাকে দিয়ে দেবে, কেমন ?

বুড়ো—বুবাই তুই কি ?

বুবাই—উহুঁ। এখনই শপথবাক্য পাঠ করেছ, এখনি খেলাপ করাটা কি ঠিক হবে ?

বুড়ো—বেশ, ও কথা থাক, কিন্তু রাত হয় কেন ফিরতে ?

বুবাই—তাস খেলা প্র্যাকটিস করছি।

বুড়ি—ডাহা মিথ্যে কথা।

বুবাই—মিথ্যা জীবনের ধর্ম।

বুড়ো—এত কথা শিখলি কোত্থেকে ?

বুবাই—পিতা স্বর্গ আর মাতা গরীয়সীব কাছে।

বুড়ি—ছিঃ। বাবা-মার সম্পর্কে এমন করে কথা বলবি ?

বুবাই—তোমরা তো ওদের বাবা মা, তাই না ? তোমাদের সম্পর্কে কেমন করে ওরা কথা বলে ?

বুড়ো—আঃ কথায় কথা বাড়ে, স্টেশনে যাবার দেরী হচ্ছে না?

বুবাই—যাবার আগে ঐ ডেপুটীর বাড়িতে খবর দিয়ে যাই, বাবা গো তোমার বড় কুটুম্ব আসছে।

[চলে যায]

বুড়ি—এবার যখন এলাম তখন থেকেই দেখছি বুবাইটা কেমন যেন একটু হয়ে গেছে না?

বুড়ো—ওর ভেতরে মনুষ্যত্ব ডালপালা মেলছে।

বুড়ি—আবার কাব্য।

বুড়ো—তত্ত্ব কথা তো নয়।

বুড়ি—বুড়োদের মুখে দুইই সমান শোনায়।

বুড়ো—হ্যাঁ, তার চেয়ে প্র্যাকটিক্যাল হওয়া যাক।

বুড়ি—বল।

বুড়ো—ঐ ষড়যন্ত্রেব কথা বুবাই কি বলল?

বুড়ি—একবার জিজ্ঞাসা কবে নিলে হত।

বুড়ো—আগে হলে কথাটা উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু এই বছর খানেক হল যেখানেই যাচ্ছি, যেন আগের মত অভ্যর্থনাটা পাই না।

বুড়ি—না। পাই না। এবারে কলকাতা থেকে আসার দিন পার্থরা তো সকাল বেলাতেই পিকনিক করতে বেরিয়ে গেল। পুতুল তো দায়সারা গোছের একটা পেন্নাম ঠুকে বলল, "মা, যাবার আগে আর আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না। সতীশকে সব বলে গেলাম, ও সব ব্যবস্থা করে আপনাদের স্টেশনে নিয়ে যাবে।"

বুড়ো—পার্থ তো আজকাল প্রণামও করে না। আর ওর মেয়ের নামটা যেন কি?

বুড়ি—ঝিমলি। একটু আগেই তো বললাম।

বুড়ো—ও হ্যাঁ, সে তো সামনেই এল না।

বুড়ি—আমি স্পষ্ট শুনেছিলাম, ওর মা যখন সিঁড়ির মুখটায় দাঁড়িয়ে বলছে,—"যা বুড়ো-বুড়িকে একটা প্রণাম অন্তত করে আয়", ঘাড় বেঁকিয়ে মেয়ে বললে, "ওদের পাগুলো দেখলে আমার ঘেন্না করে।"

বুড়ো—[নিজের পায়ের দিকে তাকায়]—কিন্তু পার্থ সস্ত্রীক আসছে কেন?

বুড়ি—কি জানি ব্যবসা করে, তাই হয়তো অফিসার ভগ্নীপতির কাছে কোন সুযোগ-সুবিধার জন্য।

বুড়ো—হতে পারে, টিম্বার মার্চেন্ট তো, এদিকে কাঠ তো—অবশ্য আমাদের সেই পুরোন ধারায় আর ব্যবসা-বাণিজ্যও তো চলছে না—

বুড়ি—হয়তো এমনিই বেড়াতে আসছে—
বুড়ো—আমরা এখন স্পেকুলেট করতে আরম্ভ করলাম কেন বল তো?
বুড়ি—আমাদের ভয় করছে বলে আমরা এত ভাবছি—
বুড়ো—ঠিক বলেছ, ঐ ষড়যন্ত্র কথাটা ভয় পাইয়ে দিয়েছে।
বুড়ি—এত সবের মধ্যেও বুবাইটা আমাদের একটু ভালবাসে, তাই না?
বুড়ো—বুবাই—অন্যরকম, ওর মধ্যে মনুষ্যত্ব পাখা বিস্তার করছে।
বুড়ি—এখানে আমাদের মেয়াদ বোধহয় মোটে এক মাস।
বুড়ো—হ্যাঁ, এবার ওকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হবে। এবার যেন আমরা কোথায় যাব?
বুড়ি—দিল্লী। ঝর্ণার ওখানে।
বুড়ো—ঝর্ণার ছেলে না মেয়ে?
বুড়ি—ঝর্ণার এখনও কিছু হয়নি। তুমি না—
বুড়ো—ওঃ তাই তো বড় ভুল হয়ে যায় আজকাল।

[একটু চুপ। তারপর একটা জীপ আসার আওয়াজ]

বুড়ি—ঐ ওরা আসছে।

[জীপ থামার শব্দে বৃদ্ধা শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ায়, বৃদ্ধ উঠতে গিয়ে আবার বসে পড়ে। রত্না ও স্বদেশ-এর প্রবেশ ঃ বেশভূষা খুব আধুনিক]

রত্না—কি ব্যাপার। এখানে বসে দুজনে কি করছ? বুবাই বলেনি দাদা-বৌদি আসছে?
বুড়ি—হ্যাঁ টেলিগ্রাম না-কি—
রত্না—তাহলে এখানে বসে কি করছ? সদানন্দকে বলেছ?
বুড়ি—আমি? আমি কি বলব?
রত্না—কি বলবে মানে, এতগুলো লোক আসছে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে না?
বুড়ি—এতগুলো? মোটে তো দুজন—
রত্না—উঃ, তোমাকে নিয়ে আর পারি না। কোন রকমের যদি হও। জান একটা কাজে গেছি! এই জন্যে, এই জন্যে তোমাদের কেউ দেখতে পারে না। যেখানেই থাক কখনো তাদের আপন মনে কবতে পার না। বাড়ীতে গেস্ট আসছে তাতে তোমারও যে কিছু করণীয় আছে—
স্বদেশ—এখন এইভাবে যদি তুমি লেকচার দিতে শুরু কর তাহলে ওদিকে আরও দেরী হয়ে যাবে না?
রত্না—তুমি থাম তো। তোমার এই ধরনের কথায় একটা নীরব প্রশ্রয় থাকে—

আর তাই—

বুড়ি—আমি যাচ্ছি—কিন্তু কি কি রান্না হবে,—কি বলব?

রত্না—তুমি দয়া করে সদানন্দকে গিয়ে খবরটা দাও। সদানন্দ সব ঠিক করে নেবে। তোমার চেয়ে সদানন্দর বুদ্ধি অনেক বেশী।

বুড়ি—জানি, জানি। আমার চেয়ে তোদের সকলেরই বুদ্ধি বেশী।

[গজ গজ করতে করতে চলে যায়]

স্বদেশ—তাসে হেরে গিয়ে তোমার মেজাজটা দেখছি একেবারে—

রত্না—হেরে আমি যেতাম না,—আমার ঐ মাকাল ফল পার্টনার।

স্বদেশ—ঐ মাকাল ফলকে পার্টনার পাবার জন্যে তো—হ্যাঃ ; ডেপুটির শালা, উঠতি সাহিত্যিক, তার ওপর ঐ চেহারা, ব্যাচিলার—

রত্না—বাজে কথা বোল না। জেলাস হওয়াটা পুরুষদের স্বভাব।

স্বদেশ—যাক একটা নতুন কথা শুনলাম। তবে কোন জিনিষই নিজেদের এক-চেটে ভেবে রাখা ঠিক না।

রত্না—মরে যাই! কি কথার কি উত্তর।

স্বদেশ—আর জবাব মুখে আসছে না, না? জবাব মুখে না এলে তোমরা মেয়েরা এমন গ্রাম্য হয়ে যাও না।

রত্না—হ্যাঁ হ্যাঁ, এই গ্রাম্য মেয়েটিকে পেয়েছিলে বলে জীবনে উৎরে গেলে। যেখানে গেছ সেখানেই একটা লটঘট করেছ আর আমি—

[বৃদ্ধকে বিস্মৃত হয়ে এরা কথা বলে চলেছিল। বৃদ্ধ হাঁ করে এতক্ষণ এদের কথা শুনছিল। আর থাকা উচিত নয় ভেবে আস্তে উঠে ভেতরে যাবার চেষ্টা করতেই একটা শব্দ হয়ে গেল, দুজনে চমকে তাকায়।]

রত্না—[সামনে গিয়ে সপ্রতিভ হবার চেষ্টায়]—বাবা কোথায় চললে? তোমাকে একবার দোকানে যেতে হবে। দাদা-বৌদি আসছে না? সত্যি কোন খেয়াল তোমাদের থাকে না। এখানে বসে আছ একটু মনে করিয়ে দিলেও তো পারতে।

বুড়ো—সুযোগ পেলুম না। যাই চাদরটা নিয়ে আসি।

রত্না—চাদর! এই ভ্যাপসা গরমে? সত্যি, আষাঢ়ের ক'দিন হলো বৃষ্টির নাম নেই।

[বৃদ্ধ কথার মাঝখানে ভিতরে চলে যায়]

স্বদেশ—হলো তো! রেগে গেলে তোমার আর জ্ঞান থাকে না। নিজের বাবার সামনে—

রত্না—তোমার জ্ঞান ছিল না, নিজের শ্বশুরের সামনে—
স্বদেশ—শ্বশুরটি এমন চুপচাপ থাকেন, ওঁর সম্পর্কে জ্ঞান না থাকাটা স্বাভাবিক। অবশ্য চুপচাপ না থেকে করবেনই বা কি। যা সমস্ত—
রত্না—স্পষ্ট করে বল না যা বলতে চাইছিলে?
স্বদেশ—ঠিক ধরেছ। বলতে যাচ্ছিলাম তোমার মা রত্নগর্ভা, এতগুলো রত্ন প্রসব করেছেন যে তাঁদের দাপটে—
রত্না—ওঃ দরদ। মা'র পোড়ে না মাসীর পোড়ে। অথচ যখন আমাদের ভাই-বোনদের মিটিং-এ ঠিক হয়েছিল আমার বাড়ীতে বছরে তিন মাস ওঁরা থাকবেন, তখন তো ওষুধ গেলার মত করেই তুমি কথাটা গিলেছিলে।
স্বদেশ—ঠিক। আমার তো ভাল লাগেইনি। কিন্তু মেনে নেবার পর তোমাদের মত গজ গজও করি না। একটা কথা তোমার মনে রাখা দরকার, আমার বাবা মা'কে আমি কখন নিজের কাছে এনে রাখতে পারিনি।
রত্না—সেটা কি আমার জন্যে?
স্বদেশ—তবে কার?
রত্না—তোমার নিজের মনে নেই? বিয়ের পর কেবল বলতে টু ইজ কোম্পানি থ্রি ইজ ক্রাউড? বাবা মা এলে—না হলে তখন আমার কতটুকু বয়স যে নিজের মত ফলাব।
স্বদেশ—কিন্তু তারপর?
রত্না—বাঃ বাঃ চমৎকার। এই তোমার ইচ্ছে হল, এইরকম কর—তাই করলাম। তারপরেই তোমার ইচ্ছে হবে—ঐ রকম কর—
স্বদেশ—যাক্ গে, আজ তোমার পার্টনারের কাছ থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসতে হল বলে তোমার মেজাজ ঠিক নেই, কোন কথা তোমার সঙ্গে না বলাই ভাল।

[বৃদ্ধ প্রবেশ করে, হাতে চাদর]

বৃদ্ধ—রত্না, তোরা একটু আস্তে কথা বল, রান্নাঘর থেকে পর্যন্ত তোদের কথা শোনা যাচ্ছে। বল কি আনতে হবে।
স্বদেশ—আপনাকে যেতে হবে না। আমি নিয়ে আসছি।

[বেরিয়ে যায়। জীপের শব্দ দূরে মিলিয়ে যায়]

রত্না—অন্য সব মেয়েদের একটা বাপের বাড়ী থাকে, দুর্বিষহ হলে তারা বাপের বাড়ী চলে যায়, আমার এমন কপাল বাপ-মাকেই পোষ বসে বসে। পোষ—

[উপরে চলে যায়]

[বৃদ্ধা প্রবেশ করে। ব্যাপার বুঝে বলে—যাই ওপরে যেয়ে রত্নাকে দেখে আসি, নইলে হয়তো রাগ করবে।]

বুড়ো—মা, মা তারা, আর কতদিন মাগো!

[একটু সময় যায়। বুবাই এর বয়সী দুটো ছেলে আসে।]

প্রথম—আপনি হর্ষের দাদু?

বৃদ্ধ—হ্যাঁ।

দ্বিতীয়—আপনার নাম প্রসেনজিৎ চৌধুরী?

বৃদ্ধ—হ্যাঁ।

প্রথম—ইংরেজ আমলে ওকালতি করতেন?

বুড়ো—ঠিক তাই করতাম, কিন্তু তোমরা যে উকিলের মত জেরা সুরু করলে।

প্রথম—আমাদের জেনে নিতে হবে তো?

দ্বিতীয়—কোন কথা নয় আর। দাদু, এইটে আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি। [একটা পুঁটুলি দেয়]—হর্ষ নিশ্চয়ই বলেছে, তবু এর দায়িত্ব—

বৃদ্ধ—কোন ভয় নেই তোমাদের। [হঠাৎ ২য় ছেলেকে লক্ষ্য করে] শোন, তুমি অঘোর জেলের ছেলে না?

দ্বিতীয়—আমি পার্টির ছেলে। [চলে যেতে চায়]

বুড়ো—কিন্তু তোমরা—

প্রথম—যা বললাম দাদু, চলি। [চলে যায়]

বুড়ো—[আপন মনে] পার্টি! পার্টি! অঘোরের ছেলেটা তো একটু বোকা আছে। পার্টি কথাটাই তো ওর উচ্চারণ করা ঠিক হয়নি। আসলে রোমান্টিক! কিন্তু—তার মানে, তার মানে বুবাই কি কোন পলিটিক্যাল পার্টি মানে—খুনো-খুনির ব্যাপার। না, না বুবাই, এ তুমি করতে পার না। এ ঠিক না। ও তো স্পষ্ট এই খুনো-খুনির মধ্যে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে—না—না—

[বৃদ্ধার প্রবেশ]

বুড়ি—বাব্বাঃ, রত্নার যে কি মেজাজ হয়েছে। —কি হল? দাঁড়িয়ে কি ভাবছ? হাতে ওটা কি?

বুড়ো—[সচকিত হয়ে] এইটে সেইটে। হর্ষর—।

বুড়ি—এইটে সেইটে! —তা ওটা ওরকম করে খুলে মেলে ধরে আছ কেন? হর্ষ ওটা লুকিয়ে রাখতে বলেনি?

বুড়ো—তাইতো! [চাদরের মধ্যে নেয়] কিন্তু পুরো ব্যাপারটা সহজ নয়।

বুড়ি—সে তো তখনই বোঝা গিয়েছিল।

বুড়ো—সে তো গিয়েছিল, কিন্তু কতখানি? এ পুটুলিতে কি আছে বলতে পার?

বুড়ি—পারি। হয় পিস্তল নয় গাঁজা।

বুড়ো—কি করে বুঝলে?

বুড়ি—ও বুঝতে আবার সময় লাগে নাকি।

বুড়ো—খুলে দেখব?

বুড়ি—ওর মাথায় হাত দিয়ে না প্রতিজ্ঞা করেছ?

বুড়ো—কাউকে বলব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি, খুলে দেখব না বলে তো প্রতিজ্ঞা করিনি।

বুড়ি—উকিল ছিলে এক সময় বোঝা যাচ্ছে।

বুড়ো—থাক দেখব না, গাঁজা যে না তা হলপ করে বলতে পারি। কারণ ওর মধ্যে মনুষ্যত্ব ডানা মেলেছে। তা হলে অপরটাই হবে।

বুড়ি—তা হলে কি হবে?

বুড়ো—কিন্তু এ তো ঠিক পথ নয়।

বুড়ি—আমরা তো একমাস পর চলে যাবো। স্বদেশ আর রত্না তো নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। ওর দিকে কেউ দেখে না।

বুড়ো—ওর দিকে কেউ দেখুক আর তো ও সেটা চাইছে না। রত্নারা বড় ভুল করছে।

বুড়ি—হ্যাঁ, দুজনে কেবল দুজনকে পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে। এ ভাবছে ও কারো সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে। ও ভাবছে এ কারো সঙ্গে—

বুড়ো—হ্যাঁ, আর এদিকে ভবিষ্যৎ মরতে বসেছে। সেদিকে খেয়াল নেই।

বুড়ি—এই যে পাহারা দেওয়া এও এক নেশা ; বুঝলে—এও এক নেশা।

বুড়ো—যা বলেছ। আরে। আমরা যে দুজনে অনেকক্ষণ ধরে একমত হয়ে কথা বলে চলেছি। বলি তোমার মাথাটা ঠিক আছে তো।

বুড়ি—শুনেছি বুদ্ধিমানদের মাথা খারাপ হয়, আমার মতো বোকা লোকের ভয় নেই।

বুড়ো—খোঁচাটা ভাল দিয়েছ সহধর্মিণী কিন্তু—

বুড়ি—দেখ, বুবাই এর ব্যাপারটা কোন মতে স্বদেশকে জানান চাই। ওকে তো একটু অন্যরকম লাগে।

বুড়ো—হ্যাঁ একটা কোন ইঙ্গিত অন্তত। আচ্ছা, ওরা কি কিছুই জানে না?

বুড়ি—জানলে কি, তাস খেলা নিয়ে মেতে থাকে?

বুড়ো—রত্না কি করছে?

বুড়ি—কি একটা ট্যাবলেট খেল, তারপর শুয়ে পড়ল।

বুড়ো—শুয়ে পড়ল?

বুড়ি—হ্যাঁ, মন খারাপ হলে ওরা শুয়ে পড়ে। কলকাতায় পুতুলকেও তাই দেখতাম, পার্থর সঙ্গে কিছু হলেই একটা ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়ে—

বুড়ো—থাক থাক—

বুড়ি—ঝর্ণা শুনেছি ঢক ঢক করে মদ খেয়ে নেয়।

বুড়ো—আমারই ছেলেমেয়ে সব। কেন এমন হল?

বুড়ি—আর ঐ কেনর উত্তর ভাবতে পারি না। অনেক আগে ভাবতে পারতাম। ঐ বিপ্লব যখন পেটে, তখন ভাবতাম ইংরেজ কেন থাকবে। থাকা উচিত না।

বুড়ো—হ্যাঁ, অধর্ম।

বুড়ি—অধর্ম ঐ উত্তরটা তখন পেয়েছিলাম। তারপর দেশ ভাগ—

বুড়ো—হ্যাঁ, তখন থেকেই সব গুলিয়ে যেতে লাগল।

বুড়ি—সোনার সংসার ফেলে চলে এলাম কলকাতায়।

বুড়ো—মানুষের অধম হয়ে বেঁচে থাকলাম।

বুড়ি—আর তারপর থেকেই আর ঐ কেনর উত্তর পাই না, সব গোলমাল হয়ে গেল।

বুড়ো—ভাবলাম ছেলেমেয়ে মানুষ করেছি। দেখলাম মানুষ করতে পারি নি। ঝর্ণা মদ খায়। বিপ্লব ঘুষ নেয়। পার্থর আলমারী কালো টাকাতে বোঝাই। সব জানি,—সব বুঝি, অথচ এমন ক্ষমতা নেই যে বলব তোমাদের খয়রাতি খাওয়া দাওয়া আমরা চাইনে। বলতে তো পারি না!

বুড়ি—হ্যাঁ জীবনের মায়া বড় মায়া। যতক্ষণ প্রাণটা থাকে—

বুড়ো—আর এতই যাদের প্রাণের মায়া তারা কেন ঐ কেনর উত্তর খুঁজবে? যা ইচ্ছে হোক না আমার তাতে কি?

বুড়ি—কিন্তু বুবাই?

বুড়ো—বুবাই ব্যতিক্রম।

বুড়ি—হ্যাঁ, ও প্রাণের মায়া করে না।

বুড়ো—অঘোরের ছেলে জিতেন সেও ব্যতিক্রম।

বুড়ি—আমাদের সময় আমরা কি ব্যতিক্রম ছিলাম না?

বুড়ো—বোধ করি না। স্বদেশী হাওয়াতে আমরা ভেসে গিয়েছিলাম।

বুড়ি—না, আমি তা মানি না। তুমি বিপ্লবীদের লুকিয়ে টাকা দিতে। একথা যদি জানাজানি হত তোমার নিপীড়নের ভয় কি ছিল না? আমি কি পুলিশের মার খাইনি? যতটুকুই হোক, জেলে কি যাইনি? সেখানে নির্যাতন সইনি?

বুড়ো—তবু তখন ওটা করার মধ্যে একটা, একটা—

বুড়ি—জানি, তুমি বলবে লোভ ছিল। প্রশংসা পাবার লোভ ছিল। কিন্তু

আমি নিজেকে যতটা জানি, আমি যখন চিৎকার করে বলেছি, "ইংরেজ ভারত ছাড়"—প্রাণ থেকে বলেছি—আমি থিয়েটার করছি, আর কেউ হাততালি দিক এই ভেবে করি নি।

বুড়ো—কিন্তু বুবাইরা কি ভেবে কি করছে বল তো? অনেক কিছু তো শুনেছি, কাগজে দেখেছি, ও কি শেষকালে এক্সট্রিমিস্ট হয়ে গেল নাকি?

বুড়ি—ওকে বাঁচাতে হবে। আজ এখানে কাল ওখানে কত খুন-খারাপির খবর শুনি—এতদিন তো কার না কার কি হচ্ছে বলে মন দিতাম না, গা করতাম না, কিন্তু এখন? এ তো নিজেদের গায়ে আগুন—

বুড়ো—ওর সঙ্গে কথা বলব? কি, কি চায় ওরা?

বুড়ি—ওর কিসের অভাব ছিল?

বুড়ো—অভাবে না প্রাচুর্যে।

বুড়ি—প্রাচুর্যে?

বুড়ো—এনার্জির প্রাচুর্য। অথচ ওকে এখনও নাবালক বলে ট্রিট করা হয়। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে'—আর তো আমরা মানি না।

বুড়ি—কিন্তু মাসখানেক পরে তো আমাদের চলে যেতে হবে। কি হবে গো?

বুড়ো—মাসখানেক? মাসখানেক। ও অনেক সময়, আজ থেকেই বুবাই-এর পেছনে লাগা যাক। একটু চা খাওয়াবে?

বুড়ি—এখন! রত্না তা হলে—

বুড়ো—রত্নাকেও দাও না এককাপ—

বুড়ি—তুমি না। [মুখে হাসি] হাড়ে হাড়ে আমায় একেবারে জ্বালিয়ে দিলে।

[ভেতরে চলে যায়। মঞ্চ অন্ধকার হয়। সঙ্গীত। একটু পরে আবার মঞ্চ আলোকিত হলে দেখা যায় সিঁড়ির ওপরের দরজায় কান লাগিয়ে বৃদ্ধা কি যেন শোনবার চেষ্টা করছে, বৃদ্ধ একটি গামছায় মুখ মুছতে মুছতে ভিতরে আসে]

বৃদ্ধ—একি করছ? ছিঃ ছিঃ, এরকম করে ওদের কথা শুনছো কেন? চলে এস বলছি, চলে এস।

বুড়ি—[ঠোঁটে আঙুল দেয়, তারপর কাছে এসে বলে]—কথা কয়ো না, আমাকে শুনতে দাও।

বুড়ো—নাঃ, চিরকাল এইসব ব্যাপারকে ঘেন্না করে এসেছি—

বুড়ি—চিরকাল আমাদের জীবন-মরণের কথা হয়নি। আমাকে বাধা দিও না। বৃদ্ধা আবার দরজার কাছে যায়। [মাইকের মাধ্যমে ভেতরের কথা দর্শকদের কাছে পৌঁছায়। সেই সব কথার আঘাত প্রত্যাঘাত বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ওপর দেখা যায়।]

পার্থর গলা—এ ছাড়া আমি আর কোন উপায় দেখছি না।

পুতুল—সত্যি বলছি স্বদেশ, এমনিতে ওঁরা যদি ঠিক করে ব্যবহার করতেন তা হলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু দুজনে এক সঙ্গে থাকলে কি যে এক রাজ্যে থাকেন ওঁরা। আমাদের সংসারেও যে ওঁদের কোন দায়-দায়িত্ব আছে—

রত্না—বৌদি ঠিক বলেছে,—একটু আগে আমিও ঐকথাই বলছিলাম। তবে এক্ষেত্রে তো প্রয়োজনই।

পার্থ—বাবা উকিল ছিলেন, আমার বিজনেসে পরামর্শ দিয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারবেন—

পুতুল—আর ঝর্ণার এই প্রথম বাচ্চা হবে। সেখানে মাকে দরকার।

স্বদেশ—হ্যাঁ, দিল্লীতে একটা আয়া পেতে গেলে—

রত্না—ঠিকই তো অনেক খরচা,—কিন্তু তুমি কথাটা কিভাবে বললে বল তো?

স্বদেশ—ভাব-অভাবের কথা আমরা শুরু করলে—নীচে বাবা মা বুবাই—চাই কি আউট হাউস থেকে সদানন্দ পর্যন্ত ছুটে আসতে পারে। তোমরা তাড়াতাড়ি একটা ডিসিশান নাও। আমার ঘুম পাচ্ছে।

পার্থ—আমি বিপ্লব আর ঝর্ণার সঙ্গে কথা বলেছি, ওদেরও এই মত। তাছাড়া দুজনে দু জায়গায় থাকলে—

পুতুল—আমাদেরও বন্ধু-বান্ধবদের সামনে এমব্যারাসিং পজিশনে পড়তে হয় না।

স্বদেশ—তার মানে?

পুতুল—মানে ধর সন্ধ্যেবেলা বন্ধুরা এসেছে। ড্রয়িংরুমে হয়তো একটু ড্রিঙ্কস্ নিয়ে বসেছি। হঠাৎ দুজনের সখ হল ইভনিং ওয়াক-এ যাবেন। আমার ফ্ল্যাটের তো আবার ঐ একটি এনট্রানস। বাবা অন্যরকম—উনি একলা থাকলে আস্তে করে হয়তো বেরিয়ে যান, কিন্তু দুজনে যখন ঘটাপটা করে—

[এই সব কথার মাঝখানে বৃদ্ধা বৃদ্ধকে প্রায় টেনে নিয়ে এসেছে। প্রথমে বৃদ্ধ রাজি হয় না, তারপর দু-একটা কথা কানে যেতে আকর্ষণ অনুভব করে যেন, দরজায় আসে]

পার্থ—কোন মহিলা থাকলে মা আবার তার সঙ্গে আলাপ জুড়তে চান।

পুতুল—একদিন তো মিসেস কুরুপ-এর কি অবস্থা! বেচারা বাংলা জানে না।

রত্না—আসলে যুগটা যে কত পাল্টে গেছে মা-বাবার সে খেয়াল নেই।

স্বদেশ—যুগের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলার ব্যাপারটা ওঁরা বোঝেন না।

রত্না—তার মানে?

স্বদেশ—রত্না, আমাদের কুড়ি বছর বিয়ে হয়ে গেছে, এখনো প্রত্যেক কথায় যদি তুমি মানে জিজ্ঞেস কর তবে তো—

পার্থ—যাক গে এসব কথা—ও তো রত্নার সব সংসারে লেগে আছে—মোট কথা, এটা মানো কিনা যে, দুজনকে এখন আলাদা আলাদা রাখতে হবে। এবং সেটা উচিত।

স্বদেশ—সুবিধেজনক।

রত্না—হ্যাঁ, তাই। অনেকদিন আমরা নিজেদের সুবিধে দেখিনি। এবার দেখব। আমি তো কাউকে বাড়ীতে ইনভাইট করতে পারি না। বাবা এমন পিউরিটান না।

পার্থ—না, না, তাছাড়া ওঁদের দিকটাও ভাববার আছে। একজনের ভার নেওয়া অনেক সহজ। তাতে ওদের জন্যে স্পেশাল কেয়ার নেওয়া যায়।

পুতুল—সত্যি বলতে কি, বাবা একা থাকলে আমি বাবাকে মাথায় করে রাখতে পারি—কিন্তু মা? বাব্বাঃ।

রত্না—সত্যি কথা বলতে কি বৌদি ভাই, আসলে শাশুড়ীকে তুমি সহ্য করতে পার না। এলার্জি আছে।

পুতুল—তাহলে আমিও একটু সত্যি কথা বলি ভাই। তোমায় দেখে শিখেছি যে ভাই। তোমার বিয়ের এত বছর পর আমার বিয়ে হয়েছে। কিন্তু তোমাদের বাড়ী এসে তোমার শ্বশুর শাশুড়ী—

পার্থ—তোমরা এইভাবে নিজেদের মধ্যে শুরু করলে—কোনদিন পয়েন্টে পেঁৗছতে পারবে না। কাল ভোরে দার্জিলিং রওনা হতে হবে, মনে আছে তো?

রত্না—অনেক কথার জবাব সত্যি দেওয়া যায়, তবে থাক।—শোন, বাবা-মার কাছে কিভাবে কথাটা বলা যায়?

স্বদেশ—তোমরা নিশ্চয়ই এক্ষুণি সোজাসুজি এসব কথা বলতে বসবে না?

পার্থ—পাগল নাকি? এখন বলতেই হবে। এটা দরকার হয়ে পড়েছে,—তারপর মা দিল্লী গেলে এক বছরের আগে তো মায়ের আসা সম্ভব নয়। আর ঐ একটা ট্যাক্সের ব্যাপারে—মানে বাবার বুদ্ধিটা আমার দরকার,—মামলা ঠুকলে এখন—

রত্না—তুমি মাকে চেন না দাদা। এক বছর থাকতেই চাইবে না।

পুতুল—না, না, তা কি করে হবে? ঝর্ণা আমাকে লিখেছে এক বছরের আগে ও বুড়িকে ছাড়তেই পারবে না।

[বৃদ্ধ দরজার কাছ থেকে যেন ছিটকে সরে নীচে নেমে আসে, বৃদ্ধাও তাই এগিয়ে আসে সামনের দিকে]

বুড়ো—এ—ক বছর

বুড়ি—এ—ক বছর

[দুজনে দুজনের দিকে তাকায়]

আলো বদলায়। সংগীত। দূরে মসজিদের আজান। রাত সাড়ে চারটে হল। বুবাই পিছনের একটা দরজা দিয়ে ঢুকে আলো জ্বালায়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বুবাইকে দেখে চমকায়, ওকে আশা করেনি—বুবাই-এরও এক অবস্থা]

বুবাই—[চাপা গলায় হেসে] কি! জিজ্ঞাসা করলে না কোন্ অভিসারে গিয়েছিলি?

বুড়ো—তুই জিজ্ঞাসা করলি না ভোর রাতে—শোবার ঘর ছেড়ে আমরা এখানে বসে আছি কেন?

বুবাই—মর্নিং ওয়াক করতে যাবে বলে বসে আছো।

বুড়ি—সারারাত কোথায় ছিলি?

বুবাই—অভিসারে।

[তিনজনেই কথা বলে রসিকতা করবার চেষ্টা করে, জমে না। বোঝা যায় নিজের চিন্তায় ব্যস্ত]

বুড়ি—এখানকার পড়া তো তোর শেষ হল, কলকাতা যাবি না পড়তে?

বুবাই—না পড়াশোনা করব না। মানে এই পড়াশোনা।

বুড়ি—তুই কলকাতা গেলে তোর দাদুর একটু সুবিধে হত। তবু একটা মানুষ থাকত যে—

বুড়ো—তুমি থাম তো। কোথায় কি? এখন থেকে দুশ্চিন্তা শুরু হল।

বুবাই—কি হয়েছে?

বুড়ো—না, কিছু না।

বুড়ি—বুবাই ধোঁকা দিসনে, বল কোথায় গিয়েছিলি? কোন্ পথ ধরেছিস্?

বুবাই—আসল পথ, জঞ্জাল সাফ করতে হবে গো। নইলে অভিসারের পথ বড় কণ্টকাকীর্ণ। যাই বড্ড ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু দেখ সখা সখি। পরম পূজনীয় আর পরম পূজনীয়ারা যেন আমার এই অভিসারের কথা—

বুড়ো—না, জানতে পারবে না, কিন্তু ঢুকলি কোথা দিয়ে? পেছনের বাগান টপকে?

বুবাই—হ্যাঁ দিদু, রান্নাঘরের খিড়কি দিতে ভুলে গেলে কেন? কোনদিন তো ভুল হয় না। রোজ অনেক কারকিত করে খুলতে হয়। আজ দেখি—ভুল হল কেন গো?

বুড়ি—যা সব ঘটছে কোনদিন বাপের নামটাই না ভুলে বসে থাকি।

বুড়ো—আঃ মেয়েছেলে তো, যাও দাদু তুমি একটু গড়িয়ে নাও। ঘুম ভাঙলে তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলব।

বুবাই—ঠিক হ্যায়, বুঝতে পাচ্ছি একটা সংকট সৃষ্টি—

বুড়ো—আর কোন কথা নয়, তুমি শুয়ে পড়গে—

বুড়ি—ঠিক। তাছাড়া এই অবস্থায় তোকে ওরা দেখলে—

বুবাই—দেখুক, আমি আর ওদের পরোয়া করি না। নাঃ শুতে যাই।

[চলে যায়]

বুড়ি—কি হবে গো? এ যে চারদিক দিয়ে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আমার মাথার মধ্যে যেন কেমন করছে—

বুড়ো—এখনই মাথা বড্ড বেশী ঠাণ্ডা রাখা দরকার।

বুড়ি—কিন্তু এক বছর আমাকে সেই হিল্লি-দিল্লি নিয়ে ফেলে রাখবে। নিজেদের মতে তো কিছু করা সেই কবেই ঘুচে গেছে। এখন তোমার—ভগবান না করুন, তোমার যদি একটা অসুখ বিসুখ করে বসে। আর আমায় যদি আসতে না দেয়।

বুড়ো—বা, তোমার কিছু হয়ে বসল আর আমাকে—

বুড়ি—তা হলে?

বুড়ো—না, না সে কি করে সম্ভব? না, না।

বুড়ি—কত অসম্ভবই তো সম্ভব হচ্ছে। স্বদেশী করে যারা মন্ত্রী হল তারা নাকি ঘুষ নিচ্ছে। যারা কালোবাজার করে ওষুধে খাবারে ভেজাল মিশিযে কোটিপতি হল, তারা সব ইস্কুল-টিসকুল উদ্বোধন করতে যেয়ে ছেলেমেয়েদের ভালো থাকবে, সৎ থাকবে শিক্ষে দিচ্ছে। এই রকম আরও কত কাণ্ড ঘটছে। আমরা ওদের জন্ম দিয়েছি—লেখাপড়া শিখিয়েছি—সর্বস্ব খুইয়েছি ওদের জন্যে—তা এখন ওরা ওদের স্বার্থ দেখলে এতেই কি অসম্ভব ব্যাপার হল?

বুড়ো—ওদের সম্ভব ওরা করুক, আমাদেব সম্ভব আমরা করব।

বুড়ি—মানে?

বুড়ো—জানি না, এখনও জানি না। তবে—একটাই মুশকিল, মনস্থির করে নিজেদের ভাবনাটা ভাবতে পারছি না। কেবলই বুবাইএর চিন্তাটা—মাথাটা—

বুড়ি—হ্যাঁ, আমারও বড় ভয় করছে। কাল সারারাত ও কোথায় ছিল?

বুড়ো—ওদের পার্টির কাজ করছিল।

বুড়ি—কিন্তু ব্যাপারটা কি? কি কাজ?

বুড়ো—জানি না, জানি না। কিছু বুঝতে পারছি না। মাথাটা কেমন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধিতে যেন আর কুলায় না।

বুড়ি—কিন্তু এই সময়ই তো মাথাটা ঠাণ্ডা রাখা দরকার—তাই না?

বুড়ো—বাঃ রে, সহধর্মিণী ভাল দিয়েছ এটা। কথাটা বুমেরাং করে আমাকেই ফিরিয়ে দিয়েছ।

বুড়ি—যত বোকা তোমরা আমাকে ভাবো, আমি ঠিক তত বোকা নই।

বুড়ো—তুমি বোকা? কে বললে? তোমার হাড়েহাড়ে বজ্জাতি। আমি ছাড়া আর এমন কে জানে?

বুড়ি—সাত সকালে বজ্জাত বজ্জাত কোর না। নিজে কি যেন এক সাধুপুরুষ রে। তোমার শয়তানী জানতে আমার যেন বাকি আছে।

বুড়ো—[হেসে] সাত সকালে বজ্জাত বলা চলে না, তবে শয়তান বলা চলে বোঝা গেল।

বুড়ি—আমি ইচ্ছে করে বলেছি নাকি? তুমি বললে বলেই তো বললাম। তা ভালই হবে। এক বছর তো আর বজ্জাত লোকটার মুখ দেখতে হবে না।

বুড়ো—শয়তান লোকেরা বজ্জাত লোকেদের মুখ দেখতে ভালবাসে।

বুড়ি—আহা! রসিক নাগর!

বুড়ো—[বুড়ো বুড়ির হাতে মোচড় দিতে দিতে] কথাটা কে শিখিয়েছিল বল, বল।

বুড়ি—কে আবার, এই শয়তান লোকটা। ছাড় লাগে।

[বুড়ো বুড়িকে ছেড়ে একটু দূরে চলে যায়]

বুড়ো—ভোলা যায় না, না? কিছুই ভোলা যায় না। তলিয়ে থাকে। একটু নাড়া দাও, কেমন সব ভেসে ওঠে।

বুড়ি—ভেসে ওঠে। ভেসে ভেসে আবার কোথায় চলে যায়। নাগাল পাইনে।

[একটু চুপচাপ]

বুড়ো—দেখ তো এটার নাগাল পাও নাকি। বাড়ীতে কিছু একটা ছিল। হালুই-করেরা নানারকম মিষ্টি তোয়ের করছিল। আমি একজনেরে বলেছিলাম দুটো পান্তুয়া লুকিয়ে চুরিয়ে আমায় দিয়ে যেতে। আমি ঐ পুবের বারান্দায় বসছি—তা সে ভুলেই গেল। কবেকার কথা কে ভুলে গিয়েছিল? বল তো দেখি?

বুড়ি—আহা! ঢং—সে তো পার্থর অন্নপ্রাশনের দিনে। বাবা! ও কথা কোনদিন ভুলবো? বাড়ী ভর্তি লোক। শ্বশুর-শাশুড়ী আত্মীয়-স্বজন। উনি ফরমাশ করে বসলেন,—কি আর করি। তক্কে তক্কে আছি। কোন্ সুযোগে নেওয়া যায় পান্তুয়া। খুড়-শ্বশুর তো সারাক্ষণ সেখানে বসে আছে। এদিকে কে যেন? হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে। ভাগ্নে—ঐ যে তোমার বড়দির ছেলে সন্তোষ, এসে বলে, মামী ছোট মাসীর গরুরগাড়ী থেকে নামতে গিয়ে পা কেটে গেছে। শিগ্গির এসো। মনে পড়েছে? কল্পরা গো? তোমার ছোটবোন। গিয়ে দেখি কি রক্ত—কি রক্ত, গেলাম সব ভুলে—দুপুরে বাবু খেলেন না, বললেন শরীর খারাপ। ভাবলাম সত্যি বুঝিবা। ওমা, তারপর বিপরীত কাণ্ড।

বুড়ো—বিপরীত কাণ্ডটা কি শুনি? নিজে তো বেশ এক পেট খেয়ে নিয়েছিলে!

বুড়ি—তা আমি কি করব, ননদদের জোরাজুরিতে বসে পড়লাম ওদের সঙ্গে, তারপর ঘরে গিয়ে বুঝলাম পেটের গণ্ডগোল-টোল সব বাজে কথা; বাবুর রাগ হয়েছে। লজ্জা! লজ্জা! কি ক্যাঁট ক্যাঁট কথা শোনানো; বাব্বাঃ তখন আমার মনে হচ্ছিল, পেটের থেকে পোলাও মিষ্টি লুচি সব যদি উগড়ে ফেলতে পারতাম। পায়ে ধরে মাপ চেয়ে, আলাদা করে খাওয়ার ব্যবস্থা করে তবে শান্তি।

বুড়ো—সন্ধি।

বুড়ি—ঐ হল। বুঝতে পেরে ননদ-জায়েদের কি হাসাহাসি। মাগো, লজ্জায় মরি। [একটু চুপ] সেবারে পোলাও-এ কত পেস্তা-বাদাম পড়েছিল বল তো। এখন পেস্তা-বাদাম দেখাই যায় না।

বুড়ো—সব নাকি বিদেশে চলে যাচ্ছে। সাহেবরা খাচ্ছে। এখানে থাকতে সর্বস্ব লুটেপুটে নিয়ে গেছে। যা পেয়েছে গোগ্রাসে গিলেছে। গিলে গিলে পেস্তা বাদাম খাওয়ার অব্যেসটা তো হয়ে গিয়েছিল। তাই ওখানে গিয়ে ফরমাস করে পাঠাচ্ছেন; আর আমাদের নয়া সাহেবরা তড়িঘড়ি সব পাঠাচ্ছেন। বিদেশীমুদ্রা নাকি অর্জন হচ্ছে। হবেওবা। তা আমরা কোত্থেকে ও সব পাব বল?

বুড়ি—মুদ্রা তো অর্জন হচ্ছে, কিন্তু সেগুলো যাচ্ছে কোথায়?

বুড়ো—আমরা তো এখন আদার ব্যাপারী। [চুপচাপ]

বুড়ি—এরা যে আজকাল কি সব ফ্রায়েড—রাইস-মাইস করে! দূর, দূর! পোলাও-এর কাছে কিছু না, বল?

বুড়ো—সত্যি কিছু না! সেদিনের কাছে এদিনের কিছুই কিছু না। তবু সে দিনটা নেই। আর এদিনটা আছে।

বুড়ি—কি কথার থেকে যে কি কথা নিয়ে আস, মানেই বোঝা যায় না।

বুড়ো—ভোব হয়ে এল সবাই তো এখনই উঠে পড়বে, যাও খিড়কির দরজা খুলে দাওগে। সদানন্দ এল বলে।

বুড়ি—আমি নাকি কোন কাজেই লাগিনে। সাতসকালে এই দরজা খুলে দেবার কাজটাই বা কে করে বল?

বুড়ো—যাই আমিও একটু গড়িয়ে নিই, কোমরটা বড্ড ব্যথা করছে।

বুড়ি—আমারও গো!

বুড়ো—তা হলে এস, দরজা খুলে রেখে শুয়ে পড়বে এস।

বুড়ি—হ্যাঁ খিড়কিটা খুলে রেখে আসি।

[দুজনে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। সমস্ত কিছু একটু থেমে থাকে। যন্ত্রে সকালের সুর, পাখীর ডাক তো চলছিলই। এইসব শব্দকে চুরমার করে একটা জীপ এসে বাইরে দাঁড়ায়। দেখা যায় সুসজ্জিতা রত্না সিঁড়ি দিয়ে নেমে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। এবার ঐ

[একই দিক দিয়ে পার্থ, পুতুল এবং স্বদেশ আসে]

পার্থ—রত্না পরে ধীরে সুস্থে বাবা-মাকে বলে দিলেই পারতো। এখনও তো মাঝখানে দিনতিনেক সময় আছে।

স্বদেশ—না, না তা হয় না, এখানে আমি রত্নাকে দোষ দিতে পারি না ; ওই বা একা রেসপনসিবিলিটি নেবে কেন?

পার্থ—ঠিক আছে, ঠিক আছে, তবে এমন তেমন দেখলে তোমরাও একটু মদত দিও। বুড়ো আবার তর্কে ওস্তাদ। উকিল ছিল তো।

পুতুল—সে তো বটেই। আমি সে ভাল করেই শুনিয়ে দিতে পারব।

পার্থ—দোহাই তোমার, তুমি বরং একটু চুপ করে থেকো।

পুতুল—চুপ করে থাকতে পারলে আমি তো বেঁচে যাই। কলকাতায় নিজে ঝামেলা এড়াবার জন্যে তো সব সময় আমাকে সামনে এগিয়ে দাও, কেন?

স্বদেশ—চেপে যাও, চেপে যাও পুতুল। আমি আর তুমি তো বাইরের লোক। ব্যাপারটা আসলে পার্থর আর রত্নার।

পুতুল—তোমার মত আমি যদি ভাবতে পারতাম ; তুমি যে জাতে পুরুষ, পুরুষজাতের অনেক সুবিধে। নামেই আমরা প্রগেসিভ। এখনও ভেতরে ভেতরে বাড়ীরবৌ বলতে তোমাদের সেই পুরনো ধারণাগুলো কাজ করে চলেছে।

স্বদেশ—নাঃ তুমি অসম্ভব টেন্স হয়ে আছ।

পার্থ—রাইট ইউ আর।

[রত্না প্রবেশ করে, খানিক বিরক্ত খানিক কৌতুকে বলে]

রত্না—কি জানি বাবা, কি করব।

সবাই—কেন কি হল?

রত্না—দুজনে এমন ঘুমুচ্ছে!

স্বদেশ—ওঁরা তো সেই কোন্ ভোরে উঠে পড়েন। ঘুমুচ্ছেন মানে?

পার্থ—দুজনেই তো আর্লি রাইজার।

পুতুল—বলে! বুড়ি তো আবার আর এককাঠি। সাতসকালে উঠে বাথরুমে গিয়ে এত জোরে কল খুলে দেবেন! একটু মৌজ করে ঘুমোয় কার সাধ্যি।

[পার্থ তাকায় পুতুলের দিকে, নিজের কানে হাত চাপা দেয়]

স্বদেশ—[রত্নাকে] তা তুমি একটু ঠেলা দিয়ে ডাকলেই তো পারতে। বলা যায় না বয়সটা তো সুবিধের নয়।

পার্থ—ঠিক তো—এদিকটা তো ভাবিনি!

পুতুল—না, না স্বদেশ। ও আমি বিশ্বাস করি না—দুজনেরই একসঙ্গে একটা কিছু হবে, অ্যাবসার্ড।

রম্না—দুজনে যেন কি!

স্বদেশ—[রম্নাকে] দুজনে যেন কি মানে?

পার্থ—হ্যাঁ কি?

পুতুল—[এসব কথায় কান না দিয়ে]—তাছাড়া বিপ্লবের ওখানে উর্মী তো কোম্পানীর ডাক্তারকে দিয়ে চেক করিয়েছিল। সব তো নরমাল—

পার্থ—আঃ তুমি থাম তো। বিপ্লবের ওখানে গেলেই যে একটা চেকআপ হয় সেটা সকলেই জানে।

স্বদেশ—রম্না, দুজনে কি বললে না?

রম্না—[থেমে থেমে]—না, মানে কি রকম জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে। আমার কেমন লজ্জা করছে।

পুতুল—ওমা, দরজা খোলা রেখে।

রম্না—না, দরজা তো ভেজানোই ছিল। আমি ভাবলাম হাজার হলেও বয়েস তো হয়েছে!

স্বদেশ—ঠিক আছে, ঠিক আছে। দরজাটা আবার ভেজিয়ে দিয়ে দরজায় ধাক্কা দাও।

রম্না—তাহলে বৌদি যাক। আমি আর পারব না।

পুতুল– ঠাকুরঝি ভাই, তুমি একটু ঢঙী আছ। তোমার নিজের বাবা-মা আর, —আমি পারব না। দায় তোমার দাদার আর তোমার। আমায় কর্তা [পার্থকে দেখায়] যা হুকুম করবেন তামিল করে দেব—ব্যস্।

রম্না—সত্যি বলতে কি ভাই বৌদি, আমার কোনও দায় নেই। সে হিসেবে ঝর্ণারও নেই। বাবা মায়ের দায় ছেলেদের ওপর বর্তায়। তবে নেহাৎ আমরা আজকালকার মেয়ে তাই রেস্পন্সিবিলিটি শার্প করতে চাই না। অন্য অনেক সংসারের দিকে তাকিয়ে দেখ না একবার।

পুতুল—কি বলেছিলাম স্বদেশ। ভেতরে ভেতরে সেই সনাতন ভারতবর্ষ কাজ করে চলেছে!

পার্থ—দেখ রম্না, ওভাবে কথা বলাটা তোর ঠিক না, আমাকে এম-কম্ পাশ করাতে বাবার যত খরচ পড়েছিল, তোকে এম-এ পাশ করাতে তার চাইতে কিছু কম পড়েনি তাই—

স্বদেশ—আঃ পার্থদা, তুমিও এইসব মেয়েলি ব্যাপারে ঢুকে পড়লে? নাঃ তোমাকে নিয়ে—! হরিসিংএর জীপ সেই কখন থেকে অপেক্ষা করছে। দার্জিলিং যাবে না?

পার্থ—যা যা রম্না, দেরী করিসনি—

রম্না—স্বদেশ, তুমি যাও না। আমি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে এসেছি।

স্বদেশ—কি মুশকিল। আমি গিয়ে কি বলব? আপনাদের সঙ্গে আপনাদের ছেলেমেয়ে কথা বলবে বলে বসে আছে?

রত্না—তাহলে দাদা যাক। আমি পারব না।

পুতুল—উঃ বাবাঃ, তোমাদের এইসব করতে করতে শেষকালে সেই ভরারোদের মধ্যে স্টার্ট করতে হবে। আজও একটু মেঘের দেখা নেই। [হাতঘড়ি দেখে] ওমাঃ, সাতটা বেজে গেল, আমিই যাচ্ছি—

পার্থ—হ্যাঁ সেই ভাল। তুমি গিয়ে বেশ মোলায়েম করে বল, আমরা চলে যাচ্ছি, তাই যাবার সময় একটু দেখা করব।

পুতুল—[হেসে] আগের দিন হলে বেশ বলা যেত—একটু পায়ের ধুলো নেব। [চলে যায়।] পার্থ কেস বার করে সিগারেট ধরায়। স্বদেশের দিকে কেসটা এগিয়ে দেয়, স্বদেশ নেয় না]

স্বদেশ—কি লাভ। সিগারেটটা নষ্ট করে—ওঁদের সামনে পড়লে তো—

পার্থ—মাইরি স্বদেশ, তুমি এত হিসেবি—

রত্না—ছাই। একটু হিসেবি হলে আমি বাঁচতাম। নইলে ও যে পজিশনে আছে, অন্য লোক হলে এতদিন কলকাতায়,—নিদেনপক্ষে শিলিগুড়িতে একটা বাড়ী করে ফেলতে পারত। কিন্তু কোথায়।

পার্থ—সত্যি, সেদিক থেকে—মানে এই যে তোমার অনেস্টি—

স্বদেশ—তুমি তো হিসেবের বাইরের কড়ির কথা বলছ রত্না। এখনও বাড়ী করতে পারিনি, তবে খুব নিরামিষও তো যাচ্ছে না।

রত্না—হ্যাঁ, মানুষের অবস্থা বুঝে উপরি নিয়ে, কনসেন্স্ বাঁচাতেই—

পার্থ—তাই বল ব্রাদার। নিজেকে হঠাৎ এমন ডোয়ার্ফ ডোয়ার্ফ লাগছিল। ঐ মরালিস্টদেব ভাই আমি একটু পাশ কাটিয়ে চলতে চাই।

রত্না—আজকাল মর্যালটা কোথায় আছে বলতে পার? জীবনে ঠকবার জন্যে মর্যালিস্ট হয়ে থাকবার মধ্যে কি যে বাহাদুরি আছে—

পার্থ—এই হল কথা। তা স্বদেশ তোমার ঐ "এখনও" কথাটা স্ট্রাইকিং লাগল। মানে বাড়ী করবার প্ল্যান আছে?

স্বদেশ—না না, এখনই কোথায় কি। There's many a slip between the cup and the lip.

পার্থ—না না, আমার কাছে তোমাব ভয় বা লজ্জার কিছু নেই। আমার এক পার্টনারের অনেকগুলো ভাল প্লট আছে যোধপুর পার্কে।

স্বদেশ—নাঃ, যদি বাড়ী করিই তবে ভাবছি নর্থবেঙ্গলেই করব, আফটার অল এদিকের ছেলে তো।

পার্থ—সে তো আমার বচপনও কেটেছে বাবা এই নর্থবেঙ্গলে। তবে কলকাতার কাছে—

রত্না—ঠিক বলেছ দাদা, কলকাতায় থাকলেই মনে হয় মেইনস্ট্রীমের সঙ্গে আছি। কলকাতা হচ্ছে বাঙালীর প্রাণকেন্দ্র।

স্বদেশ—তোমার শিলিগুড়িও কিছু পেছিয়ে নেই। সবাই তো এখনই বলে

বাংলার দ্বিতীয় রাজধানী। কাল আপিসে শুনলাম সামনের মাসে স্টার নাইট হচ্ছে। বম্বে ফিল্ম স্টাররা আসছে।

রত্না—এই, আগে থেকে টিকিটের বন্দোবস্ত কোর কিন্তু, সেবারে কলকাতা থেকে অতবড় নাটকের দল নাটক করে গেল, তোমার গড়িমসিতে শেষ পর্যন্ত আমরা টিকিটই পেলাম না। সবাই তা নিয়ে অত কথা বলছে—আমরা হাঁ করে আছি। এত খারাপ লাগে না।

স্বদেশ—না না, এবারেরটা তো আরও ইম্পর্টেন্ট। আমি স্টার ফেস্টিভ্যালে যাইনি, এ তো বলাই যাবে না। হাইয়েস্ট টিকিট একশ টাকা। না গেলে লোকে ভাববে পয়সার ভয়ে যাইনি। সে তো আত্মহত্যার সামিল হবে।

রত্না—কি জানি বাবা। তুমি কখন যে সিরিয়াসলি কথা বল আর কখন যে ঠাট্টা করে কথা বল—বোঝাই যায় না।

স্বদেশ—হ্যাঁ ঘ্যান ঘ্যান, প্যান প্যান করে যেও, যেটা তোমাদের মানায়।

রত্না—ইয়েস স্যার। আর তুমিও ভাল করে ঘুষ নিয়ে বৌ ছেলেকে নিয়ে সুখে থাকবে বলে একটা বাড়ী বানাও, যেটা তোমাদের আধুনিক অফিসারদের মানায়।

[স্বদেশ ঘুরে কি একটা বলতে যায়, পুতুল ঢোকে]

পুতুল—চল, বুড়ো-বুড়ি উঠে বসে তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। রত্না, আমি সদানন্দকে বলে এসেছি ওঁদের একটু চা-টা দিতে।

রত্না—ওমা, ওখানে কি করে কথা বলা যাবে, যা বলব তাইতো সদানন্দের কানে ঢুকবে। তাছাড়া পাশের ঘরে বুবাই ঘুমুচ্ছে। কাল হয়তো রাত্তির অবধি পড়াশোনা করেছে, তাই বোধহয় এখনও ঘুমুচ্ছে। ও যদি জেগে যায়।

স্বদেশ—হ্যাঁ, এসব কথা এগুতে থাকলে একটা উত্তাপ সৃষ্টি হওয়া বিচিত্র নয়।

রত্না—হবেই। মা যা করবে না—আমি জানি—

পার্থ—যাই, আমিই ডেকে নিয়ে আসছি।

[চলে যায়]

স্বদেশ—ওদের চা-টা পর্যন্ত খাওয়া হল না।

পুতুল—ও বাবা, তা হলে আজ আর আমাদের দার্জিলিং যাওয়া হল না।

রত্না—আচ্ছা স্বদেশ, এটা এমন একটা কি সাংঘাতিক ব্যাপার যে—

পুতুল—এখন এমন একটা বয়স ওদের নয় যে একসঙ্গে না থাকলে—

রত্না—তা ছাড়া রোজ সকাল ছ'টার মধ্যে ওঁদের চা খাওয়া হয়ে যায়। আজ এখনও ঘুমুবেন কি করে জানব বল?

পুতুল—কি মুশকিল আমি তো চায়ের কথা বলে এসেছি।

রত্না—[স্বদেশকে]—তুমি এক এক সময় এমন একটা এ্যাটমোসফিয়ার করে

তোল না—

স্বদেশ—আচ্ছা বাবা, আচ্ছা। তোমাদের বাবা মা তোমরা বুঝবে। আমার কি।

[পার্থর প্রবেশ]

পার্থ—আসছেন।

[প্রত্যেকে এক একটা জায়গায় গিয়ে নিজেদের স্থান নেয়। কেউ বসে, কেউ দাঁড়িয়ে, পার্থ পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করে; স্বদেশের দিকে চোখ পড়ায় আবার পকেটে রেখে দেয়। বৃদ্ধ আর বৃদ্ধার আসার অপেক্ষায় শক্ত হয়ে এরা অপেক্ষা করে। পর্দা নেমে আসে। বিরতি। বিরতির পর আবার একই অবস্থায় আলো জ্বলে। বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা প্রবেশ করে। একটু চুপচাপ।]

স্বদেশ—বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

পার্থ—[একটা চেয়ার এগিয়ে দিতে দিতে] বস বাবা।

রত্না—[একটা মোড়া এগিয়ে দিয়ে] বস মা।

[বৃদ্ধ বৃদ্ধা বসে]

পার্থ—আমরা তো আজ দার্জিলিং চললাম। [একটু চুপ]

বুড়ো—হ্যাঁ বল।

পার্থ—দিন তিনেক পরে ফিরবো। ভাবছি সেই একমাস পরে তো তোমাদের যেতেই হবে। তা আমাদের সঙ্গে চল না। [একটু চুপ]

বুড়ি—এত তাড়াতাড়ি তাহলে—

রত্না—তাড়াতাড়ি কি মা, দুমাস তো হয়ে গেল। তাছাড়া কলকাতা, দিল্লী এসব জায়গা তো তোমার এই এঁদোপচা জায়গার তুলনায় স্বর্গ।

বুড়ি—আমাদের আবার স্বর্গ আর নরক। সেই তো এক কোণে পড়ে থাকা।

বুড়ো—আঃ। ওরা কি বলে শুনতে দাও। বল। বল পার্থ, কি বলবে।

পার্থ—নাঃ, বলছিলাম এই ঝিমলিটার এক এক সময় খুব মুশকিল হয়। আমাকে আর পুতুলকে তো প্রায়ই সন্ধ্যেবেলায় পার্টি-ফার্টিতে—মানে ঐ নিমন্ত্রণ রাখতে বের হয়ে যেতে হয়। আজকাল আবার এসব এ্যাটেন্ড না করলে তো বিজনেস চালানোই দায়। তাই তোমাদের একজন থাকলে—

বুড়ি—কিন্তু ঝিমলি কি আমাদের কথা—

পুতুল—বাবাকে ঝিমলি খুব ভালোবাসে। আসবার সময় আমাকে বলল, 'মা দাদুকে বোল দাদু এলে আমি আর দাদু একদিন জয় রাইডে যাব। সেদিন কিন্তু গাড়ীটা ছেড়ে দিতে হবে মা—'

বুড়ো—ঝিমলি কি যেন হয়েছে?

পার্থ—এখনও কিছু হয়-টয়নি। সামনের বছর আই. সি. এস. সি. দেবে।

বুড়ো—আঃ মনে পড়ছে না, [বুড়িকে] কি যেন বললে তুমি?

বুড়ি—আমি আবার কখন কি বললাম? যাক্‌গে সেসব কথা—

পুতুল—ওঃ বুঝেছি। ওর ফিগারটা তো খুব সুন্দর হয়েছে। তাই দু'একটা এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সি থেকে জোর করে ছবি তুলে নিয়ে যায়। তবে আমি বলে দিয়েছি ওসব পয়সা-টয়সা নেওয়া চলবে না।

[এই কথার মাঝখানে পার্থ দু একবার থামাতে চেষ্টা করে, ব্যর্থ হয়]

বুড়ো—ওঃ ভাল।

বুড়ি—ভাল বৈকি, যে যুগের যা—

বুড়ো—আঃ। তোমাদের দার্জিলিং যাবার দেরী হয়ে যাচ্ছে। কি বলবে বল।

রত্না—বাবা, ঝর্ণা দাদাকে চিঠি লিখেছে। ও প্রেগন্যান্ট। তাই মা যদি ওর কাছে গিয়ে থাকে, ওর একটু সুবিধে হয় আর কি।

বুড়ি—একমাস পরে তো আমাদের সেখানে যাবার কথাই আছে।

বুড়ো—তা একথা ঝর্ণা তো তার মাকে লিখলেও পারত।

পার্থ—আমাকে না।—আসলে পুতুলকে লিখেছে। তা ছাড়া সেদিন সমর ওর অফিসের ব্যাপারে কলকাতায় এসেছিল। ও বলছিল মা যদি তাড়াতাড়ি দিল্লীতে আসতে পারেন তো খুব ভাল হয়।

পুতুল—ঝর্ণার শরীরটা খুব খারাপ তো—

বুড়ো—মানে ঝর্ণাকে দেখাশোনা করবার জন্যে তোমাদের মা দিল্লী যাবেন।

বুড়ি—আর ঝিমলিকে দেখাশোনা করবার জন্যে তোমাদের বাবা কলকাতায় থাকবেন।

পার্থ—মা, তোমরা এমন করে কথা বলছ। সত্যি। বুঝছো না কেন যে, এটা এখন একটু প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বুড়ো—ব্যাপারটা কি দাঁড়াল? তোমরা আজ দার্জিলিং যাচ্ছ?

পার্থ—হ্যাঁ।

বুড়ো—তিনদিন পর অর্থাৎ বুধবার দার্জিলিং থেকে ফিরছো!

পার্থ—বৃহস্পতিবার।

বুড়ো—আমাকে আর তোমার মাকে নিয়ে কলকাতায় যাচ্ছ। তারপর তোমার মা দিল্লী চলে যাচ্ছেন। আর আমি কলকাতায় থাকছি। এই তো?

পার্থ—এক্কেবারে তাই।

বুড়ি—আমি কবে দিল্লী যাবো?

পার্থ—যত তাড়াতাড়ি এ্যারেঞ্জ করতে পারা যাবে। তাছাড়া বাবা, এইযে তোমাদের এখানে ওখানে কেবল ঘুরে বেড়ান এতে তোমাদেরও হয়তো মনে হতে পারে যে, তোমাদের যেন কোনও দামই নেই। কিন্তু ধর, যদি তুমি আমার বিজনেসের দিকটা মানে—আইনের মারপ্যাঁচ, ব্যাটারা যে কোথায় কি করে রেখেছে, একটু এদিক-ওদিক হলে গাড্ডা' আজকাল ইনকামট্যাক্সও—বুঝলে না।

বুড়ো—বুঝেছি। তোমার দু'নম্বর খাতাটা সামাল দিতে হবে।

রত্না—আর মা, আমাদের ছেলেমেয়েগুলো তো বড়ই হয়ে গেল। স্বর্ণার বাচ্চা হলে তাকে নেড়েচেড়ে আদর করে তোমার দিনগুলো বেশ কেটে যাবে। তাই না মা?

বুড়ি—সে তো ঠিক কথা। বাচ্চা নাড়াচাড়া করার মত আনন্দ আর কিসে আছে? তবে ক্ষমতা থাকা চাই।

রত্না—তার মানে?

বুড়ি—[ভয়ে ভয়ে]—মানে বয়স তো অনেক হল। পঁয়ষট্টি পার হয়ে গেছে। এখন রাত জাগা, তেল মাখান, পাউডার মাখান—

রত্না—[হেসে] ওঃ এই ব্যাপার। ও ভেবো না অব্যেস হয়ে যায়। (চকিতে) তা ছাড়া আয়া তো একটা থাকবেই, তোমাকে হয়তো একটু সুপারভাইজ করতে হবে।

পুতুল—তা হলে ঐ কথাই রইল মা। আমরা ফেরার পথে আপনাদের নিয়ে চলে যাচ্ছি।

পার্থ—এ আবার বারে বারে বলবার কি আছে?

[সদানন্দ ট্রে করে দু'পেয়ালা চা আর দুটো স্টেনলেসের বাটিতে কিছু খাদ্যদ্রব্য নিয়ে প্রবেশ করে। রত্না ওর হাত থেকে নিয়ে মা-বাবার সামনে দিতে থাকে।]

রত্না—সদানন্দ, যাও দাদা-বৌদির সুটকেস-টুটকেসগুলো জীপে তুলে দাও। বাইরের সিঁড়ি দিয়েই নিয়ে যেও।

[সদানন্দ চলে যায়]

পুতুল—যাই ওপর থেকে আমার ব্যাগটা নিয়ে আসি।

পার্থ—তা হলে আমার ব্রিফকেসটাও নিয়ে এসো।

[পুতুল ওপরে চলে যায়। একটা অস্বস্তিকর অবস্থা]

স্বদেশ—যাই দেখি ড্রাইভারটা আবার—[বেরিয়ে যায়]

রত্না—আমাদের জীপটাও বার কর না, একটু বাজারটা ঘুরে আসা যাবে।

[পার্থ অস্বস্তিতে সিগারেট কেসটা বার করে—আবার পকেটে রাখে]

বুড়ো—ইচ্ছে হলে খেতে পার, ওতে আর কি এসে যায়।

বুড়ি—কি যে বলো, এ্যাদ্দিন খায়নি আমাদের সামনে, এখন খেতে পারে?

পার্থ—পুতুল এত দেরী করছে। [ওপরে যেতে চায়।]

বুড়ো—শোন, আমাদের একটু ভাববার সময় দাও। এখুনি বলতে পারছি না তোমার মা দিল্লী যাবেন কি—না।

[সবাই একটু চুপ]

রত্না—বুঝতে তো পারছো বাবা যে এখুনি ছাড়া উপায় নেই। আমাদের

দরকার, তা দরকারগুলো তোমরা যদি না বোঝ।
পার্থ—তা ছাড়া এটা তো একটা পারমানেন্ট ব্যাপার হচ্ছে না, কয়েকটা মাসের ব্যাপার তো।
বুড়ো—কয়েকটা মাস? [কেউ কিছু বলে না] তবু ভেবে দেখি।
রত্না—যা ভাল বোঝ কর। এক এক সময় তোমরা এমন অবুঝ হয়ে যাও না।
পার্থ—যা আমরা করছি, তোমাদের ভাল হবে মনে করেই করছি।
রত্না—দেখ বাবা, যদিও আমার স্বভাব নয় এরকম করে কথা বলা—তবু বলছি, মানে তোমরা বোঝ না কেন যে তোমরা এখন আমাদের ওপর ডিপেনড্যান্ট। আমাদের ভালমন্দ তোমাদের একটু দেখতে হবে না?
বুড়ি—তবু উনি যখন বলছেন, আমিও একটু ভেবে দেখি।
রত্না—কোথায় বসে ভাববে? সে তো আমার এখানে বসেই ভাবতে হবে।

[স্তব্ধতা। পুতুলের প্রবেশ]

পুতুল—এই নাও তোমার ব্রিফকেস। চল। মা-বাবা যাচ্ছি তাহলে [প্রণাম করতে চায়। বৃদ্ধবৃদ্ধা দেয় না প্রণাম করতে]—তা হলে বেস্পতিবার দেখা হবে। জিনিষপত্তর সব গুছিয়ে রাখবেন মা। রত্না, তোমারও যেন মনে থাকে, বেস্পতিবার। হ্যাঁ, তোমার ঐ সদানন্দকে বলে রেখো চিকেন ফ্রাইটার কথা, ওটা ভারি সুন্দর শিখিয়েছো ওকে। ওটা আমার চাই-ই। [পার্থকে] চল।
পার্থ—চল। [বিশেষ কোন দিকে না তাকিয়ে বলে] যাচ্ছি তা হলে।
বুড়ো+বুড়ি—[কোন দিকে না তাকিয়ে] এসো।

[পার্থ-পুতুলের সঙ্গে রত্না বেরিয়ে যায়। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কেউ কারুর দিকে তাকায় না। স্তব্ধতা। সেইটে ভেঙ্গে দিয়ে জীপ কর্কশ আর্তনাদ করে বেরিয়ে যায়। আবার নিস্তব্ধতা। সদানন্দ প্রবেশ করে ট্রেটা তুলতে যায়।]

সদানন্দ—একি? কিছুই খান নাই তো। কেনে? চাটো জুড়াই গেইল্। আবার জল বসাও, ওঃ।
বুড়ি—না, আর বসাতে হবে না।
সদানন্দ—ক্যানে?
বুড়ো—আজ আমাদের উপোস।
সদানন্দ—সেইটো বলেন। [রত্না প্রবেশ করে হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ]
রত্না—সদানন্দ, আমরা বাজারে যাচ্ছি। ফিরতে একটু দেরী হতে পারে। বুবাই উঠলে ঠিকমতো ব্রেকফাস্ট করে দিও আর ওঃ হ্যাঁ মাকে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে মা-বাবা যা যা খাবে ঠিক করে, করে দিও।

সদানন্দ—উয়াদের তো আইজ্জ উপ্পাস।

রত্না—উপোস? কিসের উপোস? [বৃদ্ধ-বৃদ্ধা উত্তর দেয় না] সদানন্দ যাও, এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। কাজ করগে। বুবাইকে বলবে কোথাও বেরিয়ে না যায় আজ রোববার এক সঙ্গে সবাই খাবো। [সদানন্দ চলে যায়] মা তোমরা বড্ড বাড়াবাড়ি করছো। আমারও নার্ভ বলে একটা পদার্থ আছে। দয়া করে বুবাই আর সদানন্দের সামনে কোন সিন-ক্রিয়েট করো না। আমি যাচ্ছি।

[জীপের হর্ন, রত্না বেরিয়ে যায়। জীপ চলে যাওয়ার আওয়াজ]

বুড়ি—কি ভাবছো?

বুড়ো—ছবি দেখছি।

বুড়ি—ছবি?

বুড়ো—তুমি দেখছো না? কত দিনের কত কথা চোখের সামনে দিয়ে হুড়মুড় করে ভেসে যাচ্ছে না?

বুড়ি—ওঃ। সে তো যখন থেকে বন্ধ দরজার ওপর কান পেতেছি তখন থেকেই। যেন দুই-তিন-চার-পাঁচ কত পার্থ আর কত রত্নাকেই দেখলাম। পার্থ সাইকেল চড়া শিখতে গিয়ে এ্যাকসিডেন্ট করে এল। সে আমার আঁচল ছাড়ে না, কোথাও যেতে দেবে না আমাকে। রত্নার জামা ছিঁড়ে গেছে, দ্বিতীয় জামা নেই, রত্নার ইস্কুল যাওয়া হবে না, রত্না কাঁদছে—

বুড়ো—সে তো কলকাতা আসার পর। মনে আছে পার্থর অন্নপ্রাশনে পার্থর বিছে-হার হয়েছিল বলে রত্নার বেলায় তুমি বললে—

বুড়ি—মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, বললাম, মেয়ে বলে কি ফেলনা, ওকে বালা গড়িয়ে দিতে হবে—

বুড়ো—ছুটলাম তখনি কালাচাঁদ স্যাকরার বাড়ী।

বুড়ি—বিপ্লবের বেলায় আংটি। আর ঝর্ণার বেলায়—না। ঝর্ণার বেলায় কাঁসার থালা-গেলাস দিয়েই সারা হল।

বুড়ো—তার আগেই তো সেই পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ গেল না?

বুড়ি—মনে আছে, সেই একদিন এক বুড়ো চাষা। তখন ভিকিরি—

বুড়ো—ডেসটিটিউট্।

বুড়ি—ঐ হল, রত্না এসে আমাকে বলে—মা, ঐ বুড়োটা একটু ভাত খেতে চাচ্ছে। তা তখন তো আমাদের রাতের খাওয়া সারা, এক দলাও ভাত নেই কোথাও। তা গিয়ে বললাম, 'ভাত তো একটুও নেই।' তা কাছারির বারান্দায় শুয়ে পড়ে বললে 'আইছা কালই খাম।' রত্না জল আর গুড় দিল। খেল কিন্তু—

বুড়ো—সকালে উঠে আমিই তো প্রথম দেখলাম। মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে।

[দাঁড়িয়ে]

বুড়ি—মাগো !

বুড়ো—তোমরা, সাধারণ কত লোক ইংরেজ ভারত ছাড় বলে জেলে গেলে। নেতারা জেলে। সারা দেশের মানুষের মধ্যে এমন একটা, এমন একটা ইয়ে হল—

বুড়ি—হ্যাঁ, মনে হত কিসের একটা দোরগোড়ায় এসে গেছি। এবার দরজাটা খুললেই যেন এক দেশে পেঁাছে যাব। সেখানে বুঝি দুঃখু, কষ্ট, শোক, তাপ, অভাব কিছু থাকবে না। নিজেদের দেশ হবে, নিজেদের রাজা—

বুড়ো—আর তখনই নিজেদের দেশের লোকেরা সস্তায় চাল কিনে কিনে কোন্ অন্ধকারে পাঠিয়ে দিল—সূর্যের মুখ দেখল না সেই চাল ; আর তারই খোঁজে ধান ফলানো।

বুড়ো—বোকা চাষাগুলো দৌড় মারল শহয়ের দিকে—ঐ, ঐখানে আছে আমার হাতে ফলানো সোনার ধান। ধরেছিলো ঠিক। কিন্তু বোকা তো খুঁজে বার করতে পারল না।

বুড়ি—তখন যে ওদের দম ফুরিয়ে গিয়েছিলো। কি স্বপ্ন নিয়ে জেলে গেলাম, সেদিনে মিছিলে প্রথম সারিতে ছিল—কিরণদি, ক্ষিতীশদা আর বৈরাগী মামা, আর কে যেন। পরের সারিতেই আমরা, আমি লাহিড়ী মামী, পণ্ডা গুপ্ত। নিখিল দারোগা ঘোড়ার পিঠের ওপর থেকে চিৎকার করে বলছে, "এখনও বলছি পতাকা ফেলে দিন, ফিরে যান, না হলে আমি গুলি-লাঠি চালাতে বাধ্য হবো।" আর তত আমরা বলি 'বন্দেমাতরম্' 'ইংরেজ ভারত ছাড়', 'করেঙ্গে না মরেঙ্গে'—

বুড়ো—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

বুড়ি—ঐ হল। আমাদের পাশের বাড়ীর ঐ যে গো রবীন উকিলের বিধবা দিদি—ওঃ বুচিদিদি, বুচি দি, আমার কানে কানে বলে, "বৌ, তুই ছ' মাসের পোয়াতি, তুই বাড়ী যা, লাইন থেকে বেরিয়ে যা। গতিক ভাল না, কি হতে কি হয়।" তখন কি ঐ কথা কানে নিতে মন যায় ? মনে হল পৃথিবী রসাতলে গেলেও আমি লাইন ছাড়তে পারব না।

বুড়ো—আর বাড়ী বসে আমার কি চিন্তা, না থাকতে পেরে রাস্তায় বের হলাম, পার্থ রত্নাও চলল। আমার সঙ্গ ছাড়ে না। পার্থ তো বারে বারে জিজ্ঞাসা করে। "বাবা সত্যি গুলি চালাবে ? বাবা, মা মরে যাবে না তো !" আর তাই শুনে রত্না ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। ওদের কান্না দেখি আর আমার মন বলে ওঠে—কেন যে আমি তোমারে যেতে দিলাম।

বুড়ি—সেদিন যেতে না দিলে অধম্ম হত। পাড়া ঝেঁটিয়ে সব বেরিয়ে পড়েছে—

বুড়ো—সেই পার্থ আজ ফিকির খুঁজতে দার্জিলিং যাচ্ছে, কোন মন্ত্রী দার্জিলিং

গেছে তাই—আমাকে ওর কালো টাকার খবরদারি করতে বলছে।

[বসে পড়ে]

বুড়ি—সেই রমা আজ স্বদেশকে কম ঘুষ নেয় বলে গঞ্জনা দিচ্ছে—সেই বেয়াল্লিশে কি ভাবতেও পেরেছিলাম এমনটা হবে?

বুড়ো—তুমি খুব নাচুনি ছিলে—ঐ অবস্থা, তবু যেতেই হবে মিছিলে—

বুড়ি—এ-শিক্ষে তো তোমার মার কাছ থেকেই পেয়েছিলেম গো। তখন আমার সবে বিয়ে হয়েছে, বছরও বোধহয় পোরেনি, বিলিতি কাপড় বেচা বা পরা চলবে না বলে আবার আন্দোলন শুরু হল। বুড়ির কি পিকেটিং করা! রাম-রাম আগরওয়ালদের কাপড়ের দোকানটা ছিল না—দোকানের দরজা আটকে পা ছড়িয়ে বসে তকলিতে সুতো কাটা হচ্ছে।

বুড়ো—মা সেবারে অল বেঙ্গল সুতো কাটায় সেকেন্ড প্রাইজ পেয়েছিল। কি সরু করেই কাটতে পারত সুতো।

বুড়ি—হ্যাঁ, তা একদিন দুপুর বেলা সরবৎ করে নিয়ে গিয়ে দেখি, বড় দারোগা বলছে 'মা, আপনাকে হাতজোড় করে বলছি, উঠে আসুন।' মা যেন শুনতেই পায়নি। একমনে সুতো কেটে চলেছে, শেষকালে দারোগা আসল মূর্তি বার করলো, বললে, 'মেয়েছেলের গায়ে হাত দিতে চাইনে, কিন্তু এরপর আপনাকে টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় নামিয়ে দিতে হবে।' মা কেবল মুখ তুলে বললে, 'আঃ, কি হচ্ছে তখন থিকে ঘ্যানঘ্যান? আমাকে আমার কাজ করতে দাও।' কি গলা মার, এমন গলা আমি কোনদিন শুনিনি। দারোগা দাঁত চেপে কেমন একটা 'আচ্ছা' বলে চলে গেল।

বুড়ো—পাশের দোকানে সেই শোধ নিল সেন-জেঠিমার উপর।

বুড়ি—কবেকার সব কথা, সেই কথা সব মনে করতে গিয়ে কেমন এট্টা কেমন এট্টা আনন্দ লাগছে যেন সারা শরীলে।

বুড়ো—মনটাও বেঁচে আছে—শরীরটাও বেঁচে আছে তাই লাগছে—

বুড়ি—উঃ একটা সোজা কথা কি সোজা করে বলার উপায় নাই। ওমনি তোমার চলে যেতে হবে ঐ ফিল্‌জিতে?

বুড়ো—ফিলজফি।

বুড়ি—ঐ হোলো।

বুড়ো—হোলো না। জীবনে কোন ফিলজফি ঠিক করতে পাল্লে না তাই মরলে।

বুড়ি—তুমি পেরেছো তো, তাহলেই আমার হবে। তুমি বুঝে আমারে এট্টু বলে দিও তাহলেই হবে।

বুড়ো—দিল্লীকা লাড্ডু খেতে যাচ্ছ আর তো বলা যাবে না। লিখে, পাঠাতে হবে তো, তারপর বলবে, 'দেখ তো ঝর্ণা তোর বাবা এখানটায় জড়িয়ে মরিয়ে কি লিখেছে পড়তে পারছি না' ব্যাস আমার ফিলজফির বারোটা বেজে

গেল।

বুড়ি—আহা!

বুড়ো—মনে আছে? বিয়ের পরই কলকাতায় যেতে হল হাইকোর্টে একটা কেসের ব্যাপারে। অত কাজের মধ্যেও সহধর্মিণীকে চিঠি লিখলাম। তা বুঝতে না পেরে উনি সন্তোষকে দেখাতে গেলেন।

বুড়ি—তাও তো আমি প্রথমদিকটা আর শেষের দিকটা দু হাত দিয়ে চেপে ধরে—

বুড়ো—থাক, আসল কথাটাই দেখিয়ে দিলে সন্তোষকে।

বুড়ি—তা তুমি অত হেঁয়ালী করে লিখবে তা আমি জানব কি করে?

বুড়ো—সত্যি আমার খুব অন্যায় হয়েছিল। আমার বলে যাওয়া উচিত ছিল চিঠিতে কি কি লিখব।

বুড়ি—[হঠাৎ-ই] তা হলে আমি দিল্লী যাব না।

বুড়ো—আমাদের সে কথা বলার অধিকার আছে কি?

বুড়ি—ওসব আমি জানি-টানি না, আমি যাব না। না হলে তুমিও চল এক সাথে—

বুড়ো—এমন ভাবে কথা বলছ না, বয়স যেন কুড়ি,—যেন আমি এখনও হেড অফ দি ফ্যামিলি রয়েছি। রত্না বলল—শুনলে না আমরা ওদের ডিপেনডান্ট, আশ্রিত?

বুড়ি—দেশভাগে আশ্রয়চ্যুত হয়েছিলাম। এখন হয়ে গেলাম আশ্রিত। আচ্ছা কত লোক তো রিফিউজি বলে জমি-টমি সব পেল। তা তুমি পেলে না কেন?

বুড়ো—দরখাস্ত তো করেছিলাম আমিও। কিন্তু রিহ্যাবিলিটেশন আপিসে যেদিন দেখা করতে বলল, যেতে পারলাম না।

বুড়ি—পাল্লে না কেন?

বুড়ো—ভুলে বসে আছ। বিপ্লবের কলেরার মত হল না? ওকে নিয়ে ছুটলাম হাসপাতালে—

বুড়ি—ও, হ্যাঁ তো।

বুড়ো—তারপর যেদিন গেলাম আপিসের বাবুরা আর কোন কথাই শুনল না। তখনও রক্তের জোর ছিল। ভেবেছিলাম, একটা মাস্টারী তো পেয়েছি। যেমন করে হোক দাঁড়াবোই। এই বয়সের কথাটা তো তখন মনে পড়ে না।

বুড়ি—কত লোক ধর, কত পুরুষ ধরেই হয়তো কলকাতায় ছিল, কিন্তু কবে পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গে ছিল বলে দোবারা দোবারা জমি টাকা কত কি পেয়ে গেল। আমাদের কপালই পোড়া।

[ভেতরে বুবাই-এর গলা পাওয়া যায়। গান গাইতে গাইতে আসছে]

বুবাই—চলব চলব চলব আমরা,
মানব না কোন বাধা
শ্রেণী শত্রুকে করব খতম
সেই গানে গলা সাধা।
চিন্তা নাইকো। ক্ষতির জন্য (আরে)
যদি হয় সেটা প্রয়োজন
আত্মরক্ষা করতেই হবে (তাই)
প্রথমেই কর আক্রমণ।

[বুবাই প্রবেশ করে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কাঁধে ব্যাগ হাতে কিছু কাগজ ইত্যাদি]

বুড়ি—এ গান কোথায় শিখলি ?

বুড়ো—ওদের তাসখেলার আড্ডায় শিখেছে বোধহয়।

বুড়ি—তোর চেহারা ওরকম দেখাচ্ছে কেন ? ঘুমুসনি ?

বুবাই—ঘুমকে বললাম আমাকে আর জ্বালিও না, বাড়ী গিয়ে চটপট ঘুমিয়ে পড়,—তাই সে চলে গেল !

বুড়ি—হাতে ওগুলো কি ?

বুবাই—শুনে কি হবে ? বুঝবে ?

বুড়ি—বুঝব না কেন ? বোঝালেই বুঝব। ইঃ বিপ্লবী হয়েছে। আমিও এক সময় বিপ্লব করেছি জানিস ?

বুবাই—দলে ভিড়তে পারবে ?

বুড়ি—বড্ড যে বয়স বেড়ে গেছে। নইলে হয়তো পারতাম—জানিস আমরাও পুলিশকে ভয় করিনি ; আমরাও সে তখন বন্দুকের সামনে—

বুবাই—আহা। বন্দুকের সামনে গেলে। তারপর ভেড়ার মত সব সুড়সুড় করে ঢুকে গেলে জেলে। ধুর। ঐ কি বিপ্লব ? আমরা বন্দুকের সামনে দাঁড়াই বন্দুক ছিনিয়ে নেবার জন্যে।

বুড়ো—বুবাই তাহলে কি সত্যিই তুই ঐ সব—মানে এক্সট্রিমিস্ট না কি—ঐ সব দলে যোগ দিয়েছিস ?

বুবাই—যা বোঝ বোঝ। আমি হ্যাঁও বলব না, নাও বলব না।

বুড়ো—তোর সঙ্গে এই নিয়ে একটু কথা বলব ভেবেছিলাম আজকেই। কিন্তু ওরা আমার মনটাকে এমন অশান্ত করে দিয়ে গেল—

বুবাই—হ্যাঁ হবারই কথা। যা সব স্যাম্পেল। কি হিপক্রিট, কি হিপক্রিট!

বুড়ি—তুই কি শুনেছিস নাকি ?

বুবাই—শুনেছি বৈকি ! [হাতের কাগজ দেখিয়ে] কাজ করছিলাম, বললাম ঘুমাইনি।

বুড়ি—আর রত্না ভাবছিল তুই ঘুমুচ্ছিস।

বুবাই—আমরা যত ঘুমবো ততই তো ওদের সুবিধে।

বুড়ো—কাদের ?

বুবাই—যারা লুটেপুটে খেতে চায়, দেশটাকে অধঃপাতে নিয়ে যেতে চায় তাদের সকলের।

বুড়ি—নাঃ, কাল যখন থেকে, ঐ পার্থ আর পুতুল যখন এল, তখন থেকে কথাগুলো কেমন যেন বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে। থাক, তর্কাতর্কি থাক। তুই বেরেকফাস্ট খেয়েছিস ?

বুবাই—হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু তোমরা খাওনি কেন ? ঐ সব লোকগুলোর ওপর অভিমান করে ?

বুড়ো, বুড়ি—না, আজ আমাদের উপাস।

বুবাই—[হেসে]—কাল কি করবে ? পরশু ? বেস্পতিবার অবধি না খেয়ে থাকবে ? তারপর ? তারপরও তো ওদের কাছেই খেতে হবে। তবে আজকেরটাই বা খাবে না কেন ?

বুড়ো—[একটু পরে] ওঃ। এই ভাত, ভাত, ভাত। আর খিদে, খিদে, খিদে।

বুবাই—খিদে। তাইতো আমরা ঠিক করেছি, ঐ খিদে খিদে করে মানুষকে যাতে অমানুষ হয়ে না থাকতে হয়।

বুড়ো—ওরে একথা তো সেই কবে থেকে শুনে আসছি, কই আজও তো কিছু হল না।

বুবাই—হবে কোত্থেকে, দোষ তো তোমাদের।

বুড়ো, বুড়ি—আমাদের ?

বুবাই—নয়তো কি ? একটা দেউলে করা দেশ হাতে তুলে দিয়ে ইংরেজ পিট্-টান দিল। তারা যা যা করেছিলো যে ভাবে যা ছিল, সব কটি বজায় রেখে চলতে লাগল দেশ, আর তোমরা নেশায় বুঁদ হয়ে ভাবলে, আহা ! আমরা স্বাধীন হয়েছি। জুতোর তলায় থাকা তো অভ্যেস হয়ে গিয়ে-ছিল, এক জুতোর বদলে আর এক জুতো এল। তোমরা আবার তাই চাটতে লাগলে।

বুড়ি—[প্রায় চিৎকারে]—না একথা ঠিক না।

বুবাই—কিসের ঠিক না ? তা না হলে বেয়াল্লিশের ভারত ছাড়, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গের পরই কি করে সারা দেশটা কালোবাজারে আর কালোটাকায় ছেয়ে গেল, বলতে পার ?

বুড়ো—বুবাই, এত কথা জানলি কি করে ?

বুবাই—বলতে পার ইংরেজ চলে যাবার পরও কি করে, কি করে সেই কালোটাকা বেড়ে বেড়ে সমস্ত দেশটাকে পঙ্গু করে দিল ? অন্ধ করে দিল ?

বুড়ো—সে দোষ আমাদের না। আমরা বিশ্বাস করে যাদের ওপর ভার দিয়ে-ছিলাম,—অবশ্য না। আমিই বা আমরা ভার দেবার কে ?

বুড়ি—আমরা কেবল আশা করেছিলাম। বছরের পর বছর আশা করেছিলাম। এত তাড়াতাড়ি কি কিছু হয়। হবে, আস্তে আস্তে হবে। সব কিছু পরিপূর্ণ হতে সময় লাগবে। দশ মাস দশ দিন না হলে তো শিশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ হয় না।

বুবাই—কিন্তু এ কোন শিশু জন্মেছে? অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে তো হাঁ-টাই শুধু দেখা যায়। গিলে গিলে শেষ করে জাতটাকে ভিকিরি করে দিল!

বুড়ো—তোদের একথা সবাই মানে না। কথাটা বোধ করি ঠিকও নয়। কিছুই কি ভাল হয়নি?

বুবাই—ভাল হয়েছে বৈকি! না হলে তোমাদের এই চার ছেলেমেয়ে এত সুখে আছে কি করে? চেহারায় সব কেমন দুধ ঘি-এর আতিশয্য ফুটে বেরুচ্ছে। এরকম কত আরও আছে। তাতে দেশের পঁচানব্বই ভাগ লোকের কি এসে গেল। তাদের তো সেই উপোস চলছে তো চলছেই, দাদু এ অঞ্চলের লোক তো তুমি। অনেকদিন থেকেই তো এদের দেখছ। এই নেংটি পরা লোক আর ছ্যাওটা পরা মেয়েদের কি উন্নতি দেখেছ? রোজ তো সন্ধ্যে-বেলা বাজারের দিকে এদের দেখ, তাও তো আর গ্রামের ভেতর তুমি এদের দেখনি, এই সদানন্দর দশ বছর আগেও যে জমিটুকু ছিল ওর, কোথায় গেল, যে ওকে ডমেস্টিক সারভেন্ট হয়ে যেতে হল?

বুড়ো—সত্যি, এদের যে উন্নতি হয়েছে, তা আমি বলতে পারি না। কিন্তু পৃথিবীতে ভারতবর্ষ একটা নাম। যে নাম মুছে গিয়েছিল। সেই যে গানটা বল না গো।

[বুড়ি বলে যায়] [বুড়ো দাঁড়ায়]

বুড়ি—বল বল সবে শত বীণা বেণু রবে,
ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

বুড়ো—এই সেটা কিছু না?

বুবাই—শ্রেষ্ঠ আসন নিয়ে ফেলেছে? কবে? কখন? কোথায়?

বুড়ো—শ্রেষ্ঠ এখনও হয়নি, তবে—

বুবাই—হ্যাঁ, দেনার দায়ে চুল বিক্রী হয়ে গেল। শ্রেষ্ঠ! ফেল করা, ফেল করা ছাত্র।

বুড়ি—তোদের পথে তোরা পাশ করতে পারবি?

বুবাই—অপেক্ষা করে খালি দেখে যাও। এই তো সবে শুরু হয়েছে। এখনই কি বলব? একটু আগে বললে না একটা শিশু জন্ম নিতেও দশ মাস দশ দিন লাগে। ধৈর্য ধর।

বুড়ো—কিন্তু যেটুকু এদিক ওদিক শুনি, কাগজে দেখি, তাতে আমার কোন ভরসা হয় না, শ্রেণীশত্রু মানে কি? ঐ বলে কাউকে খুন করলেই কি বিপ্লব হয়? ধৈর্য তো তোদেরও নেই।

বুবাই—ঐ সব বুর্জোয়া কাগজের কথা তোমরা বিশ্বাস কর? অবশ্য তোমরাও তো তাই।
বুড়ি—তা হলে আমরাও তোদের শত্রু বল?
বুবাই—তোমাদের জায়গাটা যে কোথায়—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—
বুড়ি—তোর মা-বাবা আত্মীয়-স্বজন সবাই তোদের শত্রু?
বুবাই—নিশ্চয়ই। কোন সন্দেহ নেই।
বুড়ি—মানে তুই কোনদিন ওদের মেরে ফেলতে পারিস?
বুবাই—দরকার হলে পারি।
বুড়ো+বুড়ি—বুবাই!
বুড়ো—নাঃ বুবাই, তোদের দ্বারা হবে না। শুকনো ডালে কি ফুল ফোটে? ফোটে না। মন যদি এত শুকনো করে ফেলিস তাহলে স্বপ্ন দেখবি কি করে? আর স্বপ্ন দেখা ভুলে গেলে কি দিয়ে দেশ গড়বি?
বুবাই—কি আশ্চর্য তোমরা। আমার বাবা যখন ঘুষ নিয়ে কারো সর্বনাশ করছে, তোমার বড় ছেলের কালোটাকা জমাবার জন্যে অন্তত কিছু লোক খেতে পাচ্ছে না, তোমার ছোট ছেলে, ছোট জামাই তোমার—এরকম কত অমানুষ কেবল ঐ পেট মোটাদের পেট আরও মোটা করছে। —তাইতে—কত পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে সে খবর রাখ? তারা খুন করছে না?
বুড়ি—তাই বলে বাবা-মা, ভাই বোনের রক্তপাত করতে পারিস?
বুবাই—নাঃ পারি না। আমি দুর্বল কিন্তু পারলে দোষ হত না! রক্ত? রক্ত? আর যাদের রক্ত না খেতে পেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে? তোমাদের মত লোকেদের পাপের জন্য এই সব হচ্ছে।

[একটু চুপ]

বুড়ি—আমি যে ভেবেছিলাম তুই অন্ততঃ আমাদের একটু ভালোবাসিস। বাসিস না বল? এট্টুও বাসিস না?
বুড়ো—জোর করে ওকে দিয়ে নিজের মনের মত কথা বলিয়ে নিতে চাও কেন? কেউ আমাদের ভালবাসে না এই সার কথাটা আজ থেকে জেনে রাখ।
বুড়ি—কিন্তু আমি যে ভালবাসি। সবাইরে ভালবাসি, বুবাই—দাদু ও পথে যাসনে। প্রাণ নিতে গিয়ে যদি প্রাণ দিয়ে বসতে হয়, ও মাগো, আমি সহ্য করতে পারব না [কান্না আসে, মুখ নীচু করে। বুবাই পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে বুড়িকে জড়িয়ে ধরে, গালে গাল রাখে]
বুবাই—যাতে একদিন সবাই সবাইকে ভালবাসতে পারে তারই জন্যে তো আমাদের এই চেষ্টা। তোমাদের মত মানুষদের যাতে এমনি করে যার ইচ্ছে সে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে না পারে—তারই জন্যে তো এই চেষ্টা। তার জন্যে যদি প্রাণটা দিতেই হয়—।

বুড়ি—না ও কথা বলিসনে। রক্তপাতে রক্ত দেখার নেশা চেপে যায়। একটা রক্তপাত আর একটা রক্তপাত ঘটায়—ওতে কখনো ভাল হয় না, কারুর ভাল হয় না।

[বুবাই বুড়োকে ছেড়ে উঠে পড়ে, হাসে]

বুবাই—সত্যি ঐ গান্ধী-লোকটা তোমাদের মাথা খারাপ করে দিয়ে গেছে। তোমাদের সঙ্গে আমার কোনদিন মিলবে না। তোমাদের বোঝাতে চেষ্টা করা আর মরুভূমিতে চাষ করার চেষ্টাও—একই ব্যাপার।

বুড়ো—তাই-ই বোধ হয় রে! জেনারেশন গ্যাপ,—তোদের চক্ষু লাল হয়ে গেছে। আমাদের কথাও তোকে বোঝাতে পারব না,—তবে একথা আমৃত্যু মানতে পারব না যে,—এখানে ওখানে একটা একটা লোক ধরে তাদের শত্রু নাম দিয়ে খুন করে দেশকে তোরা ক্ষুধা থেকে মুক্তি দিতে পারবি।

বুবাই—আমিও দাদু আমৃত্যু মানতে পারব না যে, মানুষ না খেয়ে মরে যাবে তবু পরগাছা পেটমোটা লোকদের কাছ থেকে কেড়ে খাবে না। একগালে চড় খেলে আর এক গাল এগিয়ে দেবে। তাতেই দেশের ভাল হবে। ক্ষুধার্ত মানুষ স্বর্গ লাভ করবে! তোমাদের ঐ পরমার্থ লাভের কথায় আর যাই হোক ক্ষিধের অন্ন কারুর জুটবে না। আমরা পরমার্থ চাই না —চাই নগদ বিদায়।

[ঘড়ি দেখে]

বুড়ো—আইডিয়ার পর আইডিয়া এসে সব গোলমাল করে দিল।

বুবাই—না, এই আইডিয়া পেয়েছি বলে—মুক্তির পথ পেয়েছি। যাক্ গে শোন সখা-সখী, আমাকে এক্ষুণি বের হতে হবে।

বুড়ি—কোথায়?

[সদানন্দের প্রবেশ]

সদা—কই বুবাইদাদা, বেরেকফাস্ট খেলে না?

বুড়ো+বুড়ি—সেকি এই যে বললি খাওয়া হয়ে গেছে—

বুবাই—মিথ্যে কথা বলেছিলাম। এ বাড়ীতে খাওয়ার প্রবৃত্তি আমার নেই।

বুড়ি—তবে আমাদের কেন বললি—আজ না হয় কাল—

বুবাই—তোমাদের যে এদের কাছে হাত পাততেই হবে—

সদা—ডিম, দুধ, এসব ত কবেই খাওয়াটো বন্ধ করি দিলে। খালি টোস্‌টো চা, তাও খাবেক নাই? বাঁচি থাকিবা কিসে?

বুবাই—বেশ নিয়ে আয়—দাদু-দিদুরটাও নিয়ে আসিস—

সদা—উয়াদের তো উপাস নাকি!

বুবাই—যা, তাহলে আমারও উপোস।

বুড়ি—ওঃ না না আজ কি তিথি গো?

বুড়ো—আজ কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া।

বুড়ি—আমাদের উপোস তো সেই একাদশীতে [আঙ্গুলে গোনে] সামনের রবিবারে। বুড়ো হয়েছি তো সব ভুল হয়ে যায়। এই রবিবার ভেবে বসে আছি।

সদা—যতই বুড়ো হও সধবা একাদশী কইরছে—বাপের জন্মে শুনি নাই—

বুড়ো—ওরে এর একটা আলাদা মানে আছে। এখন থেকে যতগুলো একাদশী পারি করব। আর স্বামীর সঙ্গে একাদশী করলে সধবার দোষ হয় না।

সদা—কর কেনে। একাদশী, পূর্ণিমা, ষষ্ঠী। আমার ঝামেলাটা তো কমে গো। [বুড়িকে] তুমি সেদিন বইল্লে খোঁকা খাবে। কাইল রাইতে ডালটো ভিজাই দিলাম—

বুড়ি—আজ তো একাদশী না, আজ তো খাব।

সদা—তবে যাই চা খাবার নিয়ে আসি কেনে।

বুবাই—[চেঁচিয়ে] তাড়াতাড়ি আনবি। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। —বাবা মা আসার আগেই বেরিয়ে পড়তে চাই।

বুড়ি—ওঃ ভাল কথা, রত্না যাবার সময় বলে গেছে বুবাই যেন কোথাও না বের হয়। রবিবার সবাই মিলে একসঙ্গে খাবে।

বুবাই—সখি! তুমি সত্যি বৃদ্ধা হয়েছো, একটু আগে বললাম না আমি আর এ বাড়ীতে খাব না।

বুড়ি—তুই খাবি না কেন? আমরা না হয় এ বাড়ীর জঞ্জাল, কিন্তু তুই তো—

বুবাই—না, আমি তো এ বাড়ীর সাত রাজার-ধন মাণিক। একমাত্র বংশধর।

[সদানন্দ ট্রেতে করে খাবার ইত্যাদি নিয়ে আসে]

সদা—তোমরা খাও। মুই চা করি আনি।

[চলে যায়]

বুবাই—দেখি সখাসখী, আমার সামনে বেশ ভাল করে খাও তো! কি দিয়েছে তোমাদের—হালুয়া? বাঃ ফার্স্টক্লাস, দাও দেখি আমাকে একটু।

[বৃদ্ধ-বৃদ্ধা শশব্যস্ত খুশীতে সব তুলে তুলে দিতে থাকে]

বুবাই—আরে? না না, অত না। তোমাদের রাখলে কই।

বুড়ো—দেখি তোর থেকে একটা টোস্ট আমাকে দে। দেখি, বাঁধান দাঁতে কব্জা করতে পারি নাকি।

বুড়ি—তা হলে আমাকেও দে। আমার তো মোটে দুটো দাঁত বাঁধান—

[খাবার অদল বদল করে খাওয়া চলে, কথা চলে]

বুড়ি—কাল সারারাত তো ঘুমুসনি। কি করছিলি?

বুবাই—ও সব বলতে নেই, দিব্যি দেওয়া আছে।

বুড়ি—ডিম দুধ এ সব খাওয়া ছেড়ে দিইছিস কেন?

বুবাই—ভাল লাগে না। জান, আমার সঙ্গে যারা কাজ করে তাদের ভাগ্যে এক

একদিন ঐ জল ছাড়া কিছু জোটে না। সদানন্দ দেরী করে চা আনলে আমার আর খাওয়া হবে না—

বুড়ি—কোথায় যাচ্ছিস, দুপুরে ফিরবি তো? বললাম না, রত্না বলে গেছে রবিবার দুপুরে সবাই একসঙ্গে খাবে।

বুবাই—[একটু চুপ করে থাকে] ছেলেবেলায় কত রবিবার বসে থেকেছি—মা—বাবার সঙ্গে একসঙ্গে খাব বলে, বাবা তখন শিলিগুড়িতে পোস্টেড। অবশ্য নীচের গ্রেডে। বাবা-মা গাড়ী নিয়ে চলে গেছে দার্জিলিং-এ—বাবার বস্—তার স্ত্রী, জিমখানা ক্লাবে বা আর কোথাও, বুড়ি নেপালী আয়া, লক্ষ্মীমায়া, সে বলত, নানি আছে। উনি হরু ফর কেন্দই না। আমার কসম, আজ তুমি খেয়ে নাও, সামনের রবিবারে যাতে তোমার মা থাকে আমি বলে দেব। আকাশ পরিষ্কার থাকলে পুরো কাঞ্চনজঙ্ঘার রেঞ্জটা সোনা হয়ে জ্বলত, তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হত, মা কি ঐ সোনার খুব কাছে চলে গেছে! আমাকে নিয়ে গেল না কেন? আরও কত কি যে মনে হত বোকার মত! বড্ড লেট হয়ে গেছে।

বুড়ি—এটা কি হতে পারে বুবাই যে, কোন রবিবারে তারা থাকেনি, তোকে দেখেনি।

বুবাই—হ্যাঁ, তাও থেকেছে। যখন ওদের ইচ্ছে হয়েছে, দরকার হয়েছে। আমার ইচ্ছের জন্যে নয়।

[সদানন্দ চা নিয়ে আসে, একটু আগে থেকেই মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছিল। সদানন্দ চা দিতে দিতে—]

সদা—ম্যাঘ কইরাছে খুব। জল আসিল বলিয়া। বুবাইদাদা, মা বইলেছে মাটন ভিন্দালু করিবার জন্য, তা মুই ভাবি অর সাথে একটুকুন ফিরাইড রাইস যদি—

বুবাই—বেশ তো কর না, দেখিস তোকে ফেল করিয়ে দেব। সব একলা খেয়ে নেব।

সদা—সি তুমি পার বটে। একবার কি হসিল দিদিমা সুনো বটে--

বুবাই—যা যা, গল্প শুরু করলে তোর আর—কাজ সেরে নে, নইলে মা এসে, [সদানন্দ চলে যায়] দেখ সখাসখি, এই বোধহয় তোমাদের সঙ্গে আমার শেষ দেখা—

বুড়ো—মানে—

বুড়ি—না!!! [স্তব্ধতা]

বুড়ো—এ হতে পারে না।

বুড়ি—এ হতে দিসনে।

বুবাই—না না, জোর করে অবশ্য কেউই কিছু বলতে পারে না। এখন আর হতে দেওয়া না দেওয়া আমার হাতেও নেই। তবে, এতদিন যেমন

আমাদের কোন কথা কাউকে বলনি, তেমনি আজকের কথাও কাউকে বলবে না। কই, ডানহাতগুলো মাথায় দাও। বলো যে, হর্ষবর্ধন সম্পর্কে একটি কথাও আমরা কাহাকেও বলিব না।

বুড়ো—এই মাথায় হাত দিয়ে প্রতিজ্ঞা করা তুই বিশ্বাস করিস?

বুবাই—আমি করি না। কিন্তু তোমরা কর, আমার ভরসা সেইটেই।

বুড়ি—কোথায় যাচ্ছিস? কত দূরে?

বুবাই—এখান থেকে বেরিয়ে কোথায় যাব সেটা জানি, কিন্তু তোমাদের বলব না। তার পরের কথা—আমি নিজেও জানি না।

বুড়ি—এই যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই?

বুড়ো—কি বোকার মত কথা বলছ? ওকি অন্য কোন উপায় চাইছে, না ওর দরকার আছে?

বুবাই—কই, মাথায় হাত দাও।

বুড়ো—প্রতিজ্ঞা করার জন্য মাথায় হাত দেবার দরকার নেই। প্রতিজ্ঞা আমি করলাম—

বুড়ি—আমিও করলাম। এ কথা কাকপক্ষীও টের পাবে না। তবে এই তোর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছি, তেমন বিপদে যেন তুই কোনদিন না পড়িস।

[পরের কথাগুলো আর শোনা যায় না আলো কমতে থাকে—বৃদ্ধের হাতও বুবাই এর মাথায় উঠে আসে। বুবাই দুজনের দুই হাত নিয়ে গালে রাখে—তারপর ছুটে বেরিয়ে যায়। বাইরে মেঘ গর্জন করে ওঠে। বৃষ্টির শব্দ। দৃশ্য বদলায়। বৃষ্টি চলছেই। দুদিন পার হয়ে গেছে। সময় বিকেল। রত্না একটা চেয়ারে বসে, উস্কোখুস্ক চুল, অনিদ্রার ছাপ, গায়ে একটা ড্রেসিং গাউন। বসার ভঙ্গী যেন রানীর মত। সদানন্দ ও বৃদ্ধা দাঁড়িয়ে। ভীত]

রত্না—আমি তোমাদের কথার মুথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছি না। সদানন্দ বলছে যে বুবাই বলেছিল ও দুপুরে ফ্রায়েড রাইস ও মাংস খাবে। আর তুমি আর বাবা বলছ,—ওর বন্ধু জিতেন আর রামের সঙ্গে শিলিগুড়িতে পিকনিক করতে গেছে। ভাবলাম তোমাদের কথাই ঠিক, সদানন্দ হয়তো কি শুনতে কি শুনেছে। তোমাদের কথা বিশ্বাস করলাম। রবিবার রাত্রে ফিরল না ভাবলাম সোমবার ফিরবে। কিন্তু আজ বুধবার হল। তার ওপর দুদিন ধরে সমানে বৃষ্টি চলছে। জানি না। ছেলেটা আদাড়ে-বাদাড়ে কোথায় আছে। [উঠে পড়ে] সদানন্দ, মিথ্যে কথা বলো না। ঠিক করে বল কি বলেছিল যাবার সময়। বল।

সদা—যাবার সময় আমাকে মোটে বলেইনি। দাদু আর দিদুর সঙ্গে কি সব রাগারাগি করছে শুনছিলাম।

রত্না—তার মানে? তোমাদের সঙ্গে কি নিয়ে রাগারাগি হল? আঃ চুপ করে

থেকো না। কি বলেছিলে ওকে তোমরা?

বুড়ি—আমরা ওকে কোন খারাপ কথা বলিনি—

রত্না—তবে ও রাগ করছিল কেন? বাঃ চমৎকার! আমার বাড়ীতে থাকবে আর আমার ছেলের সঙ্গে রাগারাগি করবে; বেশ তো! কি বলেছিলে ওকে?

বুড়ি—আমাদের সঙ্গে ওর রাগারাগি হয়নি।

সদা—অখন মোক ফাঁসায়ো না দিদু। ভগবান সাক্ষী মুই বলছি, তুমি দাদু চ্যাঁচায় চ্যাঁচায় বুবাইদার সাথে কথা বইলেছ। বল নাই?

রত্না—কি কথা বলছিল, কতটুকু শুনেছিস, কি শুনেছিস?

সদা—মুই তখন মসল্লা পিষছিলাম। তাই বুইঝতে পারি নাই সব। তবে সাঁটাসাঁটি খুব হচ্ছিল। হাঁ-হাঁ, বুবাইদা একবার বললে দাদুকে—হাটে যেয়ে নেংটি পরা লোক, আর ছ্যাওটা পরা মেয়েছেলের পাশে কি দেখ?

রত্না—সে কি। এসব আবার কি কথা?

বুড়ি—সদানন্দ! কি যা-তা বলছিস।

রত্না—তা হলে তুমি বল না কি বলেছিলে?

বুড়ি—সে-অন্য কথা।

রত্না—তা হলে বোঝা যাচ্ছে কথা একটা কিছু হয়েছিল। বলতে পারছ না, কারণ বলবার তোমাদের কিছু নেই। সদানন্দ, ঠিক করে বল আর কি শুনেছিস। ঠিক করে না বললে তোকে আমি পুলিশে দেব। নিজের বাবা-মাকে তো আর পুলিশে দিতে পারি না। সদানন্দ!

সদা—বইলছি, বইলছি। একবার দিদু বইল্লে অক্ত দ্যাখাইতে পারিস, বাপ মার অক্ত?

রত্না—সে কি—তোমরা কি ওকে নিয়ে তন্ত্রমন্ত্র করছ নাকি।

বুড়ি—রত্না, কি সব বলছিস—আমরা ওসব করব কেন? ছিঃ।

রত্না—নিশ্চয়ই তোমরা কিছু না কিছু বলেছ। না হলে সে এরকমভাবে গায়ের হয়ে যাবে কেন? আমি পুলিশ ডাকছি—মার খেলে দেখি কেমন কথা পেটে থাকে।

বুড়ি—রত্না, রাগে তোর মাথার ঠিক নেই।

রত্না—দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষেছি। নির্লজ্জ, অকৃতজ্ঞ! কলকাতায় ঝিমলির সঙ্গেও তুমি এমন কর যে সে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সে ফিগার দেখাবার জন্যে আঁট-জমা পরে, কি, না পরে তাতে তোমার কি? সে লিপস্টিক লাগায় তাতে তোমার কি? আমার ছেলে কখন বেরুচ্ছে কখন ফিরছে তা নিয়ে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন? খিট্‌খিট্‌ করে ছেলেটাকে বাড়ী-ছাড়া করলে।

[জীপের শব্দ। সবাই বাইরের দরজার দিকে যায়
স্বদেশ আর বৃদ্ধ প্রবেশ করে]

সদা—[সদানন্দ স্বদেশের কাছে গিয়ে হাঁউমাউ করে কেঁদে] হেই বাবু! মোক জেহ'লত দিও না। সাচা কথা মুই কিছু জানি না, হেই দিদিমা বল কেনে মুই কি জানি?

স্বদেশ—কি ব্যাপার, কি হয়েছে?

রত্না—সদানন্দ বলছে বুবাই মা-বাবার সঙ্গে রাগারাগি করে চলে গেছে।

স্বদেশ—যাঃ তাই হয় নাকি?

রত্না—কি হয় না হয় জানি না। তুমি পুলিশে খবর দাও।

স্বদেশ—একটু ঠান্ডা মাথায় সব দিকটা ভাবার চেষ্টা কর। পুলিশে খবর দিলেই তো হল না।

রত্না—দেখ, আমার ছেলের ব্যাপারে আমি কোনরকম কম্প্রমাইজের মধ্যে যেতে রাজী নই। এ ব্যাপারে আমি আমার মা-বাবা কাউকে কেয়ার করি না। সদানন্দ, বল না রক্ত নিয়ে কি কথা হয়েছে—

বুড়ো—রক্ত!

রত্না—তোমরা বলনি বুবাইকে বাবা-মার রক্ত দেখাতে পারিস? বলনি?

বুড়ো—আমরা কেন এসব কথা বলতে যাব বুবাইকে।

রত্না—তা আমি কি করে জানব? বুড়ো বয়সে হয়তো তন্ত্র-মন্ত্র ধরেছ। তোমরা যত তাড়াতাড়ি কলকাতা যাও ততই মঙ্গল।

স্বদেশ—তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল—কি সমস্ত বলছ!

রত্না—আমার মাত্র একটা ছেলে, আজ তিনদিন হয়ে গেল! তুমি কি করে চুপ করে আছ তাই ভাবছি।

স্বদেশ—কে বললে চুপ করে আছি। এতক্ষণ ধরে তা হলে আমি আর উনি [বৃদ্ধকে দেখায়] কেন ঘুরে মরছিলাম।

রত্না—তা কি হল বলবে তো?

স্বদেশ—সদানন্দ যা এখান থেকে।

[সদানন্দ চলে যায়]

আমরা অঘোর জেলের বাড়ী গিয়েছিলাম। শুনলাম জিতেন আর রাম বলে দুটো ছেলের সঙ্গে ও শিলিগুড়ি গেছে। জিতেন বাড়ীতে বলে গেছে সেখান থেকে ওরা দার্জিলিং বেড়িয়ে-টেড়িয়ে ফিরবে। কয়েকদিন দেরী হবে।

রত্না—জিতেন বাড়ীতে বলে যেতে পারল আর বুবাই বলে যেতে পারল না?

স্বদেশ—সে আমি কি করে বলব—

রত্না—বাবা মা, তোমাদের বুবাই কিছু বলে যায়নি? [বৃদ্ধের কাছে যায়, আবেগে গলা বন্ধ হয়ে আসে] বাবা, সত্যি করে বল, আমার ঐ একটা ছেলে

বাবা। [বৃদ্ধার কাছে] মা তুমি বল, মাগো, তোমার ছেলের খবর তুমি যদি না পেতে কেমন লাগতো তোমার? [কেঁদে ফেলে]

[বৃদ্ধা অসহায়ভাবে বৃদ্ধের দিকে তাকায়; স্বদেশ রত্নার কাছে যায়। বৃদ্ধা রত্নার হাত ধরে তুলতে চেষ্টা করে]

বুড়ো—রত্না, আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করিসনে, আমরা সত্যি জানি না।

রত্না—[হঠাৎ ক্ষিপ্তের মত উঠে দাঁড়ায়] তোমার মুখ দেখে বুঝতে পারছি, তুমি মিথ্যে কথা বলছ। [বৃদ্ধকে ধরে ঝাঁকাতে থাকে] বল বাবা—

বুড়ি—রত্না ছেড়ে দে, ছেড়ে দে ওকে।

স্বদেশ—রত্না, ওরকম করছ কেন? একটা খবর তো পাওয়া গেছে।

রত্না—ও খবর সত্যি না মিথ্যে কে জানে? পুলিশে খবর দিতেই হবে। তুমি যদি না দাও আমি নিজেই দেব। আজকের মধ্যে আমার ছেলের খবর আমি চাই-ই চাই।

বুড়ি—পুলিশের ওপর তোর এত বিশ্বাস? পুলিশ খবর এনে দেবে আজকের মধ্যে?

বুড়ো—রত্না—স্বদেশ, পুলিশে খবর দিও না।

স্বদেশ—সত্যি করে বলুন তো কি হয়েছে?

বুড়ো—আর আমাদের একটা কথাও জিজ্ঞাসা কোর না বাবা। সত্যি আমাদের কিছু বলার নেই। [বৃষ্টি পড়ছে। বাইরে সাইকেলের আওয়াজ।]

স্বদেশ—কে?

[বেরিয়ে যায়। বাইরে দু-চারটে কথা শোনা যায়। স্বদেশ একটা চিঠি পড়তে পড়তে ঢোকে। বুবাই এর চিঠি।]

রত্না—বল কি লিখেছে।

স্বদেশ—[পড়ে] 'বাবা, আমার জন্য তোমরা চিন্তা কোর না, খোঁজাখুঁজিও কোর না। আমি এখন বাড়ী ফিরছি না, আপাতত কলকাতা চললাম, বুবাই।'

রত্না—ব্যাস, আর একটা কথাও নেই—আমাকে একটা কথাও লেখেনি?

[স্বদেশ চিঠিটা রত্নাকে দেয়]

স্বদেশ—তোমার কি মনে হয় আমাকেও কিছু লিখেছে? এরকম নিষ্ঠুর নিষ্করুণ চিঠি আর কখনও জীবনে পেয়েছি বলে মনে হয় না। হ্যাঁ, যে ছেলেটা চিঠি দিতে এসেছিল—বলল, কালই চিঠিটা দিত, বৃষ্টির জন্য দিতে পারেনি; আর বুবাই নাকি বলে পাঠিয়েছে পুলিশ-টুলিশ যেন না করি, আমি সরকারী চাকরী করি, আমার পক্ষেও সেটা ভাল হবে না।

[সবাই চুপ করে থাকে, রত্না কাঁদে]

স্বদেশ—এবারে তো মনে হয় আপনাদের দায়িত্ব অনেক কমে গেল। যেটুকু আপনারা জানেন এবারে কি বলতে পারেন আপনারা? যতটুকু

জানেন ?

বুড়ো—হ্যাঁ, এবারে বোধহয় বলা যায়।

বুড়ি—কিন্তু আমরা যে—

বুড়ো—আমরা ওর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমরা কিছু বলব না। তবে আমাদের চেয়েও তোমরা ওর বেশী মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তোমরা ওর মা-বাবা তাই—

বুড়ি—ভগবান! কোন দোষ যেন না লাগে বুবাইকে—

রত্না—বল, বাবা বল।

স্বদেশ—বলুন।

বুড়ো—তোমরা কথা দাও। দ্বিতীয় প্রাণী জানবে না।

রত্না+স্বদেশ—কথা দিলাম।

[বৃদ্ধ বলতে শুরু করে। আলো কমে যায়। বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে সঙ্গীত। কয়েক মুহূর্ত। আলো জ্বলে ওঠে]

বুড়ি—না না, কিছুতেই পুলিশে খবর দিও না।

রত্না—কিন্তু ওকে খুঁজে পাব কি করে ?

বুড়ি—সময় হলে ও আপনি আসবে।

রত্না—[স্বদেশকে] তুমি কিছু বল!

বুড়ি—যদি ওর ভাল চাও, নিজেদের ভাল চাও তাহলে বুবাই যেমন বলে পাঠিয়েছে তেমনই সকলকে বল· বুবাই কলকাতা গেছে—

স্বদেশ—কিন্তু তারপর ?

বুড়ো—সত্যি এ যে অথৈ জল।

রত্না—[হঠাৎ বৃদ্ধার দিকে ফিরে]—তুমি, তুমি যত নষ্টের গোড়া।

বুড়ি—আমি, আমি কি করলাম।

রত্না—কবে উনি বিপ্লব করেছিলেন, ইংরেজের পুলিশ ওনাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, ওনার পিঠে লাঠি পড়েছিল, কেবল সেইসব গল্প কানের কাছে করা চাই।

বুড়ি—বাঃ রে, সে তো আমি—

রত্না—থাম, তাও যদি তেমন জেল খাটতে হত। বিপ্লব পেটে ছিল বলে তো পনের দিনের মাথায় দিব্যি বাড়ী চলে এল। উনি আবার বিপ্লব করেছেন!

বুড়ি—রত্না! আমার একটা পবিত্র জিনিস নিয়ে আমাকে এমন করে ঠাট্টা কোর না!

রত্না—ঠাট্টা আবার কি! যা সত্যি তাই বলছি। এক-একটা ছেলেমানুষী ব্যাপারকে এমন এক-একটা রূপ দেওয়া হয়। পনের দিন জেলের ভাত খেয়ে উনি দেশোদ্ধার করেছেন। আরে বাবা, দেশ তো উদ্ধার হয়েই গেছে। তবে আবার আমার ছেলের কানে ওসব মন্তর দেওয়া কেন ?

বুড়ি—আমি তোর ছেলের কানে কোন মন্তর দিইনি। সে যদি এ পথে গিয়ে থাকে তবে তোদের দেখে ঘেন্নায় লজ্জায় এ পথে গেছে।

বুড়ো—কি হচ্ছে কি—ছিঃ ছিঃ ছিঃ—

রত্না—বাবা! কথা ঢাকতে যেও না। কিসে ওর ঘেন্না হল বল। বল।

বুড়ি—স্বাধীনতা যদি এসে থাকে, তাতে আমাদেরও কিছুটা দান আছে বুঝলি, আছে। পনের দিন হোক আর পনের বছর হোক। লক্ষ লক্ষ লোকের এইরকম দান না থাকলে দেশোদ্ধার 'হয়ে' যায় না,—কিন্তু ভুল করেছিলাম তাই তোদের মত স্বার্থপর জানোয়ারে দেশ ভরে গেল।

রত্না—কি! তবে তুমি ঐ পনের দিন জেল না খাটলেও দেশোদ্ধার হত! দা-ন দেখাচ্ছে, বড় বড় কথা।

বুড়ি—উঃ ভগবান। পুরো এই যুগকে ঘুষখোর আর চিটিংবাজ বানিয়ে দিল রে!

স্বদেশ—[চিৎকার করে] এনাফ অব দিস ননসেন্স। চুপ করুন।

রত্না—ঘুষখোর-চিটিংবাজদের পয়সায় খেতে পরতে তো লজ্জা করে না।

বুড়ো+বুড়ি—রত্না!

স্বদেশ—রত্না, আর একটিও কথা নয়, একটা জিনিস এর থেকে আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। আমাদের ওপর যদি কোন ঘৃণা হয়েই থাকে, তবে তাতে ইন্ধন যুগিয়েছেন আপনারা।

বুড়ো—স্বদেশ, তুমিও কি পাগল হয়ে গেলে।

স্বদেশ—না, আমি খুব স্থির মাথাতেই কথা বলছি। আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমাকে ঘুষখোর বললে আমার খুব ভাল লাগবার কথা নয়।

রত্না—থাক গে! রাগারাগি করলে তোমার আবার প্রেসার বেড়ে যাবে।

স্বদেশ—আরও বেশী সর্বনাশ ঘটার আগে পুলিশে একটা খবর দিয়ে রাখাই ভাল।

বুড়ো—নাঃ, এ কাজ কখনই করতে পারবে না।

বুড়ি—এতে ও আরও বেশী বিপদে জড়িয়ে পড়বে।

স্বদেশ—আপনাদের আর কোন কথা আমার শোনার দরকার আছে বলে আমি মনে করছি না।

বুড়ো—স্বদেশ, তুমি আমাদের কথা দিয়েছ আর কাউকে বলবে না।

স্বদেশ—সে তো আপনারাও বুবাইকে কথা দিয়েছিলেন কাউকে বলবেন না।

বুড়ি—সে তো তোমরা ওর বাবা-মা, তোমরা ওর সম্বন্ধে না জানার কষ্টে ভুগছিলে তাই,—সেই কষ্ট থেকে তোমাদের বাঁচাবার জন্যে—

বুড়ো—তোমরা কখনও খারাপ করতে পার না সেই ভেবে—

স্বদেশ—পুলিশে খবর দিলে ওর খারাপ হবে এ-কথা ভাবছেন কেন?

বুড়ি—তুমি পুলিশকে কতটুকু জান? তাছাড়া আরও কতগুলো ছেলের সর্ব-

নাশ হবে জান?

স্বদেশ—তার মানে আপনারা বলতে চান ওরা যা করছে তা ঠিক করছে। একটা একটা মানুষ ধরে খুন—যারা করছে তারা ধরা পড়লে দেশের সর্বনাশ হবে?

বুড়ো—তাদের সর্বনাশ হবে।

স্বদেশ—বোঝা গেল। জানেনই তো আমরা স্বার্থপর, তাই আমার ছেলে বাঁচলে আর আমার চাকরী বাঁচলেই যথেষ্ট, আর কিছু ভাববার আমার দরকার নেই। আমার ছেলে কতগুলো লোকের পাল্লায় পড়ে এরকম হয়ে যাবে—

বুড়ো—ওর বুদ্ধি অনেক বেশী, কারো পাল্লায় পড়বার ছেলে ও নয়।

স্বদেশ—অন্তত পুলিশকে আমার তাই বলতে হবে।

বুড়ি—স্বদেশ, আমি তোমার পায়ে ধরে বলছি—[স্বদেশের দিকে যায়, স্বদেশ সরে যায়] হায় ভগবান, আমি যে তাকে বলেছিলাম এ-কথা কাকপক্ষীতেও টের পাবে না—

স্বদেশ—আপনাদের নাম না করলেই তো হল। তাছাড়া যথেষ্ট হয়েছে, অনেক ক্ষতি আপনারা করেছেন—এবার আমার ছেলের কথা আমাকে ভাবতে দিন।

[চলে যায়]

রত্না—আরে! রেনকোটটা নিয়ে যাও। [রেনকোট নিয়ে বাইরে যায়, একটু পরে আসে।]

রত্না—যাও মা, তোমরা তোমাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলগে। কাল দাদা-বৌদি দুপুর নাগাদ আসবে। এখান থেকে স্টেশন যেতে অনেকটা পথ। সময় বেশী থাকবে না। সদানন্দ, সদানন্দ—

বুড়ি—[ভেতরে যায়, বেরিয়ে আসে] সদানন্দ বোধহয় বাজার চলে গেছে।

রত্না—যদিও তোমাদের সঙ্গে আর আমার কথা বলবার ইচ্ছে নেই, তবু একটা উপদেশ তোমাদের দিচ্ছি মা, ঝর্ণার ওখানে যতদিন থাকবে তোমার ঐ বিপ্লবের পতাকাটা আর উড়িও না। কবে ঘি খেয়েছিলে, আজ আর ও আঙুলে তুড়ি বাজে না। বাবা, না আমি জানি তুমি অন্যরকম। মা ব্যাপারটা না ঘটালে হয় তো এরকম হতই না। তবু দাদা-বৌদির কথা একটু শুনে চলবে, তাতে সব দিক দিয়েই মঙ্গল হবে। হ্যাঁ, আর সদানন্দকে বোল যা ছাইপাঁশ রাঁধবে ওপরে আমাদের বেডরুমে যেন দিয়ে আসে।

[ওপরের চলে যেতে উদ্যত]

বুড়ো—রত্না, তোমার মা আমাকে ইনফ্লুয়েন্স কিছু করেননি: আমার যথেষ্ট বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে। যা করার আমি নিজেই করেছি।

রত্না—তা হলে তো আরোই ভাল [চলে যায়। বাইরে বৃষ্টির শব্দ। স্তব্ধতা]
বুড়ো—এইবার?
বুড়ি—কোথাও আমাদের স্থান আর নাই।
বুড়ো—যদি নিজে একটা কিছু করতে পারতাম, অত আগেই সব ছেড়ে দিলাম কেন?
বুড়ি—তুমি নিজেকে নিজের বাবার জায়গায় আর ছেলেমেয়েদের নিজের জায়গায় বসিয়েছিলে।
বুড়ো—এই যুগটা যে কত তাড়াতাড়ি বদলাচ্ছে—বুবাই-এর জন্যে ভয় করছে, তবে ও যখন কলকাতা লিখেছে চিঠিতে—ও অন্যদিকে গেছে।
বুড়ি—স্বদেশ সত্যি পুলিশে বলতে গেল? সত্যি কি ওরা ছেলেটাকে ভালবাসে না,—
বুড়ো—নিশ্চয়ই বাসে। কিন্তু ছেলে ওদের মনোমত হলে আরো বেশী ভালবাসে।
বুড়ি—ছেলেকে ফিরিয়ে এনে ওদের মনোমত করবে?
বুড়ো—কি জানি কি হবে। আমরা ভাববার কে?
বুড়ি—বুবাই কখনোও আর ওদের মনোমত হবে না।
বুড়ো—হ্যাঁ, তবে পথটা ভুল নিল। আমার বিবেচনায় খুবই ভুল পথ নিল কিন্তু মনের মধ্যে ওর হৃদয়ের মধ্যে মনুষ্যত্ব পাখা মেলল।
বুড়ি—হ্যাঁ, অন্য মানুষদের জন্যে ওর মন পুড়ল। ভগবানের দেওয়া জীবনটাকে ও অচল রেজগীর মত নষ্ট করল না, বল?
বুড়ো—কি জানি, আর যদি নষ্ট করেও, তবু কোথাও যদি একটা চেতনা, যদি একটা ভাবনা দেয়। দেশটা যদি—
বুড়ি—ও যখন শুনবে আমরা সব বলে দিয়েছি—
বুড়ো—হ্যা বললাম, মাথায় হাত দেবার দরকার নেই—
বুড়ি—বললাম কাকপক্ষীও টের পাবে না, কে জানত ঘটনা এমন পথ নেবে। ও যখন্ শুনবে? মাগো লজ্জায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে [কেঁদে ফেলে]।
বুড়ো—ইচ্ছে করছে? করছে। ইচ্ছেটাকে ঘটনা ঘটাবার জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় না?
বুড়ি—এ্যাঁ? [চোখ তুলে তাকায়]
বুড়ো—বুঝলে না কথাটা?
বুড়ি—বুঝেছি।
বুড়ো—সত্যি মনে করে দেখ দেখি, বেশ কিছু বছর থেকে আমাদের আর বেঁচে থাকার কোন মানে আছে কি?
বুড়ি—অনেকদিন থেকেই আর তো আমাদের কেউ ভালবাসে না।

বুড়ো—আমরা বোধ করি কাউকে ভালবাসতাম না—

বুড়ি—বোধ করি! যবে থেকে ওদের খাওয়া-দাওয়া, চালচলন, সব কিছুতে পরিবর্তন হতে লাগল, তবে থেকে সত্যি বুঝি ভেতরের তারটায় আলগা পড়েছিল।

বুড়ো—মত পথ আলাদা হলে কি ভালবাসাও আলগা হয়?

বুড়ি—হওয়ার কথা না তবু বোধ করি হয়, জানোয়ার তো না, মানুষ তো। বুদ্ধিগুলো যেন পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওঠে।

বুড়ো—ঠিক। ভালমন্দ বিচার করতে বসে, ভালবাসায় মরচে ধরে যায়।

বুড়ি—তাই বলে মানুষ ভালমন্দ বিচার করবে না?

বুড়ো—নিশ্চয় করবে, করেও ভালবাসবে, তবে তো মানুষ।

বুড়ি—ঠিক বলেছ, বুবাই-এর সঙ্গে আমাদের মতে পথে কোন মিল নাই। তবু ও তো আমাদের ভালবেসেছিল। আমরাও তো ওকে ভালবেসেছিলাম।

বুড়ো—আর মজা দেখ। ওর সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করে বসে থাকলাম।

বুড়ি—বিশ্বাসঘাতকতাই করলাম না?

[একটু চুপচাপ]

বুড়ো—আমরা জীবনে কি করেছি ভাল করে জানি না।

বুড়ি—মানে?

বুড়ো—বুবাই-এর কথায় সন্দেহ জাগেনি মনে? যা যা করেছ জীবনে সব ঠিক হয়েছিল কি-না।

বুড়ি—হ্যাঁ, সন্দ জেগেছে।

বুড়ো—আবার ধর পার্থ, বিপ্লব এরা যা করেছে তাও ঠিক বলে মনে হয়নি কোনদিন?

বুড়ি—সে তো কোনদিনই মনে হয়নি।

বুড়ো—আবার ধর বুবাইরা যা কবছে তাও মন মেনে নিতে পারছ না?

বুড়ি—না।

বুড়ো—তাহলে অঙ্ক কষে কি বেরুল।

বুড়ি—খালি সন্দ ধন্দ নিয়ে বেঁচে থাকা।

বুড়ো—নিজেরা তো আর কোনদিন কিছু করতে পারবে না—

বুড়ি—বুড়ো জড়বুদ্ধিটাকে নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করব শুধু।

বুড়ো—যোগফল শূন্য হয়ে গেল না?

বুড়ি—না উদ্বৃত্ত। আমরা উদ্বৃত্ত হয়ে গেছি!

বুড়ো—ঠিক সহধর্মিণী, ঠিক বলেছ—

বুড়ি—আমাদের ফুরিয়ে যাওয়াই ভাল না?

বুড়ো—এখনও সন্দ?

[এতক্ষণ ধরে বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছিল। এইবার একটা জীপের আওয়াজ

শোনা যায় যেন, জল কেটে কেটে আসছে।]

বুড়ি—নাঃ নাঃ চল। [উঠে দাঁড়ায়]

বুড়ো—চল ঘরে গিয়ে বুবাই-এর নামে একটা চিঠি লিখে অঘোর জেলের হাতে দিয়ে যাই, বলব, আমরা ঠিক অতটা খারাপ লোক ছিলাম না।

বুড়ি—আমিও সই করব কিন্তু—

[ভেতরের দিকে যায়

স্বদেশ ব্যস্ত হয়ে ঢোকে। সঙ্গে সঙ্গে বাইরে একটু দূরে সাইরেনের আওয়াজ, ভীত আর্তরব]

স্বদেশ—রত্না! রত্না কোথায়, বান আসছে—ভয়ঙ্কর বান।

[রত্নার আওয়াজ ওপর থেকে]

রত্না—সে কি? সর্বনাশ তুমি ওপরে উঠে এস।

স্বদেশ—বাবা-মা?

রত্না—সে কি? সর্বনাশ, তুমি ওপরে উঠে এস।

স্বদেশ—[ওপরে যেতে যেতে] আপনারা উপরে উঠে আসুন, বান আসছে।

[দরজার মধ্যে দিয়ে চলে যায়

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পেছন দিক থেকে মঞ্চের সামনে এগিয়ে আসে]

বুড়ি—ভগবান সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

বুড়ো—নিজে নিজে গলায় দড়ি দিতে কষ্ট হত।

বুড়ি—আমার ভয় করছিল দড়িটা দেখে—

বুড়ো—এখন করছে না?

বুড়ি—না, আমাদের শেষ কথাটা বুবাইকে জানান হল না।

বুড়ো—হল না! মহাকালের রাস্তায় কত কথাই তো হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা তো সামান্য প্রাণী—

বুড়ি—চল রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি—

বুড়ো—তার আগে এস। এই দড়িটা দিয়ে আমাদের হাত-পাগুলো একসঙ্গে কষে বেঁধে নিই। যাতে খুব দূরে দূরে চলে যেতে না হয়।

[বৃদ্ধা হাত বাড়িয়ে দেয়, বৃদ্ধ বাঁধতে থাকে জল এগিয়ে আসবার প্রচণ্ড শব্দ, আর্তনাদ ইত্যাদির মাঝে পর্দা নেমে আসে।]

কে বাঁচে ? কে ?

॥ চরিত্রলিপি ॥

শ্রীশ

কমল

শকুন্তলা

সুধীর

অনসূয়া

সহদেব

বেয়ারা

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

[ওয়াই. এম. সি. এ. বা সাঙ্গুভ্যালী বা ওই ধরনের কোন সাধারণ চায়ের ঘর। শ্রীশ একটা সিগারেট থেকে আর একটা সিগারেট ধরালো। তাই দেখে কমল নিজের পকেট থেকে একটা সিগারেটের প্যাকেট বের করলো, দেখলো সেটা ফাঁকা, ফেলে দিল। শ্রীশ আড় চোখে সেটা দেখল, না-দেখার ভান করল। শকুন্তলা একমনে বই পড়ে যাচ্ছে।]

শ্রীশ—[ধোঁয়া ছেড়ে হাত ঘড়ি দেখল] ওঃ, আই অ্যাম ফেড্ আপ, কোন মহিলার আসবার কথা থাকলে তবু না হয় ধৈর্য ধরে বসা যেত, কিন্তু এক দাড়ি কামানো ছোকরা আসবে বলে—

কমল—শ্রীশ, একজন মহিলার সামনে অন্য কোন মহিলার উল্লেখ এভাবে করা অন্যায়। এতে মনে হতে পারে শকুন্তলার সাহচর্য তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

শ্রীশ—সখা, আমি এমনি একটা জীব যে, মহিলাদের সামনে সত্য কথা বলতে ভয় পাইনে। শকুন্তলা দুষ্মন্তের ধ্যানে মগ্ন জেনেও শকুন্তলার ধ্যানগ্রস্ত হবার স্পৃহা বা ক্ষমতা কোনটাই আমার নেই।

কমল—শ্রীশ, জেলাসি তোমার চোখের মাথাও খেয়েছে? ভাল করে চোখ চেয়ে দেখ শকুন্তলা বই পড়ছে।

শ্রীশ—ভঙ্গীটা পড়বার বটে, তবে ওটা আসলে হৃদয়ের বাষ্প চাপা দেবার ভঙ্গী। আর কমল, তুমি জানো জেলাস হবার ক্ষমতা আমার নেই। জেলাস যারা হয় তারা কাপুরুষ। আর আমাদের কয়েক পুরুষে কাপুরুষ কেউ জন্মায়নি। অতএব জেলাস হতে গেলে যে অনুশীলনের প্রয়োজন সেটা পেরে উঠব না। আর তাই জেলাস হওয়া আমার ভাগ্যে ঘটে উঠবে না।

কমল—ব্রাভো! এটা অবশ্য মানতে হবে যে আজকাল পুরুষসিংহের প্রমাণ বক্তৃতাতেই হয়। এবং তাতে যে তুমি পুরুষসিংহ পদবীটা আশুই পাবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শ্রীশ—একটা সন্দেহের নিরসন অন্তত হোলো এতে যে তুমি আমার সম্পর্কে জেলাস। কি করবো ভাই! তোমার মত কানাস্তারা বাজিয়ে একটা চিতা বাঘকে চারদিক থেকে খেদিয়ে এনে, নিরাপদ মাচার ওপর থেকে গুলি মেরে দম্ভ ভরে সেই মরা বাঘের ওপর পা রেখে ফটো তুলে সেই ফটো আবার খবরের কাগজে পাঠিয়ে পুরুষসিংহ হবার চেষ্টা করতে পারবো না। আই অ্যাম আ স্ট্রেইট ম্যান কমল, অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু রিমেইন দ্য সেইম।

কমল—অ্যাট লিস্ট য়ু আর ক্লেভার, শ্রীশ। যে কোন ব্যাপারকে পার্সোনাল

করে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে তোমার জুড়ি কেউ নেই। ভবিষ্যতে তোমার এম. পি. হওয়া কেউ ঠেকাতে পারবে না।

শ্রীশ—তোমার দৃষ্টিটাকে তুমি কিছুতেই উঁচু করতে পার না কমল, তাই তোমার শিকারের সমাপ্তিও ঐ চিতাবাঘেই হয়। আমি যদি পলিটিকস্-এ থাকি তবে একদিন তোমার এম. পি. উল্টে পি. এম. হবে। আই উইল বি দ্য প্রাইম মিনিস্টার অব ইন্ডিয়া।

কমল—[হেসে ওঠে] শ্রীশ, তুমি সত্যিই হাসালে আমাকে।

শ্রীশ—হাসো বন্ধু, হাসো। সেদিন কিন্তু কাঁদতে হবে। তার প্রমাণ এই ছাত্র সংস্থায় মাত্র ছমাস আমি এসেছি। আর এর মধ্যেই তোমরা সকলেই আমাকে লীডার বলে মানতে বাধ্য হয়েছো। ইয়েস, ইনক্লুডিং ইয়োরসেল্ফ্, কমল।

কমল – তবে শকুন্তলা তোমাকে দুষ্মন্ত বলে ভাবছে না কেন? ভারতবর্ষের প্রাইম মিনিস্টার হবে তুমি, নিয়ম মতো শকুন্তলার তো তোমাকেই দুষ্মন্ত মনে করা উচিত।

শকুন্তলা—[এতক্ষণে বই থেকে মুখ তোলে ধনী কন্যা, এই ছোটো রেস্টোরেন্ট-এ চা খাওয়া তার ইচ্ছাকৃত কৃচ্ছ্রসাধন] ফরমাসে ভাবনা তৈরী করা যায় না, কমল। ভাবি না তার কারণ তোমাদের কারুরই দুষ্মন্ত হবার যোগ্যতা নেই। শ্রীশ শকুন্তলার জন্য একটা ভ্রমর তাড়াতেও নারাজ, দুষ্মন্ত শকুন্তলার জন্যে অন্তত ওটুকু করেছিলেন।

শ্রীশ—শ্রীমান সুধীর তোমার জন্যে কটা ভ্রমর তাড়িয়েছেন শকুন্তলা?

শকুন্তলা—শ্রীশ, তুমি এতো বুদ্ধির বড়াই করো, সুধীরের ব্যাপারে তোমার মাথা এতো মোটা হয়ে যায় কেন?

কমল—তার কারণ তোমাকে তিনদিন সুধীরের সঙ্গে একলা চা খেতে দেখা গেছে।

শ্রীশ—কমল!

কমল—আমি একবারও বলেছি তুমি জেলাস হয়েছ? তুমি তো শুধু ফ্যাক্ট সম্পর্কে আমাদের জানিয়েছ। এবং সুধীরকে দুষ্মন্ত কল্পনা করে শকুন্তলার পলিটিক্যাল কেরিয়ার নষ্ট হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করেছো।

শকুন্তলা—[আবার হাসে] সুধীরের মত ছেলে ঘটাবে আমার জীবনের উদ্দেশ্যতে বিপর্যয়। একথা কি করে ভাবলে শ্রীশ?

শ্রীশ—বিপর্যয় না ঘটলেও বিঘ্ন ঘটতে পারে:।

শকুন্তলা—ওকে নিয়ে আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করবার চেষ্টা করছি। ওকে আমার ভরত বলতে পারো, দুষ্মন্ত কদাপি না। ভ্রমর তাড়াবার ইচ্ছে তোমার নেই, আর ওর নেই সাধ্য। সুতরাং এ যুগের শকুন্তলাকে শেষ পর্যন্ত না আইবুড়োই থাকতে হয়।

শ্রীশ—তোমার ভরত যদি ভ্রমর হয়ে উৎপাত শুরু করে তাহলে হয়তো—

কমল—শ্রীশকে বক্তৃতা ছেড়ে ঘুষি মারবার কায়দাটা অনুশীলন করতে হবে—থাক থাক ভাই শ্রীশ, আর অমন রোষকষায়িত লোচনে তাকাসনি, আমার ভয় করে। তা যাক্‌গে, দুষ্মন্তের চিন্তা যখন করছিলেই না তো আমাদের প্রতি অনীহা দেখিয়ে বসেছিলে কেন?

শকুন্তলা—ইডিপাস কমপ্লেক্‌স্‌-এর চ্যাপ্‌টারটা একটু পড়ছিলাম।

শ্রীশ—পড়াশোনায় তাহলে মন দিলে। অনসূয়ার প্রতি অসূয়া বশতঃ নাকি?

কমল—কালিদাস যদি এসে আজ শকুন্তলা আর অনসূয়ার প্রতিযোগিতা দেখতেন, তাহলে নতুন করে শকুন্তলা নাটক লিখতেন এবং আমি বাজী ফেলে বলতে পারি সে নাটক শকুন্তলা দুষ্মন্তের কাহিনীর চেয়ে অনেক বেশী জমজমাট হোত।

শকুন্তলা—কমল তুমি হাসালে আমাকে। পরীক্ষায় ফার্স্ট হবার জন্য অনুর মত বই মুখে বসে থাকবো আমি! ক্লাসের পরীক্ষায় ও যেন জন্মজন্মান্তর ফার্স্ট হয়। আমি ফার্স্ট হতে চাই জীবনের পরীক্ষায়।

কমল—ওঃ। [শ্রীশের দিকে আড় চোখে চায়] তা সে ব্যাপারে তুমি তো প্রথম রাউন্ডে জিতেই গেছো। আর জীবনের আর একটা দিক বলতে যদি পলিটিক্যাল ক্ষেত্র বোঝায় তবে তাতেও তুমি জিতবে বলে মনে হয়। ইতিমধ্যে ছাত্র সংস্থার সেক্রেটারী হিসেবে তোমার নাম কোন্‌ না পাঁচ-দশবার কাগজে বেরিয়ে গেছে। আর বেচারী অনসূয়া, ও কবে ফার্স্ট হবে তখন হয়তো কাগজে লাস্ট বাট ওয়ান পেইজ-এ একটা স্ট্যাম্প সাইজ-এ ওর মুণ্ডুর ফটো বের হবে, তার নিচে থাকবে ওর ফার্স্ট হওয়ার নোট, ঐ এক দিনই। তারপর সবাই ভুলে যাবে। জীবন সমুদ্র পাড়ি দিতে খবরের কাগজের নৌকার দরকার যে কত এটা তুমি যত বুঝেছো অনসূয়া তত বোঝেনি।

শ্রীশ—শকুন্তলা, তোমার সঙ্গে আমার এইখানে একটু তফাৎ আছে। আমি জীবনে ফার্স্ট হতে চাই নিশ্চয়ই। তবে ক্লাসেও কেউ আমাকে ডিঙিয়ে যাবে, এ আমার বরদাস্ত হয় না।

কমল—তবে পড়ায় একটু মন দাও শ্রীশ। কারণ সুধীর সম্পর্কে প্রফেসররা বেশ আশা পোষণ করতে শুরু করেছেন।

শকুন্তলা—[ঘড়ি দেখে] কিন্তু সুধীরের আসার টাইম তো দেখছি পঁয়তাল্লিশ মিনিট হোল পেরিয়ে গেছে। ব্যাপার কি?

শ্রীশ—যার সময়ের জ্ঞান এতো কম তাকে তুমি ছাত্রসংস্থার কর্মী করে তুলবে আশা কর?

কমল—ঐটি বোল না ভাই, সময়ের জ্ঞান আমাদের সকলেরই সমান। যে যেদিন ঠিক সময়ে আসি সে সেদিন অপরের সময়জ্ঞানহীনতা নিয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিই।

শকুন্তলা—[অন্যমনস্কভাবে] ভাবছি ওর মাসী আবার ওকে আটকালো নাকি।

শ্রীশ—ঐ মাসীটিকে নিয়ে সুধীরকে প্রায়ই টীজ্ করতে দেখি তোমাকে। ঐ মাসীটি কে ?

কমল—কিন্তু মাসী আটকাবে কি করে ? হি ইজ নট্ এ চাইল্ড।

শকুন্তলা—চাইল্ড-এর চাইতে একটু বেশী। চাইল্ড-এর যে দুষ্টুমি করার ইচ্ছে থাকে ওর বোধহয় তাও নেই। কিম্বা মাসীর দুরমুশে সেটা দুমড়ে গেছে।

কমল—এতক্ষণে বোঝা গেল। তোমার প্রতিযোগিতা অনসূয়ার সাথে নয়, সুধীরের মাসীর সাথে।

শকুন্তলা—বাজে বোক না কমল।

কমল—কথাটা বাজলো বলে মনে হচ্ছে।

শ্রীশ—ধ্যেত্তেরি,—মাসীটি কে তাই শুনি না। সে প্রৌঢ়ার কি এমন ক্ষমতা যে যৌবনকে আটকায়।

শকুন্তলা—প্রৌঢ়া !

শ্রীশ—তবে কি বৃদ্ধা ? বিধবা সধবা অথবা ওল্ড মেইড ?

শকুন্তলা—নট অ্যাট অল, নট অ্যাট অল, বিধবা নন, সধবা নন, এমন কি ওল্ড মেইড্-ও নন।

শ্রীশ—তবে মাসী হলেন কি করে ? পাতানো ?

শকুন্তলা—মোটেই না, সুধীরের মা আর উনি যাকে বলে সহোদরা।

কমল—আমায় বলতে দাও শকুন্তলা, সুধীরের দেরী তোমার নার্ভ-এ চাপ দিয়েছে। টীকা-টিপ্পনী ছাড়া তোমার মুখ দিয়ে কথা বের হবে না। আমি সংক্ষেপে গল্পটা বলে দিচ্ছি।—

শকুন্তলা—থাক কমল। তুমি ওদের সম্বন্ধে যতটুকু জানো তাতে গল্পই বলা চলে। আমি সুধীরের কাছ থেকে ওর সমস্ত ইতিহাসই সংগ্রহ করেছি, আমিই বলছি।

শ্রীশ—[শকুন্তলার কাছ ঘেঁষে একটা চেয়ারে বসে পড়ে] বলো, মনে হচ্ছে ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং।

শকুন্তলা—ইয়েস, ইন্টারেস্টিং নো ডাউট। সুধীরের দিদিমা দুই মেয়ে নিয়ে বিধবা হন। বড়ো মেয়ে চিন্ময়ীর বয়স তখন ষোল আর ছোট মেয়ে মৃন্ময়ীর এই পাঁচ কি ছয়।

শ্রীশ—এত ছোট বড় কেন ?

শকুন্তলা—জানি না। সুধীরের দিদিমা বেঁচে নেই, জিজ্ঞাসা করার সুযোগ হবে না।

কমল—আমি বলতে পারি,—চিন্ময়ী জন্মাবার পর চিন্ময়ীর বাবা বছর দশেক নিরুদ্দেশ ছিলেন।

শ্রীশ—তারপর ফিরে এলেন ?

কমল—এলেন নিশ্চয়ই। নইলে মৃন্ময়ীর সুধীরের মাসী হয়ে জন্মাবার সুবিধে হত না।

শকুন্তলা—তুমি এতো খবর জানলে কি করে ?

কমল—সেকথা এখন থাক। এবার তুমি বলো।

শকুন্তলা – চিন্ময়ী সুন্দরী। এতো সুন্দরী যে নবাবী আমল হলে হারেমে ঠাঁই মিলতো।

কমল—কিন্তু এযুগে শ্বশুরের পয়সায় সবাই নবাবী করতে চায়। চিন্ময়ীর মায়ের ভাঁড়ে মা ভবানী অতএব—

শকুন্তলা—উইল ইউ স্টপ, কমল ? হ্যাঁ, এক বছর ধরে নানা লোক বুড়ো ছোঁড়া মহিলা চিন্ময়ীকে দেখতে লাগলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে—

কমল—জলখাবার যোগাড় করতে করতে চিন্ময়ীর মায়ের পুঁজি শেষ হোল।

শকুন্তলা—তারপব দেখা গেল বর ছিল পাশের বাড়ীতেই। বিক্রম চৌধুরী। বিক্রম ভয় করতেন না কাউকে কেবল নিজের বিধবা মা ছাড়া। ও'র পছন্দ চিন্ময়ীকে অনেকদিন থেকেই। কিন্তু মায়ের চিন্ময়ীকে যদিবা পছন্দ ছিলো, চিন্ময়ীর মাকে একটুও পছন্দ করতেন না। সেই মা হঠাৎ মারা গেলেন। অশৌচ অবস্থাতেই বিক্রম এসে চিন্ময়ীর মাকে বললেন—চিন্ময়ীকে আর কোথাও দেখাবেন না। তারপর ঘটা করে বিয়ে হয়ে গেল।

শ্রীশ—ঘটা করে ?

কমল—হ্যাঁ ঘটাটা বিক্রমবাবুই করেছিলেন। ছোট হলেও বাড়ীটা নিজেরই ছিলো। ব্যাঙ্কে ছিল কিছু টাকা আর ছিল একটা শাঁসালো চাকরী।

শ্রীশ—ইনটারেস্টিং, তারপর ?

কমল—এবার আমিই বলি। এক বছর যেতে না যেতেই সুধীর জন্মালো। চিন্ময়ীর মা মারা গেল। মায়ের অসুখের সময় মামা এসেছিলেন। তিনি মৃন্ময়ীকে নিয়ে গেলেন নিজের কাছে, যশোর জেলার কোন গ্রামে, চিন্ময়ীর আপত্তি সত্ত্বেও। জামাইয়ের কাছে নিজের ভাগ্নীকে রাখতে পারবেন না।

শ্রীশ—তা সে মামা এ্যাদ্দিন ছিলেন কোথায় ?

কমল—এ্যাদ্দিন ছিলেন না বলেই যে কোন কালেই থাকবেন না এমন কি কথা আছে ?

শ্রীশ—তাও বটে ! সুধীর এ্যাদ্দিন ছিলো না, এখন বেশ স্পষ্ট করেই জানান দিচ্ছে যে সে আছে।

কমল—যাই হোক, একবছর পরে যখন বোমার ভয়ে কোলকাতা থেকে লোক পালানো শুরু হোল সেই সুবাদে চিন্ময়ী সুধীরকে নিয়ে মামার বাড়ী এলো। মৃন্ময়ীর চেহারায় মামার বাড়ীর আদরের নমুনা দেখে চিন্ময়ীর

চোখে জল এলো।

শকুন্তলা—এটা বোধহয় একটু বাড়িয়ে বললে, কমল। মৃন্ময়ীর পড়াশোনার অসুবিধে দেখেই চিন্ময়ী তাকে কোলকাতায় নিয়ে এসেছিলেন। মামারা গরীব—গরীবের বাড়ীতে চেহারার চেকনাই খোলে না। মৃন্ময়ী দিদির কাছে বাড়িয়ে বলেছিল বলে মনে হয়।

কমল—মনে হয়? তুমি সাইকোলজি পড়ছ, হজম কতটা করেছ জানি না। তবে এ নিয়ে তোমার সঙ্গে তর্ক না করাই ভালো।

শকুন্তলা—এটা জান কিনা যে মৃন্ময়ীদেবী সুধীরকে একটা খোকা বানিয়ে রাখতে চান।

কমল—মানি বৈকি! এবং এখানে তোমার সঙ্গে আমি প্রায় একমত। তাই বলে ছোটবেলা থেকেই তিনি—

শ্রীশ—শকুন্তলার একথা আমি কিন্তু মানি না। খোকা হবার বীজ যদি তার নিজের মধ্যেই না থাকে তা হলে—

শকুন্তলা—মেয়েদের তুমি কতটুকু জান, শ্রীশ? সুধীরের প্রতি ওঁর মমতাকে মোটেই স্বাভাবিক বলা চলে না।

শ্রীশ—হোয়াট ডু য়্যু মীন বাই ইট?

কমল—অতটা চমকাবার কিছু নেই। সুধীরের সম্পর্কে তিনি একটু বেশী কনসার্নড্। তাঁর ধারণা সুধীর ছেলেমানুষ এবং ভালমানুষ। অতএব রাজ্যশুদ্ধ লোক ওকে ঠকাবে। বাড়ী ফিরতে দেরী হলে ওঁর মনে হয় সুধীর গাড়ী চাপা পড়েছে।

শ্রীশ—সিলি।

শকুন্তলা—শুধু তাই নয়, সুধীরের জন্য উনি একটা স্যাক্রিফাইস্-ও করছেন।

শ্রীশ—অর্থাৎ?

শকুন্তলা—অর্থাৎ দশ বছর ধরে যার কাছে উনি বাগ্‌দত্তা তাকে বিয়ে পর্যন্ত করতে পারছেন না।

শ্রীশ—তাই নাকি?

শকুন্তলা—এইবার বলো। এটা কি কেবল মমতা?

শ্রীশ—তার মানে?

শকুন্তলা—মানে দু-রকম হতে পারে। এক সুধীরের বাবা সুধীরের জন্য যে পরিমাণ টাকা রেখে গেছেন তার প্রতি ওঁরও একটা মায়া আছে। আর তা না হলে সুধীরের প্রতি মমতাটা ওঁর একটা অবসেশন। এটাকে কাটিয়ে উঠতে না পারলে ওঁর নিজের জীবনেও সুখী হবার আশা নেই।

শ্রীশ—তা সুধীর তো এখন বলে দিলেই পারে—আমার যথেষ্ট বয়েস হয়েছে। আমার সম্পর্কে আর তোমাকে ভাবতে হবে না—এবার তুমি বে থা করে সরে

পড়ি।

শকুন্তলা—ঐ তো মুশকিল। ওর মত সরল ছেলে বুঝতেই পারে না যে ওর মাসীমার মতলব কী! সুধীর বাড়ী ফিরলে উনি বলবেন 'খোকা, তোকে এতো শুকনো লাগছে কেন রে? সারাদিন কিছু খাসনি বুঝি?' দেন খোকা উইল বি মাচ্ ইম্প্রেস্ড্। 'তুমি কি করে বুঝলে? সত্যি তো আজ খেতে ভুলে গেছি।'

কমল – যে সুধীর এখানে এতো শাই, সেই সুধীর যখন মাসীর সঙ্গে কথা বলে তখন একবার দেখতে হয়।

শ্রীশ—তাহলে তোমরা কি বলবে এটা শুধু মাসীর দোষ?

শকুন্তলা—নিশ্চয়ই, ছোটবেলা থেকে উনি ওকে কারো সঙ্গে মিশতে দেননি। এবং এখনও উনি পছন্দ করেন না যে সুধীর আমাদের সাথে মিশুক। সেদিন যখন রমেন আব আমি সুধীরের খোঁজে ওদের বাড়ীতে গিয়েছিলুম, উনি যে কি রকম করে আমাদের দিকে তাকাচ্ছিলেন সে আর কি বলব।

কমল—কি রকম?

শকুন্তলা—[কমলকে উপেক্ষা করে] আমরা সুধীরের কথা জিজ্ঞাসা করতেই বললেন—খোকা তো বাড়ী নেই। যেন তাড়াতে পারলেই বাঁচেন। বললুম 'কখন ফিরবে?' বললেন, 'বলেছিলো তো পাঁচটায় ফিরবে।' বুঝতে পারছি ওঁর অনিচ্ছা আমাদের বসতে বলতে, তবু মজা দেখবার জন্য বললাম, 'পাঁচটা তো প্রায় বাজে। আমরা কি একটু বসতে পারি?' কি আর করেন। সঙ্গে সঙ্গে গলা পালটে বললেন, 'নিশ্চয় নিশ্চয়, আসুন, ভেতরে আসুন।' তারপর সুধীর আসার পর উনি ছুতো করে কতবার যে সে-ঘরে পাক দিতে লাগলেন।

কমল -কিন্তু রমেন বলছিল উনি নাকি নিজে চা তৈরী করে খাইয়েছিলেন তোমাদের।

শকুন্তলা—সেটা আমাদের পাহারা দেবার জন্যেই।

শ্রীশ—কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না—সুধীরের পেছনে এতটা পণ্ডশ্রম করার মানে কি? হোয়াট ডু য়্যু এক্স্পেক্ট্ ফ্রম হিম?

শকুন্তলা—এবারকার ম্যাগাজিন্-এ ওর কবিতাটা পড়েছ?

শ্রীশ—দেখলাম বটে তবে পড়া ঠিক হয়নি।

কমল—লেখকের নাম সুধীর দেখেই এমন একটা নাসিয়ার টেনডেন্সি হল শ্রীশ-এর যে—

শ্রীশ ও শকুন্তলা—কমল!

শকুন্তলা—কমল, তুমি কি এক মিনিটের জন্যেও সীরিয়াস হতে জান না?

[কমলকে ডিস্‌মিস করার ভঙ্গীতে শ্রীশ-এর দিকে তাকিয়ে বলে] যে কবিতাটা বেরিয়েছে আমাদের কাগজে সেটা পড়ে বেশির ভাগ ছেলে-মেয়ে ত সুধীরকে জীবনানন্দের সমপর্যায়ের কবি বলে মনে করছে। শুধু ছাত্র-ছাত্রীরাই নয়, প্রফেসর চাকলাদার পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন! অথচ কবিতা কি সম্পর্কে জান ?

শ্রীশ—কি সম্পর্কে ?

শকুন্তলা—মৃত্যু।

শ্রীশ—মৃত্যু ? তার মানে ?

শকুন্তলা—তার মানে মৃত্যু যে মধুরতাময় মুক্তি সেটাই ও কবিতার মধ্যে দিয়ে বলতে চেয়েছে।

কমল—তুমি রাগ করলেও আমাকে আর একবার ইনটারাপ্‌ট্‌ করতে হচ্ছে শকুন্তলা যে, ও আরও একটু বলতে চেয়েছে যে, জীবনের পদে পদে আমরা যত মিথ্যে বলি, মিথ্যে ব্যবহার করি, তার জন্য যে কষ্ট পাই যে অনুতাপ হয় অথচ যা স্বীকার করতে পারি না, মৃত্যু আমাদের তাব থেকে মুক্তি দেয়।

শ্রীশ—শকুন্তলার সাথে তোমার কথার তফাৎটা কি হ'ল আমি বুঝতে পারছি না।

কমল—ওঃ, হ'ল না বুঝি ?

শকুন্তলা—সে যাক্‌গে! মোট কথা সেটা রোমান্টিসিজম্‌ এর চূড়ান্ত, পেসিমিস্টিক্‌। অথচ ওর ভাষার জোর আছে। ওর এই সিনিসিজম্‌ কাটিয়ে ওকে যদি জীবনমুখী করা যায়, তাহলে ওর কলম আমাদের কাজে লাগবে। এবং সেই জন্যই ওর সম্পর্কে আমার এত ঔৎসুক্য। এবং মাসী সম্পর্কে ওর মোহ আমি ভেঙ্গে দিতে চাই।

কমল—মাসী সম্পর্কে মোহ ভেঙ্গে যাতে তোমাদের সম্পর্কে মানে, আমাদের সম্পর্কে মোহ জন্মায় ?

শকুন্তলা—তার মানে ?

কমল—না, ভেবে দেখ—একটা মোহ কাটাতে গেলে প্রথমে আর একটা মোহেরই দরকার হয়। এই দেখ না আমার দাদামশায় মদ ছাড়বেন বলে আফিং ধরেছিলেন—তারপর অথচ আফিংটা আর ছাড়তে পারলেন না।

শ্রীশ—রাবিশ। ওকে যদি নেশা করিয়েই কাজ করাতে হয় তবে তার দরকার ? তার চেয়ে লেট হিম হ্যাভ হিজ ওন ওয়ে। যত ইচ্ছে কবিতা লিখুক মৃত্যু বিভীষিকা নরক নিয়ে, তারপর ভাল করে পাশ ক'রে একটা লেকচারার হয়ে বসুক কোথাও। আমার তো মনে হয় না ওর কোন অ্যামবিশন আছে।

শকুন্তলা—কে বলেছে সে কথা। আমাদের দলে লোক তো বাড়বে। কিছু কাজ তো কিছু দিন চলে যাবে।

শ্রীশ—আমার মনে হয় -

কমল—[কমল এতক্ষণ পর্দা তুলে বাইরের দিকে দেখছিল। শ্রীশ-এর কথার মাঝখানে ফিরে বললে] শ্রীমান বোধ হয় আসছেন।

শকুন্তলা—[উৎসাহ গোপন করে যেন ব্যঙ্গ করছে এরকমভাবে বলে] আ-স-ছেন।

শ্রীশ—নাও এবার আপ্যায়ন কর, আমি উঠি।

শকুন্তলা—শ্রীশ, প্লিজ রাগ কোরো না। দেখ না আমি ওকে কিরকম নাকাল করি।

কমল—আমাদের তো দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলে। [সুধীর এসে ঢোকে, লাজুক, কথাগুলো থেমে থেমে বলে]

সুধীর—না মানে আমার কিরকম খেয়ালই ছিল না। তারপর একটু জ্বর হওয়াতে—[শ্রীশের দিকে নজর পড়াতে থেমে যায়]

শকুন্তলা—শ্রীশের সঙ্গে আলাপ নেই সুধীর?

সুধীর—আলাপ নেই তবে দেখা তো রোজই হয়।

শকুন্তলা—তাহলে পরিচয় করিয়ে দেবার কষ্টটা আর করলুম না। তারপর কি বলছিলে সুধীর, বাড়ীর দিকের ট্রামে উঠে পড়েছিলে?

সুধীর—[লজ্জিত হয়ে] মাফ চাইছি।

শকুন্তলা—থাক, আর মাফ চাইতে হবে না।

কমল—বরং মাসীমার কাছে মাফ চাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও। এই বেয়াদপির জন্য শকুন্তলা আজ তোমায় সহজে ছাড়বে না।

শকুন্তলা—[খিল খিল করে হেসে ওঠে] কমল, তুমি বড্ড দুষ্টু হয়েছ। ডোণ্ট টীজ্ হিম প্লিজ্। সুধীর সত্যি কিছু মাসীর ভয়ে জড়সড় নয়, ওটা তোমার ভাবনার বাড়াবাড়ি। তাই না সুধীর? [কমল অবাক]

সুধীর—[সলজ্জে] মাসীমণি বড্ড ভীতু। তাছাড়া বাড়ীতে তো আর কেউ নেই আর আমাকে বড্ড ভালবাসেন। তাই—

শকুন্তলা—সত্যি তোমায় বড্ড ভালবাসেন।

সুধীর—মা বাবা মারা যাবার পর উনি আমাকে মানুষ করেছেন কিনা।

শকুন্তল—হ্যাঁ সে তো জানি।

সুধীর ওঃ আগেও তো বলেছি সে কথা। তবে ভাগ্যে তোমার কথা মনে পড়ে গেল। তা নইলে মাসীমনি বোধহয় এতক্ষণে আমাকে কিছু অ্যাসপিরিন খাইয়ে একেবারে বিছানাজাত করে ফেলতেন।

শকুন্তলা—ওঃ হো হো, তোমার জ্বর হয়েছে বলছিলে না? দেখি—[উঠে গিয়ে সুধীরের কপালে হাত দেয়। শ্রীশ আর সহ্য করতে পারে না, উঠে পড়ে]

শ্রীশ—শকুন্তলা আমি চললাম। নটা নাগাদ নিশ্চয়ই বাড়ী পৌঁছে যাবে? তোমার সঙ্গে কালকের মিটিং-এর অ্যাজেন্ডা সম্পর্কে কয়েকটা কথা আছে।

[বেরিয়ে যায়]

কমল—দিলে ত ভাগিয়ে ?

শকুন্তলা—সত্যি সুধীর, তুমি এত দেরী করে এলে। শ্রীশ ভয়ানক ডিসিপ্লিনড্ ছেলে ত। ওর বোধহয় আবার অন্য কোথাও এনগেজমেন্ট আছে। ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য এখানে আসতে বলেছিলাম।

সুধীর—কি বলব, আমি খুবই লজ্জিত। কিন্তু মানে মাথায় এত যন্ত্রণা হচ্ছিল—একদম ভুলেই গিয়েছিলাম।

শকুন্তলা—ওঃ হো। তোমার যে জ্বর। কমল, প্লিজ তুমি একটা কাজ করবে ?

কমল—বল।

শকুন্তলা—সামনের দোকান থেকে একটা অ্যাসপ্রো বা—সারিডন বা—

কমল—থাক্ আর বা'গুলো ব্যয় করে লাভ নেই, আমি যাচ্ছি। থাক, পয়সা আমার কাছেই কিছু আছে [বেরিয়ে যেতে চায়]।

শকুন্তলা—আর কমল, [কমল ফিরে দাঁড়ায়] শ্রীশ যদি এখনও ট্যাক্সি পেয়ে না থাকে বুঝিয়ে এখানে আবার নিয়ে এস। বোল সুধীর খুবই লজ্জিত। তাই না সুধীর ?

সুধীর—বাঃ নিশ্চয়ই।

[কমল আবার বেরিয়ে যেতে চায়]

শকুন্তলা—আর কমল, বোল যে শকুন্তলা বলেছে যে—যে এনগেজমেন্ট-এর জন্য ও গেল সেটা কি কাল করা যায় না ?—বোল—

কমল—থাক, মোট কথা ওকে বুঝিয়ে নিয়ে আসতে হবে এই ত ?

শকুন্তলা—হ্যাঁ। সত্যি কমল তোমার মত বুদ্ধিমান ছেলে খুবই কম আছে।

কমল—কথাটা অন্য সময়েও মনে রেখ। কমলকে পঙ্কে নিমজ্জমান কোর না। চলি।

[যেতে চায়]

শকুন্তলা—ওঃ কমল প্লিজ, [কমল ফেরে] আর একটা কাজ। যাবার সময় দু পেয়ালা চায়ের অর্ডার দিয়ে যেও। [কমল আবার যেতে চায়] আর কমল [আবাব ফেরে কমল] ওর সঙ্গে কিছু কড়া টোস্ট, এ্যাঁ ? সুধীরের বোধহয় আর কিছু খাওয়া উচিত হবে না।

কমল—[চলে যেতে গিয়ে এবার নিজেই ফেরে] কই, আবার পিছু ডাকলে না ?

শকুন্তলা—[খিল খিল করে হেসে ওঠে] তুমি বড্ড দুষ্টু, কমল।

কমল—এতবার পিছু ডেকেছ। এখন ভালয় ভালয় কাজগুলো করতে পারলে বাঁচি। [বেরিয়ে যায়]

সুধীর—সত্যি আমার খুব খারাপ লাগছে, আবার কমলকে ছুটতে হ'ল—

শকুন্তলা—তাতে কি হয়েছে। আমি দেখেছি আমি কোন কাজ করতে বললে

কমল রাগ করে না।

সুধীর—তাছাড়া শ্রীশ—

শকুন্তলা—ও নিয়ে তুমি ভেবো না সুধীর। শ্রীশ যখন জানতে পারবে যে তুমি হবে আমাদের দলের একটা অ্যাসেট তখন দেখো ও একদম অন্য রকম হয়ে যাবে।

সুধীর—অ্যাসেট? কি বলছ তুমি?

শকুন্তলা—সুধীর, তুমি জানো না তোমার কত ক্ষমতা। এই দেখ অমন করে চেয়ে আছ কেন? তোমার কবিতাটা সম্পর্কে সবাই কি বলছে জান?

সুধীর—[সলজ্জ আগ্রহে] কি বলছে?

শকুন্তলা—বলছে আ পোয়েট ইজ বর্ন। বলছে অনেক প্রবীণ কবির তোমার কাছ থেকে শেখা উচিত।

সুধীর—কবিতাটা সম্পর্কে কি বলছে?

শকুন্তলা—মেয়েরা বলছে পড়লে মরে যেতে ইচ্ছে করে।

সুধীর—আর ছেলেরা?

শকুন্তলা—তারাও পাগল হয়ে গেছে। প্রফেসর চাকলাদার বলেছেন, দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে ঐ ছেলে।

সুধীর—[কথাটা কি করে বলবে যেন ভাবে, তারপর অন্যদিকে মুখ করে বলে] কিন্তু তোমার, তোমার কি মনে হয়?

শকুন্তলা—আমার? আমার মনে হওয়ার কি সত্যি কোন আলাদা দাম আছে সুধীর?

সুধীর—[তেমনি অন্য দিকে তাকিয়েই] বাঃ কি বল! তা নেই?

শকুন্তলা—আছে? [হাসে, যেন জিতেছে] তাহলে বলি আমারও মনে হয়েছে মরে যাই। সুধীর, তোমার সেই ভেতরের মানুষটাকে যেন আমি দেখতে পেলাম [সুধীর চমৎকৃত, আস্তে আস্তে শকুন্তলার দিকে ফেরে]। সুধীর—তোমার খুব কষ্ট না? মেয়েরা বলছিল সুধীরের নিশ্চয়ই আপনজন কেউ নেই। কেউ নিশ্চয়ই ভালবাসে না তাই ওর কলমে এত ব্যথা।

সুধীর—কি আশ্চর্য। কবিতা ছেড়ে মানুষটাকে নিয়ে আলোচনা করবার কি দরকার।

শকুন্তলা- সৃষ্টি যদি ভাল লাগে তাহলে স্রষ্টা সম্পর্কে আপনা থেকেই কনসার্নড্ হয়ে পড়তে হয়।

সুধীর—কিন্তু আমার কেউ নেই একথা তাদের মাথায় কে ঢোকালে? তাদের বলে দিও আমার আপনার জন অন্তত একজন আছেন এবং সে একজন অন্য অনেকের দশজনের সমান। তবু কারা বলছিল?

শকুন্তলা—এই অনু, রুচিরা, সুস্নিগ্ধা—

সুধীর—অনু মানে অনসূয়া ? তার পড়ার বই ছেড়ে কবিতা পড়বার সময় হোল ?

শকুন্তলা—তবে আর বলছি কি সুধীর—তুমি সবাইকে পাগল করেছ। কিন্তু সত্যি বল সুধীর, তোমার কি কোন দুঃখ নেই ?

সুধীর—দুঃখ তো সকলের আছে। সব মানুষের আছে। আর কবিতা যারা লেখে—তারা কি কেবল নিজেরা দুঃখ পেল বলেই লেখে ? তাহলে একটা কবি কটা কবিতা লিখতে পারবে। কিন্তু যারা কবিতা লেখে না তাদের এত ভাববার দরকার কি ?

শকুন্তলা—আমি ত সেই কথাই ওদের বলেছি, যে, যে কবি তার সম্পর্কে সহজে কোন কথা বলা যায় না। তাছাড়া সুধীরের মাসীমাকে যদি দেখতে তোমরা কেউ একথা বলতে পারতে না।

সুধীর—ঠিক তাই। আমার তিনকুলে কেউ নেই—আমাকে কেউ ভালবাসে না, তাই আমি কবিতা লিখতে পারছি, তা নইলে পারতাম না—কি সুন্দর ধারণা আমার সম্পর্কে তোমাদের।

শকুন্তলা—তোমাদের নয় সুধীর, ওদের। অনুদের যখন আমি বললুম তোমার মাসীর—মানে মিস সেন-এর কথা, তারা তো হেসেই বাঁচে না। বলে ভদ্র-মহিলার মাথায় গোলমাল আছে। তা না হলে এই বয়সে নিজে বে থা না করে সুধীরকে আগলাবার জন্য পড়ে থাকবেন কেন ?

সুধীর—[হেসে] আমার মাসীমনিকে দেখলে ওদের এ ধারণা পাল্টে যেত। কিন্তু অনু তো শিলং-এ মাসীমনিকে দেখেছে।

শকুন্তলা—দেখেছে ? তার মানে ?

সুধীর—মাসীমনি যখন শিলং-এর স্কুলে চাকরী করতেন তখন অনু ওঁর ছাত্রী ছিল কিছুদিন। তবে তখন ওর বয়স কতই বা।

শকুন্তলা—ওঃ, তা অনু এখন তোমাদের বাড়ীতে যায় না ?

সুধীর—কই, দেখিনি তো কোনদিন। আমিও তো ভুলেই গিয়েছিলাম। সেদিন হঠাৎ কথায় কথায় অনু বললে ও মাসীমনির ছাত্রী ছিল। তখন আমার মনে পড়ল।

শকুন্তলা—[সন্দিগ্ধ] ওঃ। তবে ও যেন একটু কেমন। হয় পড়বে নয় পরচর্চা করবে। আমার যেন ওকে কেমন একটু লাগে।

সুধীর—ওদের সঙ্গে যদি আবার কোনদিন এই প্রসঙ্গ ওঠে তাহলে বলে দিও নিজের বোনের ছেলের জন্য এতটা স্বার্থত্যাগ—হ্যাঁ শকুন্তলা, স্বার্থ-ত্যাগের যত বড় মানে হতে পারে সেই মানেতেই আমি বলছি সে আর কেউ করে বা পারে বলে আমি জানি না। নিজের মাকে ভাল করে মনে পড়ে না। ছবি দেখে বুঝতে পারি মায়ের মুখের আদল আছে মাসীমনির মুখে, আর

মনে হয় মা যেন মাসীমানিকে আমার মা হতে শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

শকুন্তলা—[একটু নিভে গিয়ে] কিন্তু তোমার মুখেই শুনেছি ও'র ফিঁয়াসে দশ বছর অপেক্ষা করছেন ও'র জন্য। এটা কি ভাল ?

সুধীর—হয়তো ভাল নয়। সেটা ওদের ব্যাপার। কিন্তু মাসীমনি সম্পর্কে ঐ ফিঁয়াসে কথাটা—

শকুন্তলা—[ব্রস্তে] ঠিক আছে, সুধীর আর বলতে হবে না।

সুধীর—আজ তোমরা আমার কবিতা সম্পর্কে এত উচ্ছ্বসিত হয়েছ। কিন্তু মাসীমনি যদি জ্যাঠামশায়ের কাছ থেকে আমাকে উদ্ধার করে না আনতেন তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা সিঁড়িও আমাকে পার হতে হ'ত না। জ্যাঠ্যামশায়ের সঙ্গে তাঁর ধর্মতলার ওষুধের দোকানে ওষুধ বেচে আর হিসেব লিখে কবিতা লেখার কবর তৈরী হ'তে পারত।

শকুন্তলা—তোমার জ্যাঠামশায় আছেন নাকি ?

সুধীর—হ্যাঁ, বাবার জ্যাঠতুত ভাই। ভাগ্যিস আপন ভাই নন, তাহলে মাসীমনিকে আরও মুস্কিলে পড়তে হ'ত। কিন্তু যাক্, মাসীমনির কথা আর নয়।

শকুন্তলা—না আর নয়। তবে একটা কথা তোমাকে একটু বলে দিই সুধীর—তুমি রাগ কোর না যেন, করবে না তো ? বল। বল।

সুধীর—[হেসে ফেলে] না। বল।

শকুন্তলা—[একটু হেসে] সুধীর, আমি তোমার ওয়েল-উইশার, বন্ধু। আমাকে ভুল বুঝো না যেন। বল ভুল বুঝবে না তো ?

সুধীর—কি ব্যাপার ? আরে।

শকুন্তলা—অনেকে তোমার মাসীমার সম্পর্কে অনেক রকম কথা বলে।

সুধীর—যেমন ?

শকুন্তলা—যেমন তোমার প্রতি তাঁর টান স্বাভাবিক নয়। তাঁর কোন স্বার্থ আছে।

সুধীব—স্বার্থ ! মাসীমনির স্বার্থ আছে ! তাদের বলে দিও তারা পাগল ! জ্যাঠামশায়রাও ঐ কথাই বলেছিলেন। আমার টাকার ওপর লোভ আছে মাসীমনির। কিন্তু তোমরা কি বিশ্বাস করবে শকুন্তলা, যে বাবা ওঁকে অধিকার দিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও উনি আমার টাকার থেকে একটাও পয়সা নেননি। নিজে এত দিন চাকরি করে আমায় খাইয়েছেন, পরিয়েছেন এবং পড়িয়েছেন। তোমরা তো প্রগতিবাদী শকুন্তলা ! জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে তোমাদের তফাৎটা কোথায় বল দেখি ?

শকুন্তলা—সুধীর, তুমি যদি 'তোমরা তোমরা' করে কথা বল তাহলে আমি খুব রাগ করব। আই অ্যাম ডিফারেন্ট, সুধীর ! আমি তোমার বন্ধু ! অন্তত বন্ধু হতে চাই—[আবেগে গলা যেন কাঁপে]। - আমি—

সুধীর—[ব্যস্তে] না না তোমাকে ভাবছি না শকুন্তলা। আমি জানি তুমি ডিফারেন্ট।

শকুন্তলা—[উজ্জ্বল হয়ে] সুধীর আমি চাই,—আমি জানি তুমি অনেক বড় হবে। কিন্তু দেখ একটা সমাজের মধ্যে আমরা বাস করি তো। তাই কিছু অনুশাসন আমাদের মানতেই হবে। তাই না? এই দেখ না আমরা বিশ্বাস করি না এমন অনেক কাজই অনেক সময় আমাদের করতে হয় তা না হলে প্রথম থেকেই যে আমাদের সাধারণ ছেলে-মেয়ে অবিশ্বাস করতে থাকবে।

সুধীর—হ্যাঁ কিন্তু কেন?

শকুন্তলা—বারে! তা না হলে লোকে যে গোড়া থেকেই সন্দেহ করবে। আমরা যে তাদেরই ভাল করতে চাই সেটাই তো বিশ্বাস করবে না! তবে এটাও ঠিক একদিন আমরা এ সমাজ বদলে ফেলব। তখন এভরি ম্যান অ্যান্ডএভরি ওম্যান উইল বি ফ্রি।

সুধীর—ঠিক বলেছ।

শকুন্তলা—কিন্তু যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন আমাদের একটু মানতেই হবে মানে ট্যাকটিকাল হতে হবে। তাই বলছিলাম যে—ধর লোকে যদি বলে যে—তুমি আমার প্রেমে পড়েছ [সুধীর যেন ধরা পড়ে অন্যদিকে মুখ ফেরায়] হাসাহাসি করবে, সবাই ঠাট্টা করবে কিন্তু খারাপ বলবে না সেটাকে। কিন্তু ধর যদি লোকে বলে মিস সেন তোমার প্রেমে পড়েছেন সেটা—

সুধীর—[চমকে শকুন্তলার দিকে তাকায়, যেন একথা শকুন্তলা বলেনি] কে বলেছে একথা? কে এই নোংরা কথা বললো?

শকুন্তলা—অত উত্তেজিত হোয়ো না। প্লিজ সুধীর প্লিজ। দেখ এরকম ব্যাপার যদি এ যুগে অসম্ভব হত তাহলে কেউ বলতো না। কিন্তু বাইরে থেকে ওরা কি করে বুঝবে, মিস সেন এবং তোমার কথা?

সুধীর—ওরা মানে কারা? অনসূয়া, রুচিরা?

শকুন্তলা—এই দেখ সকলকে জড়াচ্ছ কেন? রুচিরা এর মধ্যে নেই। মানে ওই, কেউ কেউ বলছিল এতটা স্নেহ একটা অবসেশন। তোমার প্রতি স্নেহের সঙ্গে ওঁর একটা কমপ্লেকস্ যুক্ত আছে। আর সেই জন্যই উনি বিয়ে করতে পারছেন না!

সুধীর—ছিঃ ছিঃ। দে আর ম্যাড, ম্যাড।

শকুন্তলা—হাজার হলেও অনু সাইকোলজি পড়ছে!

সুধীর—সে ত তুমিও পড়ছ, তুমি ত এরকম ভাব না!

শকুন্তলা—মোটেই না, আমি শুধু তোমাকে এইটুকু বলতে চাই, ওদের কথা বলার এত সুযোগ দেবার দরকার কি?

সুধীর—অবশ্য ওরা বললেই আমার কিছু এসে যায় না। শুধু আমি ভাবছি—

মাসীমনিকে—ছিঃ ছিঃ।

শকুন্তলা—মিস সেনকে তুমি যেন এসব কথা বলতে যেও না, সুধীর।

সুধীর—বলতে আমি পারবও না! শকুন্তলা—না কিন্তু ছিঃ ছিঃ।

শকুন্তলা—[সুধীরের মাথায় হাত রেখে আলতোভাবে] সুধীর, এই নিয়ে তুমি মন খারাপ করে থেকো না। সুধীর, প্লিজ, তুমি এটুকু জেনো যে অন্তত একজন বন্ধু তোমার এখানে আছে। দরকার হলে সে ওদের কথার জবাব দেবে। [আবার আবেগে গলা কাঁপে]।

সুধীর—[চমৎকৃত] শকুন্তলা তুমি খুব ভাল। তুমি আমি বেশী লোকের সঙ্গে মিশতে পারি না—কিন্তু—

শকুন্তলা—বল সুধীর! বল!

সুধীর—কিন্তু তোমাকে—

শকুন্তলা—কি?

সুধীর—[যেন মরিয়া হয়ে] আমি, আমি তোমাকে মনে করে একটা কবিতা লিখেছিলাম।

শকুন্তলা—আমাকে মনে করে? সত্যি? আছে তোমার কাছে?

সুধীর—আছে, কিন্তু থাক।

শকুন্তলা—থাকবে কেন সুধীর? দেখি, দাও বলছি। সুধীর!—আমাকে মনে করে যখন লিখেছ—ওতে আমার দাবী তোমার চাইতেও বেশী! সুধীর প্লিজ। [সুধীর প্রায় মন্ত্রমুগ্ধের মত কাগজটা বার করে দেয়। শকুন্তলা পড়তে পড়তে খুশীতে ঝলমলিয়ে সুধীরের দিকে তাকায়। লজ্জিত নার্ভাস সুধীর তখন টেবিলের উপরের ফুলদানীটার কারুকার্য দেখায় ব্যস্ত]।

শকুন্তলা—সুধীর, তোমার এ কবিতা রেস্তোরাঁর কেবিনের মধ্যে পড়বার জন্য নয়। এর জন্য চাই উন্মুক্ত আকাশ। যাবে সুধীর? কোথাও যাবে?

সুধীর—কোথায়?

শকুন্তলা—ময়দানে? লেকে?

সুধীর—যেখানে কাঠের পার্টিশানের বদলে মানুষের পার্টিশান!

শকুন্তলা—সে আমরা একটা জায়গা ঠিক বার করে নেব। চল [হাত ধরে]।

সুধীর—চল [দুজনেই বেরিয়ে যায়]। [একটু পরে কমল কথা বলতে বলতে ঢোকে। হাতে ওষুধের প্যাকেট। পেছনে শ্রীশ]

কমল—শকুন্তলা, শ্রীমানের রাগ অনেক কষ্টে ভাঙ্গিয়ে তারপর,—একি রে বাবা! ম্যাজিক নাকি?

শ্রীশ—কমল, তুমি জান এই ধরনের সস্তা রসিকতা আমি পছন্দ করি না। আই উইশ আই কুড স্ল্যাপ ইউ।

কমল—ঠিকই ঠিকই। প্লিজ গিভ আ স্ল্যাপ অন দ্য চিক [গালটা শ্রীশের দিকে

বাড়িয়ে দেয়]। এত বড় আহাম্মক আমি, একে মেয়েছেলে তায় ছাত্র সংস্থার অত বড় চাঁই, তার কথায় বিশ্বাস করেছিলাম। মার ভাই মার।

শ্রীশ—তোমার এই সমস্ত ভাঁড়ামি কোন সার্কাসের দলে কিংবা ঐ সিলি গার্লদের কাছে দেখিও, তারা হাততালি দেবে বা খিক খিক করে হাসবে। কিন্তু কমল আমাকে নিয়ে এ প্র্যাক্‌টিক্যাল জোক করার জন্য তোমাকে আমি—

কমল—প্লিজ শ্রীশ বিশ্বাস কর ভাই, আমি তোকে যা বলেছিলাম তার মধ্যে এতটুকু মিথ্যে ছিল না রে। কিন্তু কি মুশকিল! তোকে এখন আমি কি করে বোঝাই—

[একটা ১৫/১৬ বছরের বয় চা এবং টোস্ট নিয়ে ঢোকে। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসে। বোঝা যায় এরা রেগুলার খদ্দের।]

কমল—এই দেখ ফ্যাসাদ। তারা দয়া করে চা টোস্ট খেয়ে যায়নি। এইবার আমি কি করি।

শ্রীশ—আমি চললাম।

কমল—একটু দাঁড়া ভাই। কত হয়েছে?

বয়—একটাকা দু'আনা।

কমল—[পকেট দেখে] আমার কাছে আর আট আনা পয়সা মাত্র আছে। দে ভাই একটা টাকা অন্তত দে। আমায় তো ভাই ওরা পয়সা না নিয়ে ছেড়ে দেবে না। অর্ডারটা আমিই দিয়ে গিয়েছিলাম।

[শ্রীশ নিঃশব্দে একটা টাকা বার করে দেয়, তারপর চলে যেতে চায়।]

কমল—[শ্রীশের হাত ধরে] এইবার বিশ্বাস করলি তো ভাই, যে তোকে আমি ঠকাইনি বা তোকে এখানে মজা দেখানার জন্য নিয়ে আসিনি? বল ভাই?

[শ্রীশ প্রচণ্ড জোরে একটা হুঁ বলে বেরিয়ে যায়]

কমল—[চেঁচিয়ে] টাকাটা তোকে আমি কালই দিয়ে দেব রে।

বয়—[কমলের প্রতি সহানুভূতিতে] ম্যানেজার বাবুকে বলে বাকীও রাখতে পারতেন। আপনারা তো রোজই আসেন।

কমল—পারতাম? যাক্‌গে! দে বাবা এককাপ চা এগিয়ে দে, একটা মাথা ধরার বড়ি তো আগে খেয়ে নিই।

[চা সহযোগে ট্যাবলেট গিলতে থাকে]

[পর্দা নেমে আসে]

দ্বিতীয় অঙ্ক

[বড়োলোকের বাড়ীর রাস্তার দিকে চওড়া বারান্দা। সেই অনুযায়ী সাজানো। সময়—বিকাল। জানালার ভেতর দিয়ে একটি ঘরের কিয়দংশ দেখা যাচ্ছে। সেই ঘরে একটা টেলিফোন বেজে উঠল। একটি কাজের লোক—নাম সহদেব—ফোন ধরলো।]

সহদেব—হ্যালো ?—কি নাম বল্লেন ? নিপেশ—নিপেশদা ডাকছে বল্লেই হবে ? আচ্ছা, আচ্ছা ধরুন। [একটু পরেই দেখা গেল সুসজ্জিতা—বোধহয় একটু অতিসজ্জিতা শকুন্তলা এসে রিসিভার তুলল।]

শকুন্তলা—হ্যালো ? নৃপেশদা ? বলুন কি খবর। দেখাই পাওয়া যায় না ? বারে, চিদম্বরমের মিটিং-এ দেখা হলো না ? খালি ভুলে যাবেন—আমি কি করবো ? আজ ? না না, আজ যেতে পারবো না নৃপেশদা। শরীরটাও ভাল লাগছে না, তাছাড়া পরীক্ষার কথাটাও তো ভাবতে হবে ! বারে, আমি বুঝি কেবল ছাত্র আন্দোলনই করবো ? কি ? কেন ? কেন ? অন্য ক্ষমতা নেই নাকি আমার ? · আছে, মানছেন তাহলে ? না না, আজকে আমাকে ছেড়ে দিন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাবার কাছ থেকে চেকটা সই করিয়ে রেখেছি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, বেয়ারার চেক্। কি ? না, বাবা আমার কাছে কোন কৈফিয়ৎ চান না। [কি একটা কথা শুনে খিল খিল করে হেসে ওঠে] স্পয়েল্ট চাইল্ড্ না হলে আপনাদের দলে যেতাম কি করে ? আর এতো বা জুটিয়ে দিতাম কি করে ? হ্যাঁ আর এই যে একগাদা চ্যারিটি শো এর টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছেন, সেগুলোও বা বিক্রি করতাম কি করে ? হার মানলেন তো ? [আবার হাসে] হ্যাঁ, কাল কাউকে পাঠিয়ে দেবেন চেকটা দিয়ে দেবো। আচ্ছা, আচ্ছা ও হ্যাঁ শুনুন। এবারের পত্রিকাতে আপনাদের নতুন মেম্বার সুধীরের কবিতাটা কেমন লাগলো ?···পড়েননি ? · কে বলেছিল ? প্রতিভাদি ? সুধীরকে বলবো—ও খুব খুশী হবে। আচ্ছা যাবো একদিন অফিসে ওকে নিয়ে। আচ্ছা, আচ্ছা···

[রিসিভারটা নামিয়ে রাখে]

'সহদেব' !

[বারান্দায় এসে একটা চেয়ারে বসে, হাতে একটা খাম—সহদেব এসে পাশে দাঁড়ায়]

শকুন্তলা—হ্যাঁরে সহদেব, বাবা বেরিয়ে গেছেন ?

সহদেব—আজ্ঞে হ্যাঁ, এই আধঘণ্টা খানেক হবে।

শকুন্তলা—কিছু বলে গেছেন ?

সহদেব—আজ্ঞে হ্যাঁ, বললেন যে সেন সাহেবের ওখানে পার্টি আছে—সেখানেই খাবেন।

শকুন্তলা—আচ্ছা, তুই যা। না শোন ! সুধীরবাবুর আসবার কথা আছে—বলিস আমি এই বারান্দায় আছি—আর শোন বাবুর্চিকে বলে দে—সুধীর রাত্রে এখানে খাবে।

সহদেব—আচ্ছা। [পেছনের ঘরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোন বেজে ওঠে।

সহদেবকে দেখা যায় টেলিফোন ধরতে] হ্যালো—কে ? ওঃ হ্যাঁ—ধরুন। ডেকে দিচ্ছি।

শকুন্তলা—[উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলো] সহদেব—কে ?

সহদেব—আজ্ঞে, ছিশবাবু।

শকুন্তলা—শ্রীশবাবু ? তাকে যে কালকে আমি ··উঃ। তুই কি বললি ?

সহদেব—ঐ যে বললাম—

শকুন্তলা—বোকা কোথাকার। যা এখন গিয়ে বল যে দিদিমনি এক্ষুণি বেরিয়ে গেলেন—যা বল গিয়ে [সহদেব আবার গিয়ে ফোন ধরে] হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি ?

সহদেব—বাঃ বুঝতে সময় লাগবে না ? হ্যালো—না, ওনাকে পেলাম না—এক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন। এঁ্যা, রাত্তিরে ? আজ্ঞে,—মানে হ্যাঁ, বাড়ীতেই খাবেন। হ্যাঁ।

[রিসিভার রেখে দেয়]

শকুন্তলা—[রেগে] সহদেব ! [ভীত সহদেব এসে দাঁড়ায়] কে তোকে বলতে বলেছে বাড়ীতে খাবার কথা ?

সহদেব—তা উনি যে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন—

শকুন্তলা—এরকম বোকা লোক এর আগে আর আমাদের বাড়ীতে কখনো ছিলো না। হাঁদা কোথাকার। [খাম থেকে একটা কাগজ বার করে] কি, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন ? যা হবার তাতো হয়েই গিয়েছে। এখন যাও। [সহদেব চলে যায়] যাঃ মুডটাই নষ্ট করে দিলো। [তারপর কাগজটা পড়তে থাকে। প্রথমে নীরবে—তারপর সরব হয়ে ওঠে কণ্ঠস্বর।]

'তোমার চোখের দৃষ্টি
আমার চোখের ওপর দিয়ে চলে গেলো
যেন সাপের মতন।
আর সেই মুহূর্তে আমি হলাম
সৃষ্টিছাড়া নতুন এক জীব,
নতুন উদ্দাম অনুভূতিতে সঞ্জীবিত।
তোমার অপরূপ অভিরাম নয়ন
আমার সমস্ত অতীত মুছে দিলো,
আমি সন্ধান পেলাম
এক নতুন অয়নের।'

[কাগজটা মুড়ে খামের ভেতর রাখলো। তারপর আবার নিজের মনেই বলল—'অপরূপ অভিরাম নয়ন।' বাইরে জুতোর আওয়াজ। শকুন্তলা আনন্দে ঝলমল করে উঠলো। একটু গুছিয়ে বসে নিল। কমল এসে

দাঁড়ালো দরজায়। শকুন্তলা সামনের দিকে তাকিয়েই বলল—]
শকুন্তলা—আজ পাঁচ মিনিট আগেই এসেছো। থ্যাংক ইউ।
কমল—সরি। অসময়ে এসে পড়েছি।
শকুন্তলা—[উঠে দাঁড়ায়] তুমি!
কমল—এতো আশ্চর্য হলে কেন?
শকুন্তলা—না—অনেকদিন তো আসো না। আমি তো ভাবলাম তুমি আমাদের বাড়ীর রাস্তাই ভুলে গিয়েছো।
কমল—তাতে কি এসে যায়। যখন যা বলছো কাজ তো করে যাচ্ছি। আজও তো মনে হচ্ছে যে অসময়েই এসে পড়েছি।
শকুন্তলা—না, না—বসো না।
কমল—এই নাও তোমার টিকিটের টাকা। দশ টাকার চারটে, পাঁচ টাকার ছটা আর সাত টাকার ছটা—তাহলে হলো গিয়ে একশ বারো টাকা। হলো?
শকুন্তলা—থ্যাংক ইউ কমল। তুমি আমার জন্য যত টিকিট বেচে দাও, এমন কিন্তু আর কেউ—
কমল—থাক, তোমার মুখের ঐ প্রশংসা আমার সহ্য হয় না।
শকুন্তলা—ও! তা কোথায় যাচ্ছিলে?
কমল—কোথাও না। তোমার এখানেই এলাম।
শকুন্তলা—আহা, কী সৌভাগ্য আমার।
কমল—বুঝতে পারছি আমার এগ্‌জিটটাই তোমার অভিপ্রায়। তবু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।—একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?
শকুন্তলা—সত্যি কমল, আমি আর পেরে উঠছি না। এই দেখো না, কাল রাত এগারটা পর্যন্ত মিটিং করেছি, আজ আবার সকালে উঠতে হয়েছে—
কমল—আবার হয়তো ছুটিতেও হয়েছে গঙ্গার ধারের এনগেজমেন্ট রাখতে।
শকুন্তলা—বাইরের কাজ, পার্সোনাল কাজ—আমি যেন হাঁপিয়ে উঠেছি।
কমল—যারা গাছেরও খাবে তলারও কুড়োবে—তাদের তো একটু বেশী পরিশ্রম করতেই হবে।
শকুন্তলা—তুমি কি একটু বেঁকিয়ে কথা বলবার চেষ্টা করছো, কমল?
কমল—আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, সুধীরকে নাচাচ্ছো কেন?
শকুন্তলা—তার মানে?
কমল—আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি সুধীরকে নাচাচ্ছো কেন?—আর একবার নিশ্চয়ই 'তার মানে' বলবে না।
শকুন্তলা—তোমার সব কথার উত্তর আমি দেবো এমন কথা তোমাকে দিইনি।
কমল—যারা অন্যায় করে তারা সব সময়ে উত্তর দিতে পারেও না। তখন রাগ

দেখিয়ে 'তোমার কথার উত্তর দেবো না' বললে উত্তরটাও দিতে হয় না, আর অপর পক্ষই যেন অন্যায় করছে এমন একটা ভাবও দেখানো যায়। তাই না?

শকুন্তলা—সো ইউ আর জেলাস! তুমিও আমার প্রেমে পড়বে এতোটা আশা করিনি।

কমল—চমৎকার। ওমনি ফরমূলায় ফেলে দেওয়া গেলো তো? আচ্ছা তোমরা ঐ বাঁধাধরা সাইকোলজি ঘেঁষা কথা ছাড়া কথা বলতে জান না?

শকুন্তলা—যে যুগে যে জন্মায় সে সেই যুগের মতো কথা বলে।

কমল—তুমি যেন যুগের চাইতেও এগিয়ে যাচ্ছো।

শকুন্তলা—ইনটেলিজেন্ট হিউম্যান স্পিশিস্-রা তাই যায়।

[কমল শকুন্তলার সামনে এগিয়ে আসে। তারপর বেশ অ্যাক্টিং-এর ভঙ্গীতে বলে]

কমল—ওঃ! হোয়াট্ অ্যান ইনটেলিজেন্ট হিউম্যান স্পিশিস্। শ্যাড আই লোয়ার মাই হেড অনটু সাপ্লিকেশন অ্যান্ড আস্ক্ য়্যু টু চিউ দ্য সেইম?

[কমলের কথার ভঙ্গী আর দেহভঙ্গীর তাড়নায় শকুন্তলা খিল খিল করে হেসে ওঠে। তারপর হাসতে হাসতেই বলে—]

শকুন্তলা—মাফ করো বাবা! আই ডোন্ট থিংক ইট উইল টেস্‌ট নাইস।

কমল—ভাগ্যিস্! তাই পৈতৃক মাথাটা এখনো সোজা হয়ে কাঁধের ওপর আছে। তোমার দাঁতের নজর যদি একবার ঐ মাথার ওপর পড়তো তাহলে হয় শ্রীশের মত মাথা গলা বাদ দিয়ে কাঁধের সঙ্গে লেগে যেতো আর চোখগুলো লাল হয়ে উঠতো আর না হয় সুধীরের মত মাথাটা নিচু হয়ে বুকের কাছে নামতো আর তার ফলে চুলগুলো চোখের ওপর পড়ে একবারে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে যেত!

শকুন্তলা—সত্যি! ওর চুলগুলো এতো সুন্দর!

কমল—তাই নাকি!

শকুন্তলা—হ্যাঁ, ওকে এক এক সময় আমার এমন লাগে! মনে হয় যেন ছোট ছেলে। মনে হয় ওর এখনো গাইডেন্স-এর দরকার আছে!

কমল—[প্রচণ্ড হেসে] হোঃ হোঃ হোঃ—সেই মাসীপনা করবারই ইচ্ছে। বেচারা সুধীর।

শকুন্তলা—তার মানে?

কমল—আমার মনে হয়, শকুন্তলা, যখন তোমার উত্তর দেবার জন্যে সময়ের দরকার হয় তখন তুমি ঐ 'তার মানে' কথাটা ব্যবহার করো। তাই নয়?

শকুন্তলা—সুধীরের ভালো করতে চাই আমি—আমি—

কমল—এখনও উত্তরটা ঠিক করতে পারো নি? ভালো চাও না। তুমি দেখতে চাও সুধীর তোমার জন্যে পড়ায় ফাঁকি দিচ্ছে, ক্লাস পালিয়ে কলকাতার যত লাভারস্ কর্নার আছে সেখানে গিয়ে হাঁ করে বসে আছে। তুমি দেখতে চাও

সুধীর তোমার জন্য রাত জেগে কবিতা লিখে চোখের কোণে কালি পড়িয়েছে —তুমি দেখতে চাও সুধীর তোমার জন্য তার মাসীমাকে অপমান করছে।

শকুন্তলা—কমল!

কমল—তাহলেই তোমার দম্ভের গায়ে সুড়সুড়ি লাগে। আর তখন তুমি আবার শ্রীশ-কে নিয়ে বেড়াতে বা চা খেতে যেতে পারো।

শকুন্তলা—কমল, ঐসব কথা বলবার জন্য কে তোমাকে এখানে পাঠিয়েছে? সেই মহিলা বোধহয়? তাহলে তাকে জানিয়ে দিয়ো সুধীর আমাকে ভালবাসে আর—

কমল—ছিঃ। তুমি কী শকুন্তলা, তুমি কী? তাঁর ওপরে তোমার এত রাগ কেন? তিনি তো তোমাকে ভাল করে চেনেনই না। তোমার তবুও রাগ বা হিংসে কেন?

শকুন্তলা—তুমিও তো তাঁকে ভাল করে চেনো না। তবে তোমারই বা তার প্রতি এত শ্রদ্ধা কেন—জানতে পারি কি?

কমল—[একটু থেমে] আমি তাঁকে জানি—অনেকদিন আগে থেকেই জানি—তিনি—

শকুন্তলা—[কৌতূহলে] অনেকদিন আগে থেকে জানো? কী করে?

কমল—সে কথা থাক্।

শকুন্তলা—[অসম্ভব আগ্রহে কমলের একটা হাত ধরে আবদারের সুরে বলে] বলো না কমল, কী করে তুমি তাকে জানলে?

কমল—[একটু নরম হয়ে] তাঁর সঙ্গে যাঁর বিয়ের ঠিক হয়ে আছে তিনি আমার কাকা—

শকুন্তলা—কাকা! আপন? কই বলনি তো এতদিন!

কমল—সে রকম কোন অকেশান হয়নি, তাই বলিনি। না—আপন কাকা নন। সূর্য কাকার মা আমার বাবার পিসিমা হতেন।

শকুন্তলা—আচ্ছা! তারপর যা বলতে যাচ্ছিলে?

কমল—প্রথমে তো জাতকুল নিয়ে কী আপত্তি। শেষ পর্যন্ত আমার সেই ঠাকুমা —মানে বাবার সেই পিসিমা—নিমরাজী মত হলেন কিন্তু বললেন- ঐ ছেলে নিয়ে আসা চলবে না। তাকে কোন বোর্ডিং-এ পাঠিয়ে দিতে হবে।

শকুন্তলা—আচ্ছা! তারপর? তারপর?

কমল—মৃন্ময়ী দেবী বললেন—না, তা হয় না। দিদি জামাইবাবু মারা যাবার সময় খোকাকে আমার কাছে দিয়ে গেছেন। আজ নিজের স্বার্থের জন্য খোকাকে আমি বোর্ডিং-এ পাঠাতে পারবো না।

শকুন্তলা—উনবিংশ শতাব্দীর মত কথা!

কমল--কী বললে?

শকুন্তলা—না, কিছু না। তা সূর্যবাবু তো বাড়ী থেকে চলে আসতে পারতেন।

কমল—তাও তিনিই দেননি। তারপরেই ঠাকুমার পক্ষাঘাতের মত হয়। মৃন্ময়ী দেবী বলেছিলেন—কী দরকার ওঁদের মনে কষ্ট দিয়ে—বিয়ে তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। খোকা বড় হোক্ না।

শকুন্তলা—ওঃ। তারপর?

কমল—তখন তাঁর বয়স কত আর হবে? তেইশ চব্বিশ। সুধীরের জ্যাঠামশাই-এর হাত থেকে সুধীরকে বাঁচাবার জন্য চাকরী নিয়ে চলে গেলেন শিলং-এ। তারপর থেকে কি অসম্ভব কষ্ট করে যে সুধীরকে মানুষ করেছেন!—আর—

শকুন্তলা – [অধৈর্যে] ও কথা তো অনেকবার শুনেছি, কমল। কাক অনেক কষ্ট করে কোকিলের বাচ্চা ফোটায়, তাই বলে কাক কিছু শ্রদ্ধেয় হয়ে যায় না!

কমল—[এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে] আমারই ভুল হয়েছিলো। তোমার কাছে তাঁর কথা তুলে আমি তাঁকে আর একবার অপমান করলাম মাত্র!—আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি—সুধীর এবার পরীক্ষা দেবে না ঠিক করেছে। কেন?

শকুন্তলা—সেটা সুধীরকেই জিজ্ঞাসা করো।

কমল সে বলছে তার প্রিপারেশন হয়নি। কেন তার প্রিপারেশন হয়নি?

শকুন্তলা—[অত্যন্ত বিস্ময়ে, যতটা হয়েছে তার চেয়ে আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে] সুধীরের প্রিপারেশন কেন হয়নি সে কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছো কেন? আশ্চর্য! আশ্চর্য কমল! আই অ্যাম সারপ্রাইজড্ টু সি ইওর চিক, তুমি নিজেকে কি ভাব বল তো?

কমল—গুড অ্যাকটিং! কিন্তু প্রশ্নটা নিজেকে করলে ভাল হতো না?

[বাইরে মৃদু পদশব্দ। একটি মেয়ের গলার আওয়াজ আসে—আসতে পারি? বলতে বলতেই মেয়েটি এসে পড়ে। অনসূয়া বেশভূষায় সাধারণ মধ্যবিত্ত। ভদ্ররুচিসম্পন্ন সীরিয়াস মেয়ে]

কমল– আরে! অনসূয়া চক্রবর্তী, এসো এসো, কি খবর? তুমি এখানে?

শকুন্তলা—[জোর করে হেসে] কমল, তোমার এই ক্ষমতাটাকে অ্যাপ্রিশিয়েট না করে পারি না। এমন ভাবে অনুকে অভ্যর্থনা করছো যেন এটা তোমার নিজের বাড়ী!—তারপর! তোর খবর কি রে অনু? হঠাৎ আমার বাড়ীতে?

অনসূয়া—[একটু নার্ভাস] কমল!—কুন্তী, তোকে আমি একটা কথা বলতে এসেছিলাম—

শকুন্তলা—[একটু সন্দিগ্ধ] কী কথা? কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বোস্! তোকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমি বরং তোর জন্যে সরবৎ নিয়ে আসি।

[বেরিয়ে যায়]

কমল—ঠিক আছে, তোমরা কথা বলো, যাই।

অনস‍ূয়া—[আকুল হয়ে] না, না, তোমার যাবার দরকার নেই। বরং ভালোই তো!

কমল—তোমাকে এতো নার্ভাস দেখাচ্ছে কেন? [অনসূয়া কী একটা বলতে যায় —পারে না]—দেখ অনু, তুমি যদি শ্রীশ সম্পর্কে কিছু বলতে এসে থাকো, বোলো না। তুমি যদি ভেবে থাকো যে শকুন্তলা সুধীরে ইনটারেস্টেড বলে আর শ্রীশে ইনটারেস্টেড নয়, তাহলে ভুল করবে। এ সম্পর্কে আমার অনেক কথাই মনে হয়—কিন্তু সে যাক্‌গে, কেন তুমি ওর কাছে শ্রীশ-কে ভিক্ষে চেয়ে নিজেকে অপমান করবে?

অনসূয়া—[কেঁদে ফেলে] না না·· আমি—

কমল—সরি! আমি যদি তোমার জন্যে কিছু করতে পারি, তাহলে বোলো!

অনসূয়া—[অতি কষ্টে] না, কমল। শ্রীশকে আমি ভালোবাসি। কিন্তু ঐ সম্পর্কে ভাবনাটাই আমি ভুলে থাকতে চাই। ও নিয়ে কোনো কথা আমি কোনদিনই কাউকে বলবো না। সে কথা নয়।

কমল—তবে?

[শকুন্তলা আসে—হাতে সরবতের গ্লাস। গ্লাসটা অনসূয়ার সামনে রাখে।]

শকুন্তলা—কি হলো? কি বলবি বলছিলি?

অনসূয়া—[হঠাৎ জোর করে বলে ওঠে] আমি বলেছি বলে কোন কথা তুমি কাউকে বলেছো?

শকুন্তলা—[তীক্ষ্ম ভাবে তাকায়, তারপর হাসে] কেউ কি সেরকম কোন কথা তোমাকে বলেছে নাকি?

অনসূয়া—হ্যাঁ, বলেছে। [চুপ করে থাকে]

শকুন্তলা—কে বলেছে? কি বলেছে?—এই দেখো—না জানলে আমি কি করে বলি বল তো?

অনসূয়া—আজ মৃন্ময়ীদি মানে মিস সেন আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন।

শকুন্তলা—কে মিস সেন? [যেন জানে না]

অনসূয়া—সুধীরের মাসীমা।

শকুন্তলা—তিনি তোমার কাছে গেলেন মানে? আমি কিছু বুঝতে পারছি না! [হঠাৎ সামলে নিয়ে] আর তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক থাকতে পারে আমি তাও বুঝতে পারছি না।

অনসূয়া—আজ যখন তিনি আমাদের বাড়ীতে এলেন—[থেমে যায়। কমলের দিকে তাকিয়ে যেন আশ্বস্ত হয়] তুমি বোধহয় জানো কমল, বাবা যখন শিলং-এ ছিলেন তখন আমি কিছুদিন মৃন্ময়ীদির ছাত্রী ছিলাম।

কমল—হঁ্যা শুনেছিলাম। তা তিনি তোমার কাছে এসেছিলেন কেন ?

অনসূয়া—সুধীর বোধহয় তাঁকে অপমান করে থাকবে।

কমল অপমান মানে ?

অনসূয়া—সুধীর নাকি তাঁকে বলেছে যে—কথাগুলো খুবই খারাপ এবং আমার নামটাও জড়িয়ে যাওয়াতে—মানে—কুন্তী [শকুন্তলার দিকে ফেরে কিন্তু আবার চোখ নামিয়ে নেয়] - কুন্তী আমি কি কখনো সুধীর আর তার মাসীমাকে নিয়ে কোন কথা বলেছি বা কোন আলোচনা করেছি ?

শকুন্তলা—কী মুস্কিল ? তুমি কখন কোথায় কী নিয়ে আলোচনা করবে সেটা আমার জানার কথা নয়।

অনসূয়া—তুই জানিস কুন্তী আমি ঝগড়া করতে পারি না, আর সে জন্যে আসিওনি—

শকুন্তলা—[খিল খিল করে হেসে] তার মানে তুমি বলতে চাও আমিই খুব ঝগড়া করতে পারি ? [আবার হাসে]

অনসূয়া—কমল—তোমাকেই বলি—সুধীর মৃন্ময়ীদিকে বলেছে 'বিয়ে করে চলে যাও'।

কমল—সত্যি ?

অনসূয়া হঁ্যা আর এও বলেছে—তিনি বিয়ে না করলে নাকি সুধীরেরও বদনাম হচ্ছে—

কমল—ছিঃ ছিঃ—কিন্তু তোমার নাম এলো কি করে ?

অনসূয়া—আমিই নাকি বলেছি—সুধীরের ওপরে তাঁর টান স্বাভাবিক নয়—

কমল—আই সি।

অনসূয়া—[ঠোঁট কাঁপতে থাকে]—আর—অথচ আমি তাঁকে কতখানি যে শ্রদ্ধা করি—

শকুন্তলা [আপন মনে] সবাই দেখছি তাকে শ্রদ্ধা করে! [হঠাৎ অনসূয়ার দিকে ফিরে] কিন্তু একথা তুমি এখানে কেন বলতে এলে বুঝতে পারছি না।

কমল—[একদৃষ্টে তাকিয়ে তুমি হয়তো জানতে পারো কে বলেছে, তাই এসেছে বোধহয়।

শকুন্তলা—ব্যাপারটা অত্যন্ত নোংরা মনে হচ্ছে। আর তোমরা কেন এর মধ্যে আমাকে জড়াতে চাইছো বুঝতে পারছি না।

কমল—তুমি কেন এর মধ্যে অনুকে জড়ালে বলতে পারো ?

শকুন্তলা—তার মানে ?

কমল—হোঃ হোঃ হোঃ··· আবার 'তার মানে'

শকুন্তলা—[যেন ছোবল মারতে চায়] অনু তাহলে কেঁদেই জিতলো। মুস্কিল হচ্ছে যে আমি ওরকম ন্যাকার মত কাঁদতে পারি না।

[অনসূয়া উঠে দাঁড়ায়]

অনসূয়া—কেন যে আমি এখানে এসেছিলাম, কমল, মৃন্ময়ীদিকে দেখে আমার খুব ভয় করছে। এতো বড়ো আঘাত ওঁকে বোধহয় জীবনে কেউ দেয়নি! ও'র শরীর নাকি কিছুদিন খুব খারাপ যাচ্ছে। তাই আমার ভয় হচ্ছে কমল, যে উনি হয়তো—

কমল—তুমি ভেবো না অনু, আমি সূর্যকাকাকে বলবো। তাছাড়া আমি যাব ওঁদের বাড়ীতে।

অনসূয়া—আমি যাই, [হঠাৎ ফিরে] কুন্তী, তোর আশ্চর্য একটা ক্ষমতা আছে —নাঃ, সত্যিই তুই সুন্দরী। [যেন নিজেই মুগ্ধ]।

কমল—হ্যাঁ আর বঙ্কিমবাবু বলে গিয়েছেন সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র!

[হঠাৎ হুড়মুড় করে সুধীর ঢুকে পড়ে। হাতে লাল গোলাপের তোড়া, পরিচ্ছদ সুন্দর। যত্ন করে পরা হয়েছিল কিন্তু এখন সে পারিপাট্য নেই। চুল উস্কো-খুস্কো। মুখে সিগারেট। অনসূয়া সুধীরকে এক্‌স্‌পেক্‌ট্‌ করেনি তাই মুখের হাসি মিলিয়ে যায়]

কমল—হিয়াব কাম্‌জ্‌ রোমিও! সত্যি শকুন্তলা, সুধীরকে তুমি বদলে দিয়েছো—সে কথা মানতেই হবে। আই মাস্ট অ্যাডমায়ার হিম—হি ইজ্‌ আ ম্যান নাউ।

শকুন্তলা—[যেন এদের হাত থেকে সুধীরকে বাঁচাতে চায়] সুধীর, এসো তোমাকে বাবা একবার তাঁর কাছে ডেকেছেন। বেরিয়ে যেতেন, কেবল তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন।

[ওরা দু'জন দরজার দিকে এগোয়]

কমল—সুধীর, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

সুধীর—তাই নাকি, অপেক্ষা করো, আসছি এক্ষুণি।

[ওরা দু'জনে বেরিয়ে যায়]

কমল—অনসূয়া, সুধীরকে দেখে আশ্চর্য লাগলো না?

অনসূয়া—উঁ? হ্যাঁ লাগলো বৈকি।

কমল—ওকে দেখে আজ আমার করুণা হচ্ছে। কী হবে ওর?

অনসূয়া—কেন? শকুন্তলার সঙ্গে বিয়ে হবে ওর—তারপর ও নিশ্চিন্ত মনে কবিতা লিখবে।

কমল—খুব নিশ্চিন্ত হলে কবিতা লেখা যায় বুঝি? কিন্তু যে মেয়ে অবস্থা খুব ভালো না হলে কোন আত্মীয়ের বাড়ী পর্যন্ত যায় না সে করবে সুধীরকে বিয়ে! শকুন্তলার সঙ্গে তো ওর বিয়ে হবে না। তাহলে শ্রীশকে ইন্‌স্‌পিরেশান দেবে কে? কে তাকে ভারতবর্ষের পি. এম করে তুলবে? শ্রীশ ইজ ওনলি ওয়েটিং ফর দ্য পাসিং অফ্‌ অব্‌ দিস পাসিং ফেজ অব্‌

শকুন্তলা !—কি হলো ? —আবার তোমাকে একটা আঘাত দিয়ে ফেললাম তো ?—[আশ্চর্য হয়ে] এক এক সময়ে আমি ভাবি অনু—তোমার মত মেয়ে কী করে শ্রীশের মত ছেলের প্রেমে পড়ে ?

অনসূয়া—[একটুখানি কমলের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বলে] যেমন করে তোমার মত ছেলে শকুন্তলার মত মেয়ের প্রেমে পড়ে।

[কমল চমকে ওঠে যেন। তারপর চাপা দেওয়ার জন্য হো হো করে হেসে ওঠে। অনসূয়া চুপ করে কমলের দিকে তাকিয়ে থাকে। কমলের হাসি আস্তে আস্তে কমে আসে।]

তুমি খুব বুদ্ধিমান বিচক্ষণ, তাই তুমি বোকার মত প্রকাশ করতে চাও না। কুন্তী যখন অনর্গল মিথ্যে কথা বলে তখন তোমার লজ্জা হয় ওর জন্যে, দুঃখ হয় অথচ সেকথা তুমি অন্য কাউকে বলতে পারো না পাছে কুন্তীকে তারা মিথ্যেবাদী ভাবে। এমনকি এই অনুভূতির জন্যে তোমার হয়তো নিজের ওপর রাগও হয়, কিন্তু ভালো না বেসে তো পারো না।

কমল—[মাথা নীচু করে থাকে। তারপর জোরে নিশ্বাস নেয়। সোজা অনসূয়ার দিকে তাকিয়ে বলে] কেন এমন হয় বলতে পারো ?

অনসূয়া—আমরা অনেক কষ্ট পাবো বলে।

কমল—তাই বোধহয় ! ··সত্যি—অনু, আমি তো তোমার প্রেমেও পড়তে পারতাম। আমি তো জানি মেয়ে হিসেবে মানুষ হিসেবে তুমি শকুন্তলার চেয়ে অনেক বড়ো। তুমি—

অনসূয়া—[হাত তুলে ওকে থামিয়ে দেয়] তাতেও তো কোন লাভ হতো না কমল। কারণ, আমিও তো তোমার প্রেমে পড়িনি। আমরা এরকম ভুল জায়গাতেই প্রেমে পড়বো আর কষ্ট পাবো।

কমল—আমি, তুমি হয়তো প্রেমে পড়বো আর কষ্ট পাবো, কিন্তু শকুন্তলা শ্রীশ কখনো প্রেমেও পড়বে না আর কষ্টও পাবে না।

অনসূয়া—না, পাবে না। [হঠাৎ চমক ভাঙ্গে যেন] আমি যাই কমল। এখানে আর থাকা আমার উচিত হচ্ছে না। আমি দেখি একবার মৃন্ময়ীদির কাছে যাবো কিনা বুঝতে পারছি না। আচ্ছা যাই।

[অনসূয়া বেরিয়ে যায়। কমল তার গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ঘড়ি দেখে আপন মনেই বলে]

কমল—আরে ! আমিই বা এখানে কী করতে বসে আছি !

[কমল চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। শকুন্তলা এসে দরজায় দাঁড়ায়]

শকুন্তলা—একি ! অনু চলে গেলো ! ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়ে গেলো। সুধীর যখন এসেই পড়েছে সুধীরকে জিজ্ঞাসা করলেই মিটে যেতো !

কমল– [আগের সেই ব্যান্টার করবার জোর যেন আর নেই]

যাক্‌গে ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। আমিও চলি।

শকুন্তলা—সেকি! সুধীরের সঙ্গে কথা বলবে না?

কমল—নাঃ, আর ভালো লাগছে না।

শকুন্তলা—[হেসে] হঠাৎ কি হলো তোমার? তোমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে বলবো?

কমল কী?

শকুন্তলা—বেড়ালের মাছে অরুচি হয়েছে। [হাসে]

কমল—একটু এক্‌স্‌প্লেন করো।

শকুন্তলা ভেবে দেখো, সুধীরকে কত শক্ত কথা এখন তুমি বলতে পারতে।

কমল—ও। নাঃ, ঐ কথা বলে কিছু হয় না।

শকুন্তলা—হ্যাঁ আমিও তাই বলছিলাম কমল—ফর আ চেঞ্জ তুমি একটু কথা কম বলার চেষ্টা করো।

কমল ধন্যবাদ!

[সুধীর আসে]

সুধীর—এই যে কমল, কি বলবে বলছিলে?

কমল—না, কিছু না।

সুধীর—কেন? আমি পরীক্ষা দেবো না বলে আমাকে ভৎর্সনা করবে না?

কমল—না। এখন আর তোমাকে ভৎর্সনা করবার বা উপদেশ দেবার কোন অধিকার আমার নেই।

সুধীর -এর আগে ছিলো?

কমল—ছিলো তখন, যখন তুমি আমাকে ভালবাসতে। কিন্তু তোমাকে এখানে দেখে—

সুধীর—[বাধা দিয়ে হেসে ওঠে] ওঃ তাহলে শকুন্তলাকে ভৎর্সনা করবার অধিকার তোমাব কোন্‌ সুবাদে হলো?

কমল—[শকুন্তলাকে] ওঃ—তুমি বলেছো বুঝি?

সুধীর—হ্যাঁ, তাই বলছিলাম কমল। ও বেচারাকে অস্বস্তির মধ্যে না ফেলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেই পারতে।

কমল—সত্যি, তুমি একেবারে বদলে গেছো সুধীর। প্রায় দু'মাস তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, না?

সুধীর—আমার বদলটা যেন তোমার পছন্দ হচ্ছে না?

কমল—না, হচ্ছে না। আচ্ছা আমি যাই।

সুধীর—শোন কমল! তোমরা যদি ভেবে থাকো কারুর প্ররোচনায় আমি পরীক্ষা দিচ্ছি না—তাহলে আমি বলবো সেটা ভুল। আর সেইজন্যে ঘরে-বাইরে তোমরা সবাই কৈফিয়ৎ চাইতে পারো না।

কমল—আমি তো তোমার কাছে কোন কৈফিয়ৎ চাইনি।

সুধীর—শকুন্তলার কাছে চেয়েছো।

কমল—হ্যাঁ, সে ভুলটা করেছিলাম বটে। কারণ তখনও তোমার এই চেঞ্জড্ ভার্শনটা দেখিনি কিনা। তাছাড়া সূর্যকাকা মৃন্ময়ীদি এবং তোমাকে আলাদা করে ভাবিনি তো।

সুধীর—এবার থেকে তাই ভাবতে হবে। আমি মাসীমনির কাছ থেকে চলে এসেছি।

কমল—[অত্যন্ত বিস্ময়ে] চলে এসেছো? কবে?

সুধীর—আজ একটু আগে।

শকুন্তলা—চলে এসেছো?

সুধীর—হ্যাঁ।

কমল—ওঃ। ভালো। চললুম।

সুধীর—কেন? কিছু বলবে না?

[কমল দরজা অবধি গিয়েছিলো। সেখানেই ফিরে দাঁড়ায়। তার চোখে মুখে একই সঙ্গে রাগ, দুঃখ, ঘৃণা, এবং ভালোবাসার অভিব্যক্তি যেন ভীড় করে আসে। সে বলে—]

কমল—নাঃ! [বেরিয়ে যায়]।

[একটুক্ষণ দু'জনে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে]

শকুন্তলা—তুমি চলে এলে কেন সুধীর?

সুধীর—[হঠাৎ রেগে] কেন? অন্যায় করেছি?

শকুন্তলা—আমি তাই বলেছি? সুধীর, তুমি—নাঃ, কমল তোমার মেজাজটা একদম খারাপ করে দিয়ে গেছে! আমি জানতে চাইছি এমন কি ঘটলো যাতে তুমি এতো বড়ো স্টেপ নিতে বাধ্য হলে?

সুধীর—এখন ওসব কথা থাক কুন্তী।

শকুন্তলা—কিন্তু না জানতে পারলে আমি যে শান্তি পাবো না। বলো না সুধীর। আমাকে কি তোমার আপনার জন বলে ভাবতে পারো না!—সুধীর?

সুধীর—তোমার তো একটা কল্পনা ছিলো, না, কুন্তী?—যে-ধর, কুন্তী বলে তো তোমাকে সবাই ডাকে; আমি একটা অন্য নাম দেবো তোমার। আজ এক্ষুণি তোমাকে অন্য নামে ডাকতে ইচ্ছে করছে।—এই লাল শাড়ীতে তোমাকে [আবার সেই আগের মত আড়ষ্টতা যেন ওকে ঘিরে ধরে] আমি ভাবতেই পারি না—

শকুন্তলা—কি?

সুধীর—না।

শকুন্তলা—কি বলো না !

সুধীর—যেদিন প্রথমে তোমাকে কমনরুমে দেখলাম—

শকুন্তলা—তারপর ?

সুধীর—মনে হলো মানে যত মেয়ে ছিল সেখানে সকলের মধ্যে তোমাকে —মানে—

শকুন্তলা—আনকমন্ লাগছিলো ?

সধীর—দ্যাট্স দ্য ওয়ার্ড, আনকমন্ ! হ্যাঁ আনকমন্। তার আগে—

শকুন্তলা—তার আগে ?

সুধীর—এতো সুন্দর কাউকে আমি দেখিনি।

শকুন্তলা—পাগল !

সুধীর—[ক্রমে প্রগল্‌ভ হয়ে উঠছে] সেদিন সকালে তোমাকে যখন গঙ্গার ধারে দেখলাম তখন—তখন—

শকুন্তলা—তখন ?

সুধীর—তখন মনে হচ্ছিল শুভ্রা কিংবা নির্মলা বলে ডাকি।

শকুন্তলা—ডাকলেই পারতে।

সুধীর—আর এখন কি মনে হচ্ছে জানো ?

শকুন্তলা—কি ? বলো না ?

সুধীর—সন্ধ্যেটা কিরকম লাল হয়েছে দেখছো ? আকাশে একটা তারা কিরকম জ্বল্‌জ্বল্ করছে। আর তোমার এই লাল শাড়ী—এই মুহূর্তে তোমাকে মনে হচ্ছে অগ্নিশিখা !

শকুন্তলা—[চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে সুন্দর ভঙ্গীতে হাসতে হাসতে বলে] তুমি পাগল।

সুধীর—তুমি শিখা, অগ্নিশিখা—[শকুন্তলার হাতদুটো শক্ত করে ধরে। শকুন্তলা বসে পড়ে একটা চেয়ারে—হাতদুটো ধরেই সুধীর পাশের চেয়ারটাতে বসে]

শকুন্তলা—এই দেখো আবার তুমি পাগলামো শুরু করলে ! [হাসে]

[খেলাচ্ছলে শকুন্তলা হাতটা সরিয়ে নেয়। ইচ্ছেটা সুধীর আরও একটু এগিয়ে আসুক ওর দিকে। সুধীর নিজের চেয়ার থেকে আরও একটু ঝুঁকে প'ড়ে শকুন্তলাকে ধরতে যায়। অনসূয়ার না খাওয়া সরবতের গেলাসটা মূর্তিমান রসভঙ্গের মত পড়ে যায়। দু'জনেই সচকিত হয়ে ওঠে, নেশাটা কেটে যায় যেন।]

শকুন্তলা—[স্বগত] অনুটা কেবল আমার শত্রুতা করবে।

সুধীর—কি হলো ?

শকুন্তলা—অনুকে সরবত দিয়েছিলাম ; তা উনি না খেয়েই চলে গেছেন।

দেখেছো—তোমার এই কবিতাটা এক্ষুণি ভিজে যেত।

[কবিতার খামটা সরিয়ে রাখে]

সুধীর—আমাকে এক গেলাস জল খাওয়াতে পারো ?

শকুন্তলা—এই দেখো, তোমার চায়ের কথাও তো বলিনি ! একটু বোসো—আমি আসছি।

[সুধীর একলা বসে থাকে। হঠাৎ ওর ভুরু কুঁচকে ওঠে—যেন কি একটা অস্বস্তি ওকে আক্রমণ করছে হঠাৎ আপন মনে বলে ওঠে—'আমি কি করতে পারি !' শকুন্তলা আসে—হাসে।]

শকুন্তলা—কি বিড়বিড় করে বলছো ? কবিতা ?

সুধীর—উঁ ? হ্যাঁ কবিতা।

শকুন্তলা—কই আজ আমার পাওনা দিলে না ?

[সুধীর নিঃশব্দে একটা খাম বার করে দেয়। এর আগে শকুন্তলা ঐ রকম একটা খাম থেকে কাগজ বার করেই কবিতা পড়েছিলো। শকুন্তলা কাগজটা বার করে পড়তে চেষ্টা করে। কিন্তু অন্ধকার হয়ে এসেছে, পড়তে পারে না—স্বভাবতই আলোটার দিকে তাকায়। কাজের লোক ট্রেতে করে দু'গ্লাস সরবত নিয়ে ঢোকে]

শকুন্তলা—সহদেব, আলোটা জেলে দে তো, আর এই গেলাসটা এখান থেকে তুলে নিয়ে যা।

[আলো জ্বলে উঠলো। শকুন্তলা একটা চেয়ারে বসে কবিতা পড়তে লাগলো। সুধীর একটা সিগারেট বার করলো অন্যমনস্কের মত। ইতিমধ্যে সহদেব চলে গেল কাজ সেরে]

শকুন্তলা—[পড়া শেষ করে] সত্যি, আমি তোমাকে বলে দিলাম—দেখো রবীন্দ্রনাথের পর একদিন তোমার নাম লোকে করবে।

সুধীর—[এতোক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল, হঠাৎ বললো] আচ্ছা, আমি যে পরীক্ষা দিচ্ছি না, তারপর এই যে চলে এলাম, এইজন্যে কমল নিশ্চয়ই মনে মনে আমাকে ঘেন্না করছে, না ?

শকুন্তলা—কমল কি এমন একটা লোক যে তার কথা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে ?

সুধীর—না, মাথা আমি ঘামাচ্ছি না—আমার দরকারও নেই। তবে আমার সামনে কিছু বললে আমি তার জবাব দিতে পারতাম।

শকুন্তলা—একি সরবতটা খাওনি ! এক্ষুণি খাও !

[গ্লাসটা হাতে দেয়]

সুধীর—[গ্লাসটা নিয়ে] অথচ ওরা তা করবে না, আড়ালে বলবে। কিন্তু আমি কি করতে পারি বলো ?

শকুন্তলা—ইউ ক্যান ইগনোর দেম।

সুধীর—দ্যাট্‌স্‌ হোয়াট আই মাস্ট ডু। সকলে মিলে যেন আমাকে পাগল করে তুলেছে। আমি যেন ওদের উপদেশ নিক্ষেপ করার ডাস্টবিন্‌! আমি দেখেছি জানো, স্কুলে যারা চাকরি করে, না—তারা সামনে যাকে পাবে তাকেই উপদেশ দিতে বসবে।

শকুন্তলা—ইউ আর টু এক্‌সাইটেড্‌। কী—কী হয়েছিলো, সুধীর?

সুধীর—আমি মাসীমনিকে বার বার বলেছি—যে আমার জন্যে তোমাকে এতো ভাবতে হবে না। আমি যে পরীক্ষা দিচ্ছি না এটা আমি ভেবে চিন্তেই দিচ্ছি না। কিন্তু উনি তা শুনবেন না। কিছুতেই আমি ওঁকে বোঝাতে পারবো না যে ভালো রেজাল্ট করা আমার দরকার এবং আর এক বছর টাইম পেলে সেটা আমি ভালভাবেই করতে পারবো—[এ টাইমটা আমার দরকার।] উনি হঠাৎ বলে বসলেন—বাজে আড্ডা দিয়ে বেড়াও কেন?

শকুন্তলা—তারপর?

সুধীর—কে ওঁর কাছে আমাদের নামে কি বলেছে জানি না। মোট কথা উনি বলে বসলেন—পরীক্ষাটা দিয়ে তারপর যতো ইচ্ছে, যার সঙ্গে হয় প্রেম করো তাতে আমার আপত্তি নেই। এরকম করে পয়সা এবং সময় নষ্ট করা চলবে না।

শকুন্তলা—[মুখে অত্যন্ত দুঃখের ভাব এনে] তুমি কি বললে?

সুধীর—ন্যাচারালি আমাকেও বলতে হলো—মানে মাসীমনির প্রতিজ্ঞা ছিলো আমি এম এ পাশ করলে উনি বিয়ে করবেন। তাই আমি বললাম—তার মানে আমি তোমার বিয়ে পিছিয়ে দিতে বলছি না—তুমি বিয়ে করে চলে যেতে পারো।

শকুন্তলা—তারপর?—তারপর?

সুধীর—তারপর—সে যাকগে—তারপর উনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

শকুন্তলা—তারপর কি তুমিও বাড়ী থেকে চলে এলে?

সুধীর এলেই বোধহয় ভালো হতো। তাহলে বিকেলের এই ব্যাপারটা ঘটতো না।

শকুন্তলা—কি ব্যাপার? বলো না সুধীর, কী ব্যাপার।

সুধীর—আমি তোমার এখানে আসবো বলে তৈরী হচ্ছি, উনি তখন ফিরে এলেন—এসেই আমাকে আর এক দফা জেরা করতে শুরু করে দিলেন।

[চুপ করে যায়]

শকুন্তলা—জেরা মানে?

সুধীর—কেবল জেরা নয়—জেরা এবং উপদেশ।

শকুন্তলা—আমি কিছু বুঝতে পারছি না—কি বললেন কি?

সুধীর—বললেন যে আমি যা যা বলেছিলাম সে সব কথা অনসুয়া বলেনি, বলতে পারে না কথনো—সে আরও অনেক। থিংক অব দিস্ ! উনি আমার সম্পর্কে স্পাইয়িং করতে বেরিয়েছিলেন। দেন আই লস্ট মাই টেম্পার।

শকুন্তলা—ট্রাই টু ফরগেট।

সুধীর—না—তাও যদি সেখানেই থেমে যেতেন তাহলে তো হতো—তোমাকে ইঙ্গিত করে যখন একটা কথা বললেন তখন—

শকুন্তলা—তখন ?

সুধীর—আমি তার উত্তর দিতে চাইনি। আমি জানি যে তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করছো। এর আগের দিনও আমি সময় রাখতে পারিনি। তুমি বলেছিলে, রাদার আমি কথা দিয়েছিলাম তোমাকে—যে এক মিনিটও আমার দেরী হবে না—অথচ উনি এমন শুরু করলেন। তারপর হঠাৎ গায়ে হাত দিয়ে বলে উঠলেন—'একি তোর যে আবার জ্বর এসেছে, না, তোর বেরুনো কিছুতেই হবে না'।—তখন সেই কথাগুলো এমন ন্যাকামির মত মনে হলো। বাধ্য হয়ে আমাকে—মানে—ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েই আসতে হলো। আর আসবার সময়ে বলে এলাম—আমি আর ফিরবো না।

শকুন্তলা—ছিঃ ছিঃ, আমার খুব খারাপ লাগছে, আমার জন্যেই—

[হঠাৎ আলো নিভে গেল। দূর থেকে, মানে নীচের রাস্তা থেকে একটা হৈ হৈ শব্দ উঠলো। 'আজ এই পাড়া ফেল করেছে, ইলেকট্রিক কোম্পানি ফেল করেছে'—ইত্যাদি কথাগুলো স্পষ্ট শোনা না গেলেও ব্যাপারটা বোঝা গেল।]

শকুন্তলা—ওঃ, কারেন্ট অফ্ হয়ে গেল।

সুধীর—হ্যাঁ [যেন কথা খুঁজে পায় না। সহদেব মোমবাতি ধরিয়ে এক পাশে একটা টিপয়ের ওপর রেখে যায়]।

শকুন্তলা—[গলায় কান্না] সুধীর, আই অ্যাম সরি।

সুধীর—হোয়াট ফর ?

শকুন্তলা—আমার জন্যে আজকে তোমাকে—

সুধীর—থাক, আমার জন্যেও তো আজকে তোমাকে কমল অপমান করেছে। [হঠাৎ যেন খুশি হয়ে ওঠে] ওদের কাছ থেকে পাওয়া এই অনর্থক অপমানই আমাদের আরও কাছাকাছি এনে দিলো ! কুন্তী—[হাত বাড়ায় শকুন্তলার দিকে]

শকুন্তলা—[হাতটা ঠেলে দেয়। গলায় একটা অদ্ভুত খুশীর আওয়াজ আনে। যেন ছোট মেয়ে] উঁহু ! তুমি এক্ষুণি আমাকে অন্য নাম দিয়েছিলে।

সুধীর—ঠিক তো, শিখা—তুমি শিখা। তুমি বলেছিলে না যে আমি যেমন ইচ্ছে করলেই তোমার কাছে চলে আসতে পারি তেমনি আমি যদি একা কোন

জায়গায় থাকি তাহলে তুমিও আমার কাছে ঐ রকম হঠাৎ চলে যেতে পারবে।

শকুন্তলা—[খুশিতে] এইবার তা পারা যাবে। ওঃ! আই অ্যাম সো হ্যাপি।

[সুধীর আবার শকুন্তলার দিকে হাত বাড়ায়। এই বার শকুন্তলা তার হাতটা ধরে।]

সুধীর—আঃ—তোমার হাতটা কি সুন্দর ঠান্ডা।

শকুন্তলা—একি। সুধীর, তোমার তো দেখছি খুব জ্বর হয়েছে।

সুধীর—হোক্‌গে—তুমি এসো। তোমাকে আমি—তুমি ছাড়া আজ থেকে আমার আর কেউ রইল না।

শকুন্তলা—[গলা ঐ রকম চাপা] তুমি খুব সুন্দর। একদিন দেখো, আমি তোমাকে দেশের একজন বিখ্যাত লোক করে তুলবো।

সুধীর—কে চায় বিখ্যাত লোক হতে? আমি চাই না। কেবল তুমি আর আমি—

শকুন্তলা—নিশ্চয়ই, তুমি যত বিখ্যাত হবে—সে তুমি কবিই হও নেতা বা যাই হও না কেন—ততই দেখবে আমরা কতো বেশী খুশী হবো।

সুধীর—না, আমি কিছু হতে চাই না।

শকুন্তলা—কবি হতে চাও না? তবে কি চাও?

সুধীর—কী জানি।

শকুন্তলা—না, না, সুধীর তোমাকে যে—

সুধীর—[এক হাত দিয়ে বেষ্টন করে] থাক্‌। তুমি কাছে এসো—আমার মাথায় লাগছে।

শকুন্তলা—[কাছে আসতে আসতে] উঃ, তোমার নিশ্বাস কি গরম। না না সুধীর, ইউ শুড গো টু আ ডক্‌টর।

সুধীর—না—[ওকে জড়িয়ে ধরতে যায়। পেছনের ঘরে জুতোর আওয়াজ। কমলের গলা]

কমল—সুধীর! সুধীর!—সরি টু ডিসটার্ব ইউ।—সুধীর, তোমাকে একবার আমার সঙ্গে এক্ষুণি আসতে হবে।

সুধীর—কেন, তোমার হুকুম?

কমল—শকুন্তলা, তুমি তাহলে সুধীরকে একটা হুকুম দাও আমার সঙ্গে যেতে।

শকুন্তলা—[অত্যন্ত রেগে] তোমার এই ধরনের কথা আমার ভালো লাগে না, কমল। হোয়াই ডিড ইউ কাম ব্যাক? অ্যান্ড ইউ শুড বি সরি টু ডিস্টার্ব আস্‌।

কমল—ওঃ। সুধীর আমার সঙ্গে তোমাকে একবাব যেতে হবে—তোমার মাসীমনি—

সুধীর—অনুতপ্ত। ভালো, আমি যাবো না।

কমল—মৃন্ময়ীদি—

সুধীর—[অধৈর্য হয়ে] তাঁকে গিয়ে বলো যে যত শীঘ্র সম্ভব সুর্যকাকাকে তিনি বিয়ে করুন, তারপর আমি যাবো।

কমল—সুধীর।

সুধীর—আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না কমল, যে তোমার এ ব্যাপারে এতো উৎসাহ কেন? অথবা এটা একটা মেয়েলী স্বভাব। এক্ষুণি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা সেন্টিমেন্টাল মিলনান্তক সিন না করালে ভালো লাগছে না?

শকুন্তলা—সত্যি কমল, তিনি যদি অনুতপ্ত হয়েই থাকেন—তা সময় তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। সুধীর পরে যাবে।

কমল—[হঠাৎ যেন একটা গোঁয়াতুমিতে তাকে পেয়ে বসে] না, সুধীরকে এক্ষুণি, এই মুহূর্তে যেতে হবে। সুধীর—[সুধীরের হাত ধরতে চায়, শকুন্তলা মাঝখানে দাঁড়ায়]।

শকুন্তলা—না, হবে না।

সুধীর—এখানে দাঁড়িয়ে সিন করতে আমি তোমাকে দেব না। তাঁর দুঃখ দেখে তোমার মন যদি এতো বিচলিত হয়ে থাকে তাহলে তুমি স্বচ্ছন্দে তাঁর মাতৃ-স্নেহ উপভোগ করতে পারো—আমি আপত্তি করবো না।—নাউ ইউ ক্যান গো।

কমল—এর উত্তরে আমার উচিত এক চড়ে তোমার ঐ মুণ্ডুটা ঘুরিয়ে দেওয়া! কিন্তু যাক্—ভেবেছিলাম তোমাকে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে কথাটা বলবো আস্তে আস্তে। কিন্তু তা তুমি দিলে না। [শকুন্তলার দিকে ফিরে] আউট অব্ সুধীর, তুমি এ যুগের এক চমৎকার সাবালক তৈরী করেছো—যার একমাত্র কাজ হচ্ছে যা ইচ্ছে তাই করা অথবা তোমার ইচ্ছায় কাজ করা এবং নিজের সামান্য অসুবিধার জন্যে রাগ দেখানো। আর—

শকুন্তলা—[চীৎকার করে] কমল ইউ আর—

কমল—থামো! সুধীর, তুমি আসবার সময় তোমার মাসীমনিকে কি-ধাক্কা দিয়ে ফেলে এসেছিলে?

সুধীর—তুমি কি করে জানলে?

কমল—আমি আর অনু যখন সেখানে পৌঁছুলাম তখনও তাঁর জ্ঞান ছিলো একটু। তিনি বলছিলেন—'খোকার খুব লেগেছে—যাবার সময় দরজাটা ওর মাথায় এমন ভাবে ঠুকে গেল!' কিন্তু একটু পরেই তিনি অজ্ঞান হয়ে গেলেন। সেই অবস্থাতেই আমরা দু'একবার শুনলাম তিনি বলছেন—খুব আস্তে—'খোকা, তোর কি খুব লেগেছে?'—তারপর [গলা বুজে আসে]

সুধীর—তারপর?

কমল—তারপর সেটুকু বলবার ক্ষমতাও তাঁর ছিলো না। আমরা তাড়াতাড়ি

তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাই—সেখানে ডাক্তার এগ্‌জামিন করে বলেছে—সুধীর, [হঠাৎ প্রচণ্ড চীৎকার করে ওঠে] তোমার মাসীমনি বোধহয় আর বাঁচবেন না। [শেষের দিকে গলা ভেঙ্গে যায়। একটু চুপ]—এইটুকু বলবার ছিলো। চললাম।

সুধীর—[গলা ভেঙ্গে গেল যেন] কমল, কোন্ হাসপাতালে?

কমল—তা জেনে তো তোমার কোন দরকার নেই। এই তো কেমন চাঁদের আলো এসে পড়েছে আর এই তো কেমন এক সুন্দরী তোমার কাছে রয়েছে। এই সময়টা হাসপাতালে নষ্ট করা কি উচিত? [শকুন্তলার দিকে ফেরে] শকুন্তলা, অনু শ্রীশকে ভালবাসে—সেটা সাইকোলজিক্যাল গোলমাল। সুধীরের মাসীমা সুধীরকে ভালবাসেন—সেটা সাইকোলজিক্যাল গোলমাল—পৃথিবীর যাবতীয় সম্পর্কে সাইকোলজির গোলমাল। কেবল গোলমাল নেই তোমাদের সম্পর্কে! ওঃ হোঃ হোঃ—এটা যে ফিজিক্যাল সম্পর্ক, সাইকোলজিক্যাল নয় তো, চমৎকার! [বেরিয়ে যায়]

শকুন্তলা—কমল, শোন কমল! ডিড হি কিল হার অর ওয়াজ ইট অ্যান অ্যাকসিডেন্ট? [বেরিয়ে যায়]

[একলা সুধীর। মোমবাতি জ্বলছে। হঠাৎ দুই হাত দিয়ে মুখ ঢেকে সুধীর বসে পড়ে। কোথা থেকে যেন আস্তে আস্তে আওয়াজ আসে—'খোকা তোর কি খুব লেগেছে?—'খোকা তুই যাসনি'…'খোকা'!—দুই তিনবার করে কথাগুলো যেন ভেসে বেড়ায়। শকুন্তলা আসে, আস্তে সুধীরের মাথায় হাত রাখে।]

শকুন্তলা—সুধীর, কেন মন খারাপ করছো—অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট।

[সুধীর আস্তে আস্তে মুখ তোলে। সে মুখ যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট]

শকুন্তলা—সুধীর!

সুধীর—উঃ?

শকুন্তলা—কমল তো বললো এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট মাত্র।

সুধীর—আমি যাই। [উঠে পড়ে। পরমুহূর্তে আবার বসে পড়ে] না, আমি গিয়েই বা কি করবো!

শকুন্তলা—তাই তো! তাছাড়া কমলকে আমি বলেছি সে খবর দেবে।

সুধীর—খবর? কী খবর? মাসীমনি মরে গিয়েছে—সেই খবর?—আমি যাই। [উঠে পড়ে]

শকুন্তলা—[ওর হাত ধরে ফেলে] সুধীর, পাগলামি করো না।

সুধীর—ছাড়ো আমি যাই। হ্যাঁ, কোন্ হাসপাতালে কমল বলেছে?

শকুন্তলা—[হাত ছেড়ে দেয়] পি. জি.।

[সুধীর বেরিয়ে যায়। শকুন্তলা সুধীরকে উদ্দেশ করে বলে] সুধীর,

এসো কিন্তু আবার।

[শকুন্তলা একলা ঘুরে বেড়ায়। তারপর যেন বিরক্ত হয়]

শকুন্তলা—নন্‌সেন্‌স্‌। কি যে করি এখন? সব প্রোগ্রাম আপসেট অ্যান্ড দিস্‌ রেচেড্‌ ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই! সহদেব—সহদেব। [সহদেব এসে দাঁড়ায়]—আর একটা মোমবাতি নিয়ে আয়—না শোন—দুটো, দুটো নিয়ে আয়।

[সহদেব বেরিয়ে যায়। শকুন্তলা গুন গুন করে গান গাইতে চেষ্টা করে। তারপর হঠাৎ বলে—]

শকুন্তলা—ধুর! তাই বলে এতক্ষণ অন্ধকার ভালো লাগে না! [আবার একটু চুপ] ইট সিমজ্‌ অ্যালোন, আই কান্ট স্ট্যান্ড ডার্কনেস—সহদেব—সহদেব! [সহদেব আবার আসে] তোর কাছে কোন একটা কয়েন আছে?

সহদেব—আজ্ঞে?

শকুন্তলা—তোর কাছে কোন পয়সা আছে?

সহদেব—আজ্ঞে, একটা দশ নয়া আছে।

শকুন্তলা—দে তো! [সহদেব ট্যাঁক থেকে বার করে পয়সা দেয়] যা, পরে নিস্‌ [সহদেব চলে যায়] যদি হেড্‌ হয় তাহলে সুধীর আসবে আর যদি টেল্‌ হয়···

[পয়সাটা ছুঁড়ে দেয়। দূর থেকে শ্রীশের গলার আওয়াজ আসে—'কি বললে—বারান্দায়? ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়।' শকুন্তলা একটা চেয়ারে চুপ করে বসে]

শ্রীশ—এই যে বিরহিনী শকুন্তলা! কী ব্যাপার? একা?

শকুন্তলা—শ্রীশ! এসো, এসো। এই অন্ধকারে একা একা কেমন লাগছিলো।

শ্রীশ—সত্যিই তো! এই রকম একটা জ্যোৎস্না উপভোগ করার চান্স ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই করে দিলো! তা তোমার ভরতমুনি কই?

শকুন্তলা—কেন? তাকে তোমার কি দরকার?

শ্রীশ—তোমার এই এক্‌স্‌পেরিমেন্ট আর কত দিন চলবে?

শকুন্তলা—যতদিন ইচ্ছে।

শ্রীশ—আমার ইচ্ছে নয়।

শকুন্তলা—জেলাস?

শ্রীশ—আমি? জেলাস! না—সে সময় বা উৎসাহ আমার নেই।

[শকুন্তলা খিল খিল করে হেসে ওঠে। শ্রীশ এগিয়ে এসে এক হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে অন্য হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরে]

শ্রীশ—ওরকম হাসবে না।

[শকুন্তলা একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়।—সহদেব মোমবাতি নিয়ে

ঢুকে একটু যেন অপ্রস্তুত হয়]

শ্রীশ—আবার দুটো মোমবাতি কেন ?] কাছে গিয়ে ফু দিয়ে দুটোই নিভিয়ে দেয়।] যাও। [সহদেব বেরিয়ে যায়]

শকুন্তলা—শ্রীশ, তুমি চা খাবে তো ?

শ্রীশ—চা ? নাঃ, ওটা তুমি সুধীরের জন্যে রেখো। আমার আর একটু কড়া জিনিসের দরকার।

শকুন্তলা—কফি ?

শ্রীশ—না, আরও একটু কড়া।

শকুন্তলা—শ্রীশ !

শ্রীশ—এতে তোমার আশ্চর্য হবার কিছু নেই। বিশেষ করে তোমার বা আমার। আমরা ছোটবেলা থেকেই কি কক্‌টেল পার্টির আয়োজনের জন্যে মা কিংবা বাবাকে ব্যস্ত হ'তে দেখিনি। কেন ? এই তো সেদিন—মহারাজকুমার চৌধুরীর পার্টিতে মহারাজকুমারের পীড়াপীড়িতে তোমার বাবাই তোমাকে একটা মাইল্ড ড্রিংক করবার অনুমতি দিয়েছিলেন—দেননি ?

শকুন্তলা—[মৃদু হেসে) এতো খবর রাখো আমার সম্পর্কে !

শ্রীশ—তোমার খবর রাখতে হয় না, আপনি আসে। তাইতো তোমার সম্পর্কে আমার এতো আগ্রহ।

শকুন্তলা—তাই নাকি ? এই ছমাসে তোমার দেখছি অনেক উন্নতি হয়েছে।

শ্রীশ—উন্নতি ? নিশ্চয়ই ! শ্রীশ জন্মেছে উন্নতি করতে—বড়ো হতে—দেশের, সমাজের মাথায় পা দিয়ে চলবার জন্য। ঐ মেয়েদের শাড়ীর আঁচলে মুখ লুকিয়ে নির্জলা কাব্যপ্রীতি দেখাবার জন্যে নয়।

শকুন্তলা—ওঃ ডিয়ার ! ডিয়ার ! সত্যি, মনে হচ্ছে তুমি একটা সাংঘাতিক কিছু না করে ছাড়বে না।

শ্রীশ—সাধারণ লোকের ওপর যেতে গেলে সাংঘাতিক কিছু করবারই দরকার হয়। আর তাই তোমাকে আমার একটু দরকার।

শকুন্তলা—দরকার ? বলতেই হবে শ্রীশ তুমি আমাকে কৌতূহলী করে তুলছো। তোমার দরকারের মানেটা শুনতে ইচ্ছে করি।

শ্রীশ—তোমার বাবা যেরকম ইনফ্লুয়েনশিয়াল লোক এই ফিল্ড-এ, আমার মনে হয় যে এব্যাপারে তিনি আমাকে অনেক সাহায্য করতে পারেন।

শকুন্তলা— একটু হতাশ হয়ে] ওঃ।

শ্রীশ—দেখো, আমি ফাস্ট ক্লাস ফাস্ট হবোই—

শকুন্তলা—সো সিওর ?

শ্রীশ—নিশ্চয়ই—সিওর না হয়ে বলতাম না। আর আমাদের বনস্পতি বিজনেস্‌-এ এবার অকল্পনীয় লাভ হয়েছে। সেই খবরটা দেবার জন্যেই বিকেলে

তোমাকে ফোন করেছিলাম।

শকুন্তলা—তাই নাকি ?

শ্রীশ—হ্যাঁ, ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হবার পর আমি বিদেশ যাচ্ছি ট্রেনিং নিতে। মা বলেছেন সমস্ত খরচ দেবেন। বাই দি ওয়ে, আমার জন্যে একটা আলাদা গাড়ী কেনা হচ্ছে।

শকুন্তলা—তাই নাকি ? কী গাড়ী ?

শ্রীশ—জানি না এখনোও। আমি বাবাকে বলেছি ছোট কোন গাড়ী কিনতে। কলকাতায় বড় গাড়ীর কোন মানে হয় না। তাই না ?—আমি বলেছি এই অস্টিন কেম্ব্রিজ কিম্বা সানবীম—ঐ রকম কোন একটা আর কি !

শকুন্তলা আচ্ছা ?

শ্রীশ—তারপর বিদেশ থেকে ফিরে এসে সীরিয়াসলি পলিটিক্স্ এ নামবো।

শকুন্তলা—ভালো, ভালো—খুব ভালো। কিন্তু বিদেশ মানে কোথায় ?

শ্রীশ—কোথায় নয় ? একটা জায়গা নাকি ? লন্ডন, প্যারিস, ভিয়েনা, রোম, ওদিকে নিউ ইয়র্ক এমন কি মস্কো যাবারও ইচ্ছে আছে।

শকুন্তলা—কিন্তু ফরেন এক্স্চেঞ্জ ?

শ্রীশ—ওর জন্যে আবার আটকায় নাকি ?

শকুন্তলা– তা বটে ! তোমার বাবার তো বোধহয় পৃথিবী শুদ্ধ লোকের সঙ্গে আলাপ। তা তোমার জয়যাত্রা সফল হোক। কত দেশের কত সুন্দরী ভীড় করবে তোমাব পাশে। তবে শুনেছি ইংলন্ডের চেয়ে কন্‌টিনেন্ট-এর মেয়েবা বেশী ফ্রী—বিকিনি বোধহয় কন্‌টিনেন্ট-এই বেশী চলে।

শ্রীশ—জেলাস ?

শকুন্তলা—নাঃ, আমার জেলাস হবার সময় বা উৎসাহ নেই।

শ্রীশ—দেখছো তাহলে তোমাব সঙ্গে আমার কত মিল ? তবে কন্‌টিনেন্ট-এর সমস্ত বিকিনি পরা মেয়েরা শ্রীশ কুণ্ডুর কাছে তুচ্ছ হয়ে যেতো যদি—

শকুন্তলা—যদি ?

শ্রীশ—যদি শ্রীমতী শকুন্তলা চ্যাটার্জী আমার সঙ্গে থাকতেন।

শকুন্তলা—অর্থাৎ ?

শ্রীশ—ইচ্ছে করলে তুমিও যেতে পারো আমার সঙ্গে !

শকুন্তলা—[সকৌতূহল হেসে] কি করে ?

শ্রীশ—আমাকে বিয়ে করে।

শকুন্তলা– তোমাকে বিয়ে করে ? ভাবতে হবে।

শ্রীশ—কারণ বিয়ে না করলে তোমার বাবা আমার সঙ্গে যেতে দেবেন না। আমার মাও সন্দিগ্ধ হবেন এবং খরচ দিতে কুণ্ঠিত হয়ে উঠবেন। অথচ আজই যদি আমরা বলি বিয়ে করব তাহলে আমার মনে হয় তোমার বাবা এবং আমার

বাবা-মা—আমরা ভালো বিজনেস করেছি বলে খুশী হবেন। আর আমার মাতা অকুণ্ঠ চিত্তে আমাদের সকল খরচ জুগিয়ে যাবেন।—কি হলো, কী ভাবছো ?

শকুন্তলা—কিন্তু সুধীর ? সেটা তোমার কাছে একটা কাঁটার মতো—

শ্রীশ—[অসহিষ্ণু] ড্যাম্ সুধীর। আমি তো তোমাকে বলেছি—ও সমস্ত ঈর্ষার হৃদয়াবেগ আমার নেই। আর তাছাড়া আজ থেকে দশ বছর পরে দেখবে—তুমি-আমি জীবনধারণের যে মান ঠিক করে দেবো তোমার ঐ সুধীরেরা নির্বিবাদে মানবে। দেখনি—তোমরা যখন চুলের ফ্যাশান—ঐ যে কি বলে—টপ-নট করে দু'বছর পরে বাতিল করে দিলে তখন ঐ সুধীরের মত ফ্যামিলির মেয়েরা টপ-নট্ সুরু করলো।

শকুন্তলা—সত্যি! ওরা কি করতে পৃথিবীতে জন্মায়। আশ্চর্য! ওদের কোন অ্যামবিশান নেই!

শ্রীশ—কিন্তু ওদের জন্মানো দরকার—বাঁচাও দরকার! তাতে আমাদেরই কাজ করবার সুবিধে।

শকুন্তলা—ঠিক বলেছো। [হঠাৎ হেসে ওঠে]

শ্রীশ—কি হলো ?

শকুন্তলা—নাঃ। এই অন্ধকারে কথাগুলো বেশ কেমন কন্‌স্‌পিরেসির মতো শোনাচ্ছে, না ?

শ্রীশ—কন্‌স্‌পিরেসি ? মানে ?

শকুন্তলা—ষড়যন্ত্র! অন্তত কমল শুনলে তাই বলতো।

শ্রীশ—আই সি! এখন কি সুধীর ফেজ্ শেষ হয়ে কমল ফেজ্ শুরু হলো ?

শকুন্তলা—[হেসে] ডোন্ট বি রিডিকিউলাস। বরং ওব ঐ সুপিরিয়র ভাবটা আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। আমার এক এক সময়ে মনে হয়—ওকে বোধহয় আমি ঘৃণা করি। যাক্‌গে। লেট্ আস প্রসিড উইথ আওয়ার ষড়যন্ত্র!

শ্রীশ—না, সন্ধি!

শকুন্তলা—অন্ধকারে ষড়যন্ত্র জমে ভালো। মোরওভার তোমার ষড়যন্ত্রের কথাগুলো চার্মিং।

শ্রীশ—ঠাট্টা করছো ?

শকুন্তলা—মোটেই না—আই মিন ইট।

শ্রীশ—সত্যি ?

শকুন্তলা—তিন সত্যি!

[হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে। দূরে আবার একটু হৈচৈ। শ্রীশ হেসে ওঠে]

শকুন্তলা—তোমারই জিত হলো। বল কি সন্ধির কথা বলবে।

শ্রীশ—আমার ষড়যন্ত্র যদি চার্মিং হয় তবে আমার সন্ধির কথায় দরকার ?

শকুন্তলা—হঠাৎ এই আলোটা বিশ্রী লাগছে না? কমল শুনলে বলতো—বিবেকের সামনাসামনি হ'তে হচ্ছে কিনা তাই।

শ্রীশ—আবার কমল!

শকুন্তলা—তুমি যা ভাবছো তা নয়, শ্রীশ। কমলরা ভাবে কি জানো? ভাবে বিবেকের সমস্ত সংজ্ঞা ওরা ঠিক করে দেবে। হুঁ!

শ্রীশ—ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর ঘরে বিবেকানন্দের একটা ছবি দেখেছিলাম বটে একদিন। ও জানে না যে বিবেকানন্দরা খুব বুড়ো হয়ে গিয়েছেন—অচল! কিন্তু আমি তোমাকে বলছি—দশবছর পরে সব বদলে যাবে। তখন ঐ কমলকে—

শকুন্তলা—প্লিজ আলোটা নিভিয়ে দেবে শ্রীশ? [শ্রীশ আলোটা নিভিয়ে দেয়। মোমবাতি জ্বলছে]

শ্রীশ—লেট আস্ নট ডিসকাস এ্যাবাউট দোজ পিগমিজ্।

শকুন্তলা—তবে কমলকে আমি সহজে ছাড়বো না। ওর বোঝা উচিত ছিলো যখন তখন শকুন্তলা চ্যাটার্জীকে অপমান করা যায় না।

শ্রীশ—অপমান?

শকুন্তলা - [অদ্ভুত মিষ্টি হেসে] এই দেখো, আবার আমরা ওদেরই কথা আলোচনা করছি। [হঠাৎ অধীর হয়ে ওঠে] ওঃ শ্রীশ! আমার এই ঘর ছেড়ে বাইরে কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে। কোথাও যাবে বেড়াতে?

শ্রীশ—আমি জানতাম যাবে। গাড়ী আছে আমার সঙ্গে।

শকুন্তলা আছে? ও।

শ্রীশ—হ্যাঁ বাবার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এলাম। আজ তো বাবা খুব খুশী—অ্যাট ওয়ান্‌স্ রাজী!

শকুন্তলা—তাহলে চলো। [শ্রীশ ওর কোমর জড়িয়ে ধরে] সহদেব, আমি আজ বাড়ীতে খাবো না। [ঘুরে দাঁড়িয়েই সুধীরকে দেখতে পায়] একি, সুধীর তুমি?

সুধীর—অসময়ে এসেছি?—কিন্তু তুমি আমাকে আসতে বলেছিলে।

শকুন্তলা—ও!—সে—তা তোমার মাসীমা কেমন আছেন?

সুধীর—মারা গেছেন!

শ্রীশ—কে? কে মারা গেছে?

শকুন্তলা—সুধীরের মাসীমা!

শ্রীশ—ভেরী স্যাড।

শকুন্তলা—ইয়েস, ভেরী স্যাড।

সুধীর—ইটস্ নট জাস্ট স্যাড! [গলা ভেঙ্গে যায়] শ্রীশ, তুমি বুঝতে পারবে না; কারণ তুমি তো জানো না! শকুন্তলা, তুমি জানো! ইউ শুড নট সে দ্যাট—ইটস্ জাস্ট স্যাড, না! স্যাড! স্যাড! জানো কি

করেছো ? ওঃ [মাথাটা চেপে ধরে। আবার কোথা থেকে সেই আওয়াজ আসে 'খোকা, তোর কি খুব লেগেছে ?' তার ওপরেই শকুন্তলা বলে ওঠে—]

শকুন্তলা—ওঃ—এখন বুঝি সব দোষ আমার ?

সুধীর—নাঃ, আমার। আমি বোকা – তাই আমি তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম —ভালোবেসেছিলাম। তুমি আসতে বলেছিলে তাই আবার এসেছিলাম। বুঝতে পারিনি যে সমস্তটাই তোমার কাছে একটা সাইকোএনালিসিসের খেলা! মাসীমনি মারা গেছেন—সেটা তোমার কাছে জাস্ট একটা স্যাড ব্যাপার—ওনলি স্যাড (হঠাৎ গলা নেমে যায়) কিম্বা হাস্যকর ? শকুন্তলা তিনি তো বিকৃত রুচির মহিলা ছিলেন, না ? তিনি যে আমাকে ভালবাসতেন, সেটার তো একটা খারাপ উদ্দেশ্য ছিলো, তাই না ? তবে হোয়াই শ্যুড ইউ বি ইভ্‌ন্ স্যাড ? তোমার তো খুশী হওয়া উচিত—হাসা উচিত! তোমার হাসির আর একটা খোরাক দিতে পারি, জানো ? যখন আমার চার বছর বয়স তখন একবার আমার সারা গায়ে বিষাক্ত পাঁচড়া হয়। বিছানায় শুলে পর্যন্ত লাগতো। তখন সারারাত আমার ঐ মাসীমনি আমাকে নিজের খালি বুকের ওপর শুইয়ে রাখতেন আর আমি ঘুমোতাম। কি কুৎসিত না ? হাসবে না একটু শকুন্তলা ? বলবে না তখন থেকেই তাঁর উদ্দেশ্যে গোলমাল ছিলো ?

শকুন্তলা—সুধীর, এ সব কি কথা ? – তুমি যাও !

সুধীর— বুঝতে পারছো না ? এ সব কথা তো তোমার জানা উচিত শকুন্তলা ! খালি একটা কথার মানে তুমি বোঝো না। সেটা হচ্ছে স্বার্থত্যাগ। তোমাদের সমাজে—মানে ওটা হাস্যকর অর্থহীন কথা। আর তাই তোমাদের ডিক্‌শ্‌নারীতে ওই কথাটাই তোমরা বাদ দিয়ে দিয়েছো। কারণ তোমাদের কাছে সবটাই যে বিজ্‌নেস-‐অ্যামবিশান !

শকুন্তলা—সুধীর !!

সুধীর—যখন তোমার তাড়নায় আমি উৎসাহ করে মাসীমনির গল্প বলেছি তাঁর স্বার্থত্যাগের কথা বলেছি তখন তুমি হেসেছো আর তাঁর সাইকো-এনালিসিস করে আমাকে বলে দিয়েছো—তাও আবার সব সময় নিজের নাম করে বলবার সাহস-হয়নি—অপরের—

শকুন্তলা—সুধীর কী যা তা বলছো ?

সুধীর—আর আমি বোকার মত তাই—! শকুন্তলা, তোমাকে কি বলে অভিশাপ দেওয়া যায় ? কবে তোমাদের জাত নিশ্চিহ্ন হবে বলতে পারো ?

শকুন্তলা—থামো ! আমাদের জাত যদি এতো খারাপ হয় তো আসো কেন আমাদের কাছে হ্যাংলার মতো ? [রাগে কাঁপতে থাকে] নিজে তাকে খুন

করেছো—এখন—

সুধীর—কি বললে? ঠিক! ঠিক! আমি তাকে খুন করেছি [গলা চিরে যায়] ঠিক, ওঃ। আমি যদি তোমাকেও খুন করতে পারতাম কুন্তী!

শ্রীশ—হোয়াট ইজ্ দিস? হি ইজ্ ম্যাড!

সুধীর—কি বললে? না এখনো পাগল হ'তে পারছি না; কিন্তু যদি পারতাম! দেখি যদি তাই পারি! [বেরিয়ে যায়]

শ্রীশ—লোকটা বেশ একটা মেলোড্রামা করে গেল। কি ব্যাপারটা কি?

শকুন্তলা—আমাকে নিয়ে বেড়াতে যাবে না শ্রীশ?

শ্রীশ—নিশ্চয়ই—দে কান্ট্ আপসেট আওয়ার প্রোগ্রাম! কিন্তু ব্যাপারটা কি?

শকুন্তলা—চলো, যেতে যেতে বলছি। সহদেব!

[সহদেব এসে দাঁড়ায়। বোঝা যায় দরজার পাশেই সে অপেক্ষা করছিলো] আমি বাড়ীতে খাবো না।

সহদেব—তাহলে খাবার সব?

শকুন্তলা—ফেলে দিস। জায়গাটা পরিষ্কার করে রাখিস। আর এইখানে খামের মধ্যে কিছু বাজে কাগজ আছে ঐগুলোও ফেলে দিস। চলো [হাতে হাত রেখে ওরা বেড়িয়ে যায়। সুধীরের কবিতা লেখা খামদুটো মেঝেয় পড়েছিল – সহদেব সে দুটো হাতে নিয়ে ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট-এ ফেলে দেয়। সুধীরের খাওয়া সিগারেটটাও ফেলে দেয়। তারপর বারান্দার বাইরের দিকের পর্দা—অর্থাৎ দর্শকদের দিকের পর্দাটা টেনে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আসল পর্দাও নেমে আসে] □

[লেখিকার তিরোধানের প্রায় বিশ বছর আগে রচিত]

বিদ্রোহিণী

॥ চরিত্রলিপি ॥

রানী : ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ
দামোদর : রানীর দত্তক পুত্র
মোরোপন্ত : লক্ষ্মীবাঈ-এর বাবা
রাও আপ্পা : সভাসদ
রঘুনাথ সিং : সভাসদ
খোস খাঁ : সেনাপতি
লছমন রাও : মন্ত্রী
লালাভাও : সেনাপতি
গুলমুহাম্মদ : দেশীয় রাজা
নবাব : বান্দার নবাব
তাঁতিয়াটোপী : নানাসাহেবের সেনাপতি
রাও সাহেব : পেশবা রাজা
জয়পুরেওয়ালা : ঝাঁসির বণিক
লক্ষ্মীচাঁদ : ঐ
কালে খাঁ : সৈন্য
বখশীশ আলি : ঐ
দলীপ : রাজপুত সর্দার
জবাহর : ঐ
খুদাবক্স : ঐ
কুঁয়ার : ঐ
গোপাল রাও : সিরেস্তাদার
শঙ্কর শাহ : গোণ্ডরাজ্যের রাজা
রঘুনাথ শাহ : ঐ পুত্র
ঘোষক, প্রহরী, দূত, চর, দ্বারী, সৈনিক ও অন্যান্য।

কিষাণ : বুন্দেলখণ্ডী কৃষক
মেয়েটি : বাঙালী ট্যুরিস্ট

চিমাবাঈ : লক্ষ্মীবাঈ-এর সৎমা
সুন্দরবাঈ : অন্তপুরিকা
হীরা : ঐ
ঝলকারী : ঐ
জুঁহী : ঐ
মেয়ে : ঐ
কাশীবাঈ : নারী সৈন্য
মান্দার : নারী সৈন্য
মোতি : শিল্পী
গঙ্গুবাঈ : ঐ
স্ত্রী : পরিচারিকা

এ্যালিস : ইংরেজ শাসক
মার্টিন : ঐ সেনাপতি
হিউরোজ : ঐ কমাণ্ডার
আরস্কাইন : ঐ সেনাপতি
ক্যাপ্টেন ক্লার্ক : ঐ
হ্যামিলটন : ঐ
ক্যামবেল : ঐ
স্টুয়ার্ট : ব্রিগেডিয়ার
ক্যাপ্টেন, সৈন্য, কেরানী, হাবিলদার ও অন্যান্য।

[পর্দা ওঠবার আগে থেকেই একটা গান শোনা যাচ্ছে—

'পত্থর মিট্টিসে ফৌজ বনাই
কাঠমে কাটোয়ার ;
পাহাড় উঠাকে ফৌজ বনাই
চলি গোয়ালিয়র।'

পর্দা উঠলে দেখা যায় একজন বুন্দেলখণ্ডী কিষাণ আর একটি মেয়ে কথা বলছে—]

কিষাণ—না, না, তোমরা যারা লেখাপড়া শিখেছ তারা অনেক কিছু বিশ্বাস করো না, তোমরা দু পাতা ইংরেজী পড়ে এই ধরতীটাকে যেন কিনে ফেলেছ, কলেজে পড়ে খুব তো জ্ঞানী হয়েছ। ঐ জ্ঞান তোমাকে কি দিয়েছে শুনি ?

মেয়েটি—মানে ? অনেক কিছু দিয়েছে আমি অনেক কিছু জানতে পেরেছি। এই পৃথিবীটা কেমন, কোথায় কি ঘটছে—এর অগ্রগতি—

কিষাণ—ওসব কথা না, ও সব কথা না। অনেক পড়াশুনা করিয়ে ঐ কলেজ ইস্কুল তোমাকে কি বিশ্বাস দিতে পেরেছে ? না কি এক অবিশ্বাসী কিম্ভূত জীব তৈরী করেছে ?

মেয়ে—অবিশ্বাসী ? তা হ্যাঁ, একটু সন্দেহ মনে না থাকলে আমি সত্য জানব কি করে ?

কিষাণ—সত্যটা কি ? বিশ্বাস না থাকলে সত্য জানতে পারবে না।

মেয়ে—গোয়ালিয়রের যুদ্ধে রানী মারা গিয়েছিলেন তো ?

কিষাণ—না, লজ্জায় ঘেন্নায় রানী এই বুন্দেলখণ্ডের পাথর আর মাটির ভেতর লুকিয়ে গেলেন। পাথর আর মাটি তাকে মায়ের মত লুকিয়ে রাখল নিজের কাছে, রানী যে খুব অভিমানিনী ছিলেন। তোমরা বিশ্বাস করবে না কিন্তু জ্যোৎস্নারাতে আমরা দেখতে পাই কাল্পীর পথে ঘোড়া ছুটিয়ে রানী চলেছেন—হাতে তরবারি, কোলের কাছে তাঁর শিশুপুত্র, মাথায় তাঁর পাগড়ী, গলায় মুক্তার মালা ঝলমল করছে। আবার তুমি ঝাঁসি যাও, আধো জ্যোৎস্নায় অনেক রাতে দেখবে কেল্লার শিখরে রানী দাঁড়িয়ে আছেন, গায়ে যুদ্ধের পোশাক, কাছে এসে দাঁড়াবে তাঁর শিশুপুত্র। রানী বিষণ্ণ মুখে অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন তাঁর ঝাঁসির দিকে। তারপর শিশুপুত্রকে আস্তে করে কোলে নিয়ে চলে গেলেন—এ যে কত বড় সত্যি তোমরা বুঝবে না—গান শুনতে পাচ্ছ, গান ?—

[কিষাণ নিজেও পেছনের গানের সঙ্গে গলা মেলায়—পত্থর মিট্টিসে

ফৌজ···মেয়েটি এগিয়ে আসে সামনে, দর্শকদের বলে—]

মেয়েটি—যে শিশুপুত্রের কথা এরা বলে, সে কিন্তু ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈএর নিজের ছেলে ছিল না। দত্তক পুত্র, ষোল বছর বয়সে রানীর নিজের একটি ছেলে হয়েছিল কিন্তু মাত্র তিন মাস বয়সে সে মারা যায়। দুবছর পর রাজা গঙ্গাধর যখন মৃত্যুশয্যায় তখন দত্তক নিলেন—আনন্দ রাওকে—নাম রাখলেন মৃত পুত্রের নামে দামোদর। ঝাঁসির ইংরেজ প্রতিনিধি মেজর এ্যালিস মরণাপন্ন রাজাকে বারবার আশ্বস্ত করেছিলেন যে তাঁর দত্তক পুত্রকে ঝাঁসির উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করা হবে। এবং তার নাবালক অবস্থায় রানী অভিভাবিকা হয়ে রাজ্য শাসন করবেন। কিন্তু বড়লাট ডালহৌসী তখন ডকট্রিন অব ল্যাপস এই আইনের ছুতোয় একটার পর একটা ভারতীয় রাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্যের আওতায় নিয়ে আসছিলেন। তাই এ্যালিসের কথায় কর্ণপাত করা হোল না। রানী যেদিন দরবারে সাগ্রহে সভাসদবৃন্দ এবং দামোদরকে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন সুখবরের জন্য—তখন ডালহৌসীর নির্দেশে—

[এই কথা বলতে বলতে পর্দা সরতে থাকে—গানের সঙ্গে অন্য সঙ্গীত মিশে যায়—এ্যালিসের গলা ভেসে আসে—তারপর দরবার কক্ষে দেখা যায় এ্যালিস আদেশপত্র পড়ছেন।]

[মাইকে ভেসে আসে আদেশপত্র পড়া। পর্দা সরতে থাকে।]

এ্যালিস পড়ছেন—ম্যালকমের বিজ্ঞপ্তি ২০শে নভেম্বর ১৮৫৩, আকস্মিকভাবে দত্তক পুত্র গ্রহণ করে ২১শে নভেম্বর ১৮৫৩ গঙ্গাধর রাওয়ের মৃত্যু হওয়াতে আমি নিম্নোক্ত মর্মে গভর্ণরের আদেশ পেয়েছি ঃ—

ঝাঁসির দত্তক বিধান অনুমোদিত হয়নি। স্বত্ব বিলোপের ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার ঝাঁসিকে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

বর্তমানের জন্য আমি মেজর এ্যালিসকে ঝাঁসির শাসক নিযুক্ত করেছি। ঝাঁসির সর্বসাধারণ ব্রিটিশ সরকারের অধীন এবং রাজস্ব মেজর এ্যালিসের কাছে দেয়—

[লক্ষ্মীবাঈ চিকের আড়ালে উঠে দাঁড়ালেন। সভার সকলে তার দিকে বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে আছে]

রানী—মেরী ঝাঁসি নেহি দুংগী [স্তব্ধতা]

এ্যালিস—আমার গভর্ণরের কাছ থেকে যে আদেশ আমি পেয়েছি তাই আপনাকে পড়ে শোনালাম।

রানী—এ্যালিস, সাহাব এই তিনমাস ধরে আপনি আমাকে বলে গেছেন যে আমার এবং আমার পুত্রের কোনো ভয় নেই, তাহলে কি আমাকে মনে করতে হবে ইংরেজ মিথ্যে কথা বলে ?

এ্যালিস—রানী সাহেবা যদিও ইংরেজ তার কাজের কোনো কৈফিয়ৎ তার নেটিভদের দেয় না তবু আপনার ওপর আমার অসীম শ্রদ্ধার জন্য বলছি, আমার কথায় কোনো কপটতা ছিল না। আমি নিজে তাই মনে করেছিলাম যে দামোদর রাওয়ের রাজা হওয়া ঠিকই হবে এবং তিনি যতদিন নাবালক থাকবেন—আপনি হবেন শাসনকর্তা। কিন্তু আমার গভর্ণর যখন তা অনুমোদন করেননি তখন নিশ্চয় এর যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি।

রানী—কিন্তু মেজর সিন্ধিয়ার দত্তক নেওয়া কি করে আপনার গভর্ণর মানলেন?

এ্যালিস—আপনি ভুলে যাচ্ছেন পেশবা বাজীরাও-এর দত্তক নানা ধুন্দুপন্থকে আমরা স্বীকার করি না।

রানী—সেই তো আমার জিজ্ঞাস্য যে এক এক ক্ষেত্রে আপনাদের এক এক ব্যবহার কেন? যখন দত্তক নেওয়া হয় সেই অনুষ্ঠানে আপনি নিজে উপস্থিত ছিলেন, মার্টিন সাহেব উপস্থিত ছিলেন।

এ্যালিস—আপনাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য।

রানী—কেবল কর্তব্য? আমার স্বামীকে কি আপনি মৃত্যুশয্যায় কথা দেননি? আপনার চোখের ভাষা সেদিন বার বার আমাকে আশ্বস্ত করেনি?—বলুন।

এ্যালিস—আপনারা ভারতীয়রা বড্ড ভাবপ্রবণ। চোখের ভাষার গুরুত্ব আমরা দিই না। Doctrine of lapse—

রানী—কথাটা আমিও শুনেছি। সাদা কথায় যার অর্থ দাঁড়ায় প্রাচীন রাজ-বংশগুলিকে রাজ্যাধিকার থেকে বঞ্চিত করে—

এ্যালিস—আইনসম্মতভাবেই এটা করা হয়ে থাকে। ইংরেজ কোনো বে-আইনী কাজ করে না।

রানী—সমুদ্রপার থেকে এসে আপনারা যে এই রাজ্য গ্রাস করে চলেছেন আমাদের ভারতীয়দের কাছে এটাই অত্যন্ত বে-আইনী কাজ বলে মনে হয়।

মোরোপন্ত—রানী!

আপ্পারাও—বাঈসাহেবা—

রঘুনাথ সিং—রানী—

এ্যালিস—আপনার এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার আমার আর কোনো ইচ্ছা নেই। আপনার যাতে একটা বৃত্তি ঠিক হয় সেজন্য আমি সুপারিশ করে পাঠাব।

রানী—তোমাদের বৃত্তিতে আমার দরকার নেই—আমার রাজ্য আমি ফিরে চাই।

এ্যালিস—আর আমার কিছু বলার নেই। আমি চললাম।

রানী—এ্যালিস সাহাব, একদিন আপনাদের ভাবতে হবে ঝাঁসি অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তোমরা ভুল করেছিলে—মাফ করবেন আমরা মারাঠীরা পরস্পরকে তুমি বলি তাই আপনি আজ্ঞেটা ভুল হয়ে যায়।

[এ্যালিস চলে যায়]

[রানী নেমে আসে। নিষ্ফল আক্রোশে কাঁপছে, মোরাপন্ত, নরসিংহ, আপ্পারাও সবাই এগিয়ে আসে। এই তিনজনকে ছাড়া রানী আর সকলকে চলে যেতে ইঙ্গিত করে।]

রানী—এ আমি সহ্য করবো না।

মোরাপন্ত—কিন্তু বাঈসাহেবা ভেবে দেখ—ইংরেজ মহাশক্তিশালী, তুমি কি করতে পার ?

রাওআপ্পা—ও কথা বলা বোধহয় আপনার উচিত হয়নি।

রানী—কোন কথা ?

রাওআপ্পা —ইংরেজের রাজত্ব করাটা বে-আইনী।

রানী—কথাটা কি সত্য বলে মনে করেন না আপনি ?

রাওআপ্পা—রাজনীতি আর সত্য কি এক জিনিস ?

রানী—[মৃদু হেসে] ঠিক। উত্তেজনায় আমার বিস্মরণ ঘটেছিল।

নরসিংহ—যদি সত্যি আপনাকে রাজ্য শাসন করতে হয় তবে অনেক ধৈর্য ধরতে হবে।

রানী—হ্যাঁ, অনেক ধূর্ত হতে হবে।

মোরোপন্ত—আর যেখানে পেশোয়া গাইকোয়াড়, হোলকর, সিন্ধিয়া, দিল্লির বাদশা পর্যন্ত ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করেছে—ঝাঁসি একটা ছোট রাজ্য।

রানী—তাইতো ভাবি ভারতবর্ষে পুরুষ নেই। ভারতবর্ষের রাজাদের পরিচয় তাদের সুরাশক্তিতে আর হারেমের নারীসংখ্যায়।

মোরোপন্ত - লক্ষ্মী, তুমি উত্তেজিত হয়ে নিজের এবং তোমার এই বড় পরিবার, যারা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে তাদের কথা ভুলতে বসেছো। ইংরেজের বৃত্তি তোমাকে নিতে হবে।

রানী—বাধা ! এ কি উপদেশ তুমি আমাকে দিচ্ছ ?

মোরো—এ ছাড়া এখন কোনো উপায় নেই। তারপর ধীরে সুস্থে ভাবতে হবে কি করা উচিত।

রানী—আরও যাদের যাদের রাজ্য ইংরেজ এইভাবে গ্রাস করেছে—তারা কে কি করেছে তোমরা জান ?

নরসিং—শুনেছি নানা ধুন্ধুপন্থ বিলাতে এর বিচার চেয়ে আপীল করবেন। তাঁর হয়ে ইংরাজী ফরাসী ভাষায় শিক্ষিত আজিমউল্লাকে পাঠাবেন বিলাতে।

রাণী - তাহলে আমাদেরও সেই ব্যবস্থা নিতে ক্ষতি কি ? এমন কেউ নেই যাকে আমরা পাঠাতে পারি ?

রাও আপ্পা—বেশ তো সে খোঁজ করা যাবে। আজ বিশ্রাম কর।

রানী—আমার বিশ্রামের দরকার নেই। তোমরা কি ক্লান্ত ?

আপ্পা—না, বল তোমার আদেশ কি ?

রানী—এখনি এ্যালিসকে আর একবার ডাকা যায় কি ?

আপ্পা—কেন ?

রানী—আমার ব্যবহার সত্যি খারাপ হয়েছে। আমি মার্জনা চাইব এবং আর একবার অনুরোধ করব। তিনি যাতে গভর্ণরকে আর একবার অনুরোধ করেন।

নরসিং—রাজনীতি ?

রানী—হ্যাঁ খানিকটা তাই। তবে এই দুর্গে এ্যালিস বহুবার আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে এসেছেন। আমি জানি ইংরেজ হলেও তিনি অত খারাপ লোক নন।

মোরো—বেশ তাঁকে ডাকাটা ভাল দেখায় না। আমি তোমার আর্জি নিয়ে তাঁর কাছে যাচ্ছি।

রানী—তাঁকে বোল ঝাঁসির রাজারা তো চিরকালই তাঁদের বিশ্বস্ততা দেখিয়ে এসেছে। তবে কেন এই আঘাত ?

নরসিং—আরও আঘাতের জন্য প্রস্তুত থেকো রানী, সদাশিব রাও, কিষেণ রাও এরা ওঁত পেতে আছে, কিংবা তাদের আর্জি এতক্ষণে হয়তো চলেই গেছে।

রানী—বাঃ, কিষেণ রাওএর দাবী যদি মানা হয় তবে আমার পুত্রের দাবী মানা হবে না কেন ? সেও তো রামচন্দ্রের দত্তক—

মোরো—না, দত্তকও বলা যায় না। রামচন্দ্রের মা জোর করে তার মৃত্যুশয্যার পাশে নিজের দৌহিত্রকে দত্তক বলে ঘোষণা করেন।

আপ্পা—পুরো আচার-অনুষ্ঠান হয়নি।

নরসিং—আর তখন রামচন্দ্রের কোনো জ্ঞানই ছিল না।

রানী—তাছাড়া আমার ভাশুরের বিধবা পত্নীও তাকে পুত্র বলে স্বীকার করে না। আর সদাশিব রাও আমার শ্বশুর শিবরাও ভাওএর কাকার বংশধর। এদের দাবী যদি ইংরেজ স্বীকার করে তবে—

আপ্পা—এখনও কি বোঝনি রানী ইংরেজ কি ? নিজেদের যাতে সুবিধে হবে তাকে ওরা একটা বড় নাম দিয়ে তোমারই ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে।

রানী—ঠিক, যে কোনো অন্যায় কাজই কর একটা বড় নাম দেওয়া দরকার।

মোরো তাহলে আমি যাই। নাকি দুপুরে এ্যালিসের বিশ্রামের পরই যাওয়া ভাল।

রানী—ইংরাজরাও কি আমাদের মত দুপুরে বিশ্রাম করে ?

মোরো—আমি এখনই যাচ্ছি।

রানী—দেওয়ানজী লক্ষ্মণরাওকে বলে যাও, মূল্যবান কাগজ-পত্রগুলো নিয়ে এখানে আসতে। এঁদের সঙ্গে বসে আমি সেগুলো দেখি।

রাও আপ্পা—কিন্তু বাঈ সাহেব, আমাদের বিশ্রামের দরকার নেই. তোমারও

তো নিশ্চয় নেই। কিন্তু ঐ দেখ তোমার পুত্র বোধহয়—
মোরো—ও দেখেছে ওর মার কোনো কাজে একদণ্ড এদিক ওদিক হয় না—আজ কেন যে মা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে গেলেন না আর কেনই বা এখনও আর একবার স্নান করে ওকে নিয়ে খেতে বসছে না—
রাণী—ওমা! সত্যিই তো, ওর বোধহয় খিদে পেয়েছে।

[রানী দুহাত বাড়িয়ে ডাকেন—"আনন্দ"। আনন্দ দৌড়ে এসে রানীকে জড়িয়ে ধরে। সবাই হাসে। আলো কমে আসে।]

[মঞ্চের অন্য পাশে আলো পড়ে। এ্যালিস মার্টিনকে বলছেন—]

এ্যালিস—আমি তো বুঝতে পারছি যে অন্যায় হল। রানীর প্রতি ঘোর অন্যায় হল। কিন্তু এর প্রতিকার করবার ক্ষমতা যে আমার নেই তা তো তুমি জান—
মার্টিন—মোরোপন্ত তোমার কাছে এসেছিল কেন?
এ্যালিস—আমাকে বলছিলেন যদি আমি আর একবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমি কি করবো? আমি তো আগেই step নিয়েছিলাম। রানী যখন দরবারে সকালে বললেন যে মৃত্যুপথযাত্রীকে তুমি কথা দিয়েছিলে—আমার মাথা যেন—
মার্টিন—হ্যাঁ। আমি তুমি দুজনেই কথা দিয়েছিলাম—
এ্যালিস—আমার আশা ছিল যে এতদিন আমি কোম্পানীর প্রতিনিধি হয়ে কাজ করেছি, আমার মতামতের একটা মূল্য দেবেন গভর্নর—এই দেখ যে চিঠি আমি ম্যালকমকে লিখেছিলাম তার কপি। আমি বুঝতে পারছি না অরছার ক্ষেত্রে যখন দত্তক গ্রহণ অনুমোদিত হয়েছিল ঝাঁসির ক্ষেত্রে তা কেন হবে না। তারপর এই দেখ আইনের কোন্ ধারায় তা হতে পারে তাও দেখিয়েছি। আমার মনে হয় ঝাঁসির দত্তক গ্রহণের অধিকার নাকচ করা অন্যায়। এ চিঠি ফোর্ট উইলিয়মে পাঠানো হয়েছে তাও জানি কিন্তু আজ অনেকদিন হয়ে গেল। জবাব পাইনি—

[একজন বেয়ারা এসে কুর্নিশ করে একটি শিলমোহর করা চিঠি দেয়।]

এ্যালিস—ম্যালকমের চিঠি। তুমিই পড় মার্টিন—
মার্টিন—(চিঠি পড়ে)—ঝাঁসির অন্তর্ভুক্তির আদেশ পেলাম। আমার পূর্বের ঘোষণাপত্র সর্বদা প্রচার করুন। মহারাজার পুরনো সৈন্যদের দুইমাসের মাইনে দিয়ে বিদায় করুন। মহারাজের পুরনো কর্মীদের যতদূর সম্ভব স্ব স্ব কাজে বহাল রাখুন। ঝাঁসিতে তিনটি, করেরাতে তিনটি কন্টিজেন্ট্—
এ্যালিস—থাক, ওগুলো তো রুটীনের কথা, বৃত্তির বিষয়ে কি লিখেছেন?
মার্টিন—বৃত্তির বিষয়ে আমি পত্রালাপ করেছি। যথাসময়ে জানতে পারবেন। সাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তিতে লিখেছেন—ঝাঁসির দত্তক বিধান অনুমোদিত হয়নি। স্বত্ব-বিলোপের—

[আলো কমে আসে, ট্যাটরার আওয়াজ। ঘোষক বলছে—]

স্বত্ব বিলোপের ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকার ঝাঁসিকে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। বর্তমানের জন্য আমি মেজর এ্যালিসকে ঝাঁসির শাসক নিযুক্ত করছি। ঝাঁসির সর্বসাধারণ ব্রিটিশ সরকারের অধীন এবং রাজস্ব মেজর এ্যালিসের কাছে দেয়।

স্বাক্ষর
ডি. এ. ম্যালকম
১৫/৩/৫৪]

এ্যালিস—তার মানে আমার সালিসিতে সিদ্ধান্ত বদলায়নি।

মার্টিন—রাজার মৃত্যুর পূর্বেই সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল।

[আলো নেভে]

[রানীর কক্ষ, রানীর সামান্য বেশ পরিবর্তন হয়েছে। পুরনারী সমেত মোরোপন্ত, নরসিং, বাও আপ্পা ইত্যাদিও রয়েছেন।]

রানী—তার মানে এই কেল্লা আমাকে ছেড়ে দিতে হবে? যেখানে বিবাহের পর আমি প্রবেশ করেছিলাম। কেল্লার ভিতরের শিবমন্দিরে যেখানে ছেলেবেলায় কতদিন পুজো দিতে গিয়েছি—সব ছেড়ে যেতে হবে?

মোরো—হ্যাঁ, তোমাকে কালই রানী মহালে চলে যেতে হবে। তোমার ব্যক্তিগত জিনিস তুমি নিতে পারবে কিন্তু মালখানা ইংরেজের।

রানী—নাট্যশালা?

আপ্পা—সব, সব ইংরেজের?

রানী—আমার সৈন্য সামন্ত?

নরসিং—তাদের তিন মাসের মাইনে দিয়ে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

রানী—সে বিষয়েও তারা আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন মনে করেনি?

মোরা—ঝাঁসির রাজা এখন ইংরেজ।

রানী—লক্ষ্মীবাঈ এখন পাঁচ হাজার টাকার বৃত্তিধারী সামান্য সাধারণ নাগরিক।

[একজন স্ত্রীলোক এসে খবর দেয়]

স্ত্রী—মা, তোমার সেনাপতি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

রানী—আমার সেনাপতি? নিয়ে আয়।

[সেনাপতি আসে]

রানী—একি সেনাপতি, তোমার উর্দি কোথায়?

সেনাপতি—আমাদের উর্দি, অস্ত্র সমস্ত ইংরেজের কাছে জমা দিতে হয়েছে। ভগবানের আশীর্বাদে ঝাঁসির রাজাকে কোনোদিন যুদ্ধ করতে হয়নি। কিন্তু প্রতিদিন আমরা কুচকাওয়াজ করেছি। তোমাদের সেবার জন্য কখন ডাক পড়বে সেজন্য প্রস্তুত থেকেছি। অনেকদিন পর ডাক পড়লো—আমাদের

উর্দি, অস্ত্র ফেরৎ দেবার জন্য। রাগে দুঃখে কাল আমরা কেঁদেছি। সৈনিক হয়েও আমরা কেঁদেছি। তোমার অনেক সৈনিক তাদের উর্দি রাগে দুঃখে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে, কুয়োতে ফেলে দিয়েছে।

[রানী মাথা নিচু করে বসে থাকে]

মোরো—তোমরা এখন কি করবে ?

সেনাপতি—কি করব ? চাষবাস জানি না। অন্য কোনো কাজ তো শিখিনি। জানি না—আর অন্য কোথাও যদি সৈনিকের কাজ পাই—বাঈ সাহেব, রানী, তুমি আমাদের মা। যাবার সময় আমার সমস্ত সৈনিকদের হয়ে আমি তোমাকে প্রণাম করতে এসেছি মা।

[প্রণাম করে চলে যেতে যায়]

রানী—যদি কোনোদিন আমি ডাকি আসবে ?

সেনাপতি—মা ! ! ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর জয়।

মোরো—মূর্খ, বোকার মত চিৎকার করছো কেন ?

সেনাপতি—যদি তুমি কোনোদিন ডাক মা, তোমার দেড় হাজার সৈনিক তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে।

[প্রণাম করে চলে যায়]

রানী—আমার বিয়ের দিন, রাজকুমারের জন্মদিনে এই কেল্লার বুরুজ থেকে কামান দাগা হয়েছিল—বাবা, রাও আপ্পা, নরসিংজি—একটা কাজ তোমাদের করতে হবে। আজ এই রাতের অন্ধকারে কয়েকটি কামান তোমাদের নামিয়ে আনতে হবে।

মোরো—কেন ?

রানী—বাগানের মাটিতে আমি সেগুলো পুঁতে রাখবো। আমার মন বলছে আবার আমাকে এই কেল্লা ডাকবে।

নরসিং—কথাটা যুক্তিসঙ্গত।

রানী—কড়ক বিজলী, ঘনগর্জ, সমুদ্র সংহার এই তিনটি কামান অন্তত আমি পুঁতে রাখতে চাই।

মোরো—ওর সঙ্গে আরও কিছু অস্ত্রশস্ত্র বারুদ।

রানী—মান্দাবাঈ, কাশীবাঈ, তোমরা যাও এদের সঙ্গে হাত লাগাও।

কাশী+মান্দার—যে আজ্ঞে।

[পুরুষদের সঙ্গে কাশী এবং মান্দার বেরিয়ে যায়। রানী একটি মহিলার দিকে তাকিয়ে বলে - মা।]

রানী—মা।

চিমাবাঈ—বলো বাঈসাহেবা।

রানী—আর তো আমি বাঈসাহেবা নই, মা। আমি এখন সাধারণ নাগরিক

তোমার মেয়ে—

চিমা—আমার মেয়ে, আমার বন্ধু। তোমার স্বামীর দয়ায়, মহারাজের দয়ায় আমি স্বামী, কন্যা একসঙ্গে পেয়েছিলাম।

রানী—হ্যাঁ, আমার দু আড়াই বছর বয়সে বাবা আমার মাকে হারিয়ে ছিলেন। মহারাজ যেদিন আমাকে রহস্য করে বললেন তোমার জন্যে একটা ছোট্ট মা আনব ভাবছি সেদিন,—ওঃ কত কথা মনে পড়ছে।

[অন্য পুরনারীদের দিকে তাকিয়ে]

তোমাদের সব মনে আছে ?

১ম—মনে আবার নেই ? তুমি ' মা মা' বলে ক্ষেপালে চিমাবাঈ দৌড়ে তোমাকে মারতে যেত। সঙ্গে সঙ্গে তুমি দাঁড়িয়ে পড়ে বলতে "তোমার এত সাহস রানীর গায়ে হাত তোল।" আর চিমাবাঈএর কি ভয়।

চিমা—আমি যে খুব গরীব ঘরের মেয়ে ছিলাম। একটুতেই শঙ্কা হতো সব যদি হারাই।

রানী—তুমি আমার সৌভাগ্যবতী মা। তুমি হারাবে কেন ? আমার চেয়ে মাত্র ক'মাসের বড় আমার মা, আমার বন্ধু।

[চিমা ছুটে গিয়ে রানীকে আলিঙ্গন করেন, মুক্ত হয়ে রানী—]

রানী—কিন্তু না, এখন আর ভাবাবেগের সময় নেই, শোন অন্তঃপুরিকারা—হীরা, জুঁহী, কোরিন—আজ থেকে তোমাদের সঙ্গে আমার কোনো প্রভেদ নেই।

হীরা—প্রভেদ যে আছে তুমি তো কোনদিন তা আমাদের বুঝতে দাওনি।

রানী—হ্যাঁ, কিন্তু মুখে তো কোনোদিন বলিনি। আজ বলছি আমরা সবাই সমান।

সুন্দরবাঈ—রানী আজ তোমাকে অন্যরকম লাগছে।

কোরিন—বড় সুন্দর লাগছে।

রানী—ও সব কথা বলবার বা শোনবার সময় নেই। এতদিন তোমরা রান্নাবান্না করেছো, হাতে মেহেদীর ফুল কাটতে শিখেছ, সেলাই, মালাগাঁথা অনেক কিছু শিখেছ, কিন্তু রানী মহলে যাবার পর তোমাদের আর একটা কাজ শিখতে হবে।

সবাই—কি কাজ বল। তুমি যা বলবে আমরা তাই করব।

রানী – এতদিন কেবল কাশী, মান্দারই অশ্ব চালনা এবং অসি চালনা শিখেছে, এবার তোমাদেরও শিখতে হবে। শুধু তাই নয় কামান, বন্দুক, পিস্তল সুযোগ পেলে এসবও শিখতে হবে।

দুজন—আমরা পারবো ?

রানী—আমি যদি পারি, কাশী, মান্দার এরা যদি পারে তোমরা কেন পারবে না ?

[একটি অল্পবয়সী মেয়ে এগিয়ে আসে]

মেয়ে—তুমি বললে সব পারব। এমনি করে তরোয়াল ঘুরিয়ে ইংরেজের গলা কাটব।

সকলে—তুমি শেখালে আমরা সব শিখতে পারব।

[পেছনে দুই নারী এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, তারা এগিয়ে আসে।]

রানী—আরে নাটকওয়ালী মোতিবাঈ গঙ্গুবাঈ। তোমাদের আমি লক্ষ্যই করিনি এতক্ষণ।

মোতি—বাঈসাহাব, তোমার ফৌজে আমাদের নেবে না?

রাণী—তোমাদের হাতে বীণ শোভা পায়, পায়ে নূপুর শোভা পায়—তোমরা অসি ধরলে নাট্যশালার কি হবে?

মোতি—নাট্যশালা তো এখন ইংরেজের। আর মহারাজ চলে যাবার পর তো নাট্যশালা খোলা হয়নি রানী।

রানী–তাইতো। বড় ভুল হচ্ছে যে।

গঙ্গা—যদি রান্না করা মেহেদী দেওয়া মালা গাঁথা হাতে বন্দুক শোভা পায়, তবে এই বীণ বাজানো হাত এতই কি দোষ করল বাঈ সাহেবা!

মোতি—দেখ না একবার পরীক্ষা করে, পারি কিনা।

[রানী আবেগে আপ্লুত হয়ে এসে মোতি আর গঙ্গাবাঈ-এর হাত জড়িয়ে ধরে।]

চিমা চল সবাই। জিনিসপত্র সব গোছাতে হবে না?

হীরা—সত্যি আমরা মেয়েরা এমন না একজনের চোখে জল দেখলেই হুড়হুড় করে কোত্থেকে যে সবার চোখে এত জল আসে। চল—চল –

[সবাই চলে যায়, রানী একলা]

রানী—আমারু ভাগ্য। তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি—কেন? কেন তুমি ঝাঁসিতে আমাকে এনেছিলে? আমাকে দিয়ে তুমি কি করাতে চাও? সব কেড়ে নিয়ে তুমি কি বোঝাতে চাইছ? কি?

[শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে—মঞ্চ অন্ধকার হয়। আবার আলো জ্বলে। মঞ্চের একপাশে মোরোপন্ত, লছমন রাও।]

মোরোপন্ত—এইটা ভাবিনি। রানীর খাস দৌলত আটক করেছিল, গয়না টাকা সমস্ত, কিন্তু যে নাবালক দত্তকের দোহাই দিয়ে তোমরা ওগুলো আটক করলে—আজ তারই উপনয়ন, তাহলে তোমরা সেই টাকা থেকে টাকা দেবে না কেন? এ অন্যায় ঘোর অন্যায়।

লছমন—নাঃ, কারণটা কেমন অদ্ভুত দেখালো দেখ। রাজার দত্তক পুত্র যদি বড় হয়ে বলে আমার এক লাখ টাকা তোমরা আমার মাকে দিলে কেন? কবে দামোদর বড় হয়ে এই কথা বলবে বলে আজ টাকা দেবে না?

মোরো—অদ্ভুত, অদ্ভুত, এই ইংরেজ জাত। রাজা হবার অধিকার নেই, রাজ্য গ্রাস করবার জন্য দামোদরের পুত্রের দাবী মানা হল না। অথচ ঐ সব গয়না-গাঁটি টাকা পয়সা নাকি রাজার দত্তক পুত্র দামোদরের। তাই ইংরেজ পাহারা দিয়ে আগলে রাখবে ওর একুশ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত। আর মা তার টাকা নষ্ট করবে? সত্যি, ওদের এইসব অপূর্ব যুক্তি আমার মাথায় ঢোকে না।

লছমন—আমার মাথায় কিন্তু ঢুকছে। দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না বলে একটা কথা আছে না? ও টাকা ওরা কোনদিনই দেবে না। দামোদর যখন একুশ বছরের হবে, তখন আবার আর একটা বাহানা বার করে বলবে তোমার বাবার বড় ইচ্ছে ছিল তুমি চাষবাস করে খাও, তাই এই রানী মহালটাও তোমরা ছেড়ে দাও—

মোরো—তোমার রসিকতা আমার ভাল লাগছে না লছমন রাও—এক লাখ টাকা এখন কোথায় পাই?

লছ—এলিস সাহেব লোকটা তবু ভদ্রলোক ছিল, তাকে বদলি করে দিল কোথায়। আনল এই ব্যাটা স্কীনকে। সামান্য ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত জানে না। আমার বিশ্বাস এলিস সাহেব যদি থাকতেন —।

মোরো—সত্যি, মনুর কপালটাই খারাপ। এই সময়েই এলিসকে বদলি করে দিল।

লছমন—এই রকম দু-একটা ইংরেজ না দেখলে ওদের মধ্যে কিছু ভালো কোথাও আছে ভাবাই যেত না—

মোরো—কিন্তু এলিসএর গুণগান করলে এখুনি তো টাকাটা উড়ে আসবে না।

লছমন—সত্যি, বাঈসাহেবকে একথা বলব কি করে?

মোরো ও বড় আশা করে বসে আছে আমরা সুখবর নিয়ে আসবো। আমরা কি ভাবতে পেরেছিলাম যার গচ্ছিত সম্পত্তি তোমাদের কাছে আছে তার দরকারে তোমরা তার থেকে সামান্য একটা অংশ দেবে না?

লছমন—আমাদের তখনই বোঝা উচিত ছিল যখন মহালক্ষ্মীর পুজোর জন্যে যে দেবত্র গ্রাম ছিল তাও ওরা নিয়ে নিল। দেবত্র গ্রাম নিয়ে নেয় এমন কথা কখনও শুনেছে কেউ? রানী আর রানী নয়। রাজ্য তোমরা নিয়ে নিলে অথচ রাজা রামচন্দ্র রাও কবে ছত্রিশ লাখ টাকা ধার করেছিলেন রানীর পাঁচ হাজার টাকা বৃত্তির থেকে সেটাও উশুল করে নেওয়া হচ্ছে মাসে মাসে। এর কি কোনো যুক্তি আছে মোরোপন্তজি? তাই বলছি প্রবল শক্তিশালী ইংরেজ যদি কোনদিন কোনো এক ইতিহাসের পাতা খুলে দেখায় যে বহু হাজার বছর পূর্বে এ দেশটা ওদেরই ছিল—তাহলেও আর আশ্চর্য হব না।

[ঘোড়ায় চড়ার পোশাকে রানীর প্রবেশ, সঙ্গে কাশী মান্দার মোতি এবং

দামোদর।]

দামোদর—[মোরোপন্তকে জড়িয়ে]—দাদু, মা বলেছে আমার পৈতে হবে। আবার মা বাজী পোড়াবে। কত লোক আসবে। মোতিবাঈ, গঙ্গুবাঈ, বলেছে আবার তারা গান গাইবে, নাচবে।

মোরো—সে তো করতেই হবে। নিশ্চয় হবে। [লছমন হঠাৎ ওদের দিকে পেছন করে দাঁড়ায়]

রানী—কি হল ? লাখ টাকাই দেবে তো ? নাকি বলেছে পঞ্চাশ হাজারের বেশি দিতে পারবো না। কি হল বল ?

লছমন—স্কীন বলেছে কোনো টাকাই সে দিতে পারবে না।

রানী—কেন ?

লছমন—কোলভিন মনে করেন যে রাজকুমার বড় হয়ে যদি কোনোদিন বলেন যে তোমরা আমার টাকা আমার মাকে নষ্ট করতে দিয়েছিলে কেন ?

দামোদর—আমি কখনো ও কথা বলব না।—মা তুমি সেদিন বলেছ না আমার সব কিছু তোমার আর তোমার সব কিছু আমার।

রানী—হ্যাঁ বাবা, কিন্তু ওদের মাথার মধ্যে গোবর পোরা তো তাই আমাদের কথা, সম্পর্ক ওরা বুঝতে পারে না। যাও, কাশী, মান্দার তোমরা ওকে নিয়ে ভেতরে যাও। আনন্দ পরিশ্রান্ত, ওকে কিছু খেতে দাও।

[সবাই দামোদরকে নিয়ে চলে যেতে চায়। দামোদর হঠাৎ ফিবে বলে]

দামোদর—মা, থাক বাজী পোড়াতে হবে না, নাচগান চাই না, আমি বড় হয়ে সব কেড়ে নিয়ে আসব একদিন, তখন বাজী পোড়াব।

রানী—আনন্দ, সত্যি তুমি আমার আনন্দ—যাও বাবা, যাও, আমি একটু কাজ সেরে নিই। [ওরা চলে যায়।]

রানী - তা হলে এখন উপায় ? আত্মীয় স্বজন প্রজা যত নাগরিক উচ্চবর্ণ থেকে নিম্নবর্ণ সকলে আশা করে আছে, আমরা নিজেরা আশা করে আছি যে এই উপলক্ষে আমরা আবার একবার অনুভব করব যে ঝাঁসির রাজবংশ মরেনি, তা পারব না ? কোন উপায় নেই ?

[একজন প্রহরী প্রবেশ করে]

প্রহরী—বণিক জয়পুরওয়ালা আর লক্ষ্মীচাঁদজী এসেছেন।

মোরো—নিয়ে এস তাঁদের।

[জয়পুরওয়ালা ও লক্ষ্মীচাঁদের প্রবেশ]

জয়পুরওয়ালা -মা, এক লক্ষ টাকা এমন কি বেশী ? তোমাদেরই কৃপায় আমাদের অনেক আছে।

লক্ষ্মীচাঁদ—অনুমতি কর তো এখনই টাকা নিয়ে আসি।

রানী—সব শুনেছ তাহলে। কিন্তু না, তা হয় না।

জয়পুর—কেন মা ?
রানী—আমার এই সামান্য বৃত্তি থেকে তোমাদের ঐ টাকা তো আমি কোনোদিনই শোধ করতে পারব না।
লক্ষ্মী—আমরা তো ধারের কথা বলিনি মা—
জয়পুর—একথা শুধুমাত্র আমাদের কথা নয়। এ সমগ্র ব্যবসায়ী সমাজের কথা আমরা দুজনে তাদের প্রতিনিধি।
রানী—আমার এত দুর্ভাগ্যের মধ্যেও আমি যে এখনও কর্মক্ষম আছি, সে বোধহয় আমার দেশের লোকের এই ভালবাসার জন্যে—[কি একটু ভাবে] কিন্তু না, দান আমি নিতে পারব না। তবে যদি তোমরা জামিন থাক যে দামোদর বড় হয়ে ইংরেজের কাছে টাকা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করলে তোমরা টাকাটা দিয়ে দেবে এবং তাতে যদি কোলভিন টাকাটা দেয় এইটুকু অনুগ্রহ কি তোমরা করতে পার ?
লক্ষ্মীচাঁদ—ছিঃ মা, অনুগ্রহ বলবেন না। এ আমাদের কর্তব্য।
জয়পুর—আজ ইংরেজ রাজা। কিন্তু মনে জানি তুমিই আমাদের শাসনকর্ত্রী।
রানী—আমার সৌভাগ্য। আমার দুঃখ হয় দামোদরের জন্য। ওর বাবা মা তো ওকে দত্তক দিয়েছিল ও রাজা হবে বলেই। রাজা তো দূরের কথা, সামান্য উপনয়নটুকুও ভাল করে করতে পারব না। এটাকে আইনানুগ ব্যবস্থাই বলুন আর কৌশলই বলুন—আমার গচ্ছিত টাকা থেকেই আমি এ-কাজ করতে চাই।
মোরো—তবে সেইমত লিখে স্কীন সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেয়া যাক।
জয়—এখনি লেখ। আমরা তাতে সই দিয়ে যাই।

[আলো নিভে যায়, মন্ত্র উচ্চারণের শব্দের সঙ্গে নৃত্যগীত। অনেক লোকের যাওয়া আসা। ছোট ছোট কথা উপনয়ন সম্পর্কে সেই সব থেমে যায়। চিমাবাঈ কোলে শিশুপুত্র চিন্তামণি, মুণ্ডিত মস্তক দামোদর একটু ওপরে অলিন্দে দাঁড়িয়ে বাইরে কি যেন দেখছে। নিচের দিক থেকে মোরোপন্ত প্রবেশ করে।]

মোরোপন্ত—কি, কি দেখছ ? কোনদিকে খেয়ালই নেই।
চিমাবাঈ—ওমা, তুমি কতক্ষণ এসেছ ? তোমার মেয়ের কুচকাওয়াজ দেখছিলাম। ভাবছিলাম ভগবান ওকে মেয়ে করে গড়লেন কেন ?
দামোদর—দাদু, মায়ের বাহিনী তৈরী হয়ে গেছে। তুমি এস দেখবে এস মোতিবাঈ গঙ্গুবাঈ কেমন অসি চালনা করছে।
চিমাবাঈ—বন্দুকও চালাচ্ছে !
মোরোপন্ত—জান চিমা, ছোটবেলায় বড় দুরন্ত ছিল মনু। মহারাজ গঙ্গাধরের বিশেষ দূত যখন তাঁর জন্যে কন্যা খুঁজতে খুঁজতে বিঠুরে উপস্থিত হলেন

তখন একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। পেশবা বাজীরাও মনুকে খুবই স্নেহ করতেন। কত তাঁর কোলে বসে মনু বকবক করে যেত! তাই পেশবা ওকে ডাকতেন ছবেলি বলে।

চিমাবাঈ -তা সত্যি, ছেলেবেলায় ও ময়না পাখীর মতই কথা বলত, হ্যাঁ তারপর কি হল?

মোরোপন্ত—হ্যাঁ বলি। গঙ্গাধর রাও-এর ঘটক তাঁতীয়া দীক্ষিত যখন মনুকে রাজার বধূ হিসাবে মনোনীত করলেন পেশবার সামনেই সব কথাবার্তা হচ্ছিল। মনুও সেখানে ছিল। হঠাৎ পেশবার আসনের নীচ থেকে একটা কালো সাপ বেরিয়ে এল!

চিমা+দাম—সাপ! সে কি!

মোরোপন্ত—আমরা কেমন বিহ্বল হয়ে গেলাম। ভেবে পাচ্ছিলাম না কে কি করব। হঠাৎ আট বছরের মেয়ে মনু একটা কম্বলের আসন তুলে নিয়ে সাপটাকে চাপা দিল। তখন আমরা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে পিটিয়ে সাপটাকে মেরে ফেললাম।

চিমাবাঈ—বাবাঃ, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সত্যি, ভয় বলে জিনিস ভগবান ওর শরীরে দেননি।

মোরোপন্ত—আমি বললাম—'মনু তুই কেন এমন কাজ করতে গেলি? সাপটা যদি তোকে কামড়ে দিত?' মনু বলল—'অথচ সাপটির ভাগ্য দেখ! কয়েক মুহূর্তের জন্য সাপটি এল, পেশবা রাজশাস্ত্রী তোমাদের সকলকে ভয় পাইয়ে দিয়ে হঠাৎই শেষ হয়ে গেল। এরকম জীবনই তো বেশ! তাই না?' পেশবা ধমক দিয়ে বলেছিলেন, ছবেলি, অত কথা বোল না—

চিমাবাঈ—ঐটুকু মেয়ে ঐ কথা বলল? আমার ঐ বয়সে ঐ রকম কথা আমার মাথায়ও আসত না। অবশ্য ও তো জন্মেছিল রানী হবার জন্যে।

মোরোপন্ত—হ্যাঁ, আট বছবের মেয়ের বুদ্ধি বিবেচনা দেখে রাজা পর্যন্ত অবাক হয়ে যেতেন!

চিমাবাঈ—আমি অবাক হয়ে যাই, রানীর পুরো মর্যাদা বজায় রেখে ও কেমন অতি সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশে যায়। ওর বিয়ের এক বছরের মধ্যে কত সাধারণ ঘরের মেয়েরাও তো ওকে তাদের ব্রততে 'সুভাষিণী' হবার জন্যে নিমন্ত্রণ করত? তখন রাজবাড়ির বর্ষীয়সীরা বিরক্ত হতেন। বলতেন, 'তুমি রানী, তুমি ওদের বাড়ি যাবে কেন?' বাঈসাহেব জবাব দিতেন—'আমি তো ওদেরই রানী'। সকলের সঙ্গে এমন সমানভাবে মিশত!

দামোদর—মা বলেছে, আনন্দ যত বড় রাজা হবে তত সকল প্রজার সঙ্গে মিশবে—

[একটা গুলির আওয়াজ, দামোদর দেখতে চলে যায়]

মোরোপন্ত—এই যে ওর নারী বাহিনী তৈরি করেছে তাতে তো কিষাণ কামার

ঘরের মেয়েদের পর্যন্ত নিয়েছে—

চিমাবাঈ—এই জিনিসটা আমার কেমন লাগে। হাজার হলেও ও ব্রাহ্মণের মেয়ে। পরিশ্রান্ত হয়ে ওরা যখন মাঠে বসে একসঙ্গে জল খায় তখন—

মোরোপন্ত—আমারও যে লাগে না তা নয়। কিন্তু মনে কর যে মেয়ে আঠার বছর বয়সে স্বামীপুত্র সব হারিয়েছে—তার যদি এটা একটা খেয়ালই হয় তাতে কি কিছু বলা যায় ?' অবশ্য বলার আমাদের অধিকারও নেই। শোন, তোমার মনের এই দ্বিধার কথা মনু যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে !

চিমাবাঈ—না, না, আমি কেবল তোমাকেই কথাটা বললাম। এতদিনের সংস্কার তো !

মোরোপন্ত—[হেসে]—এই জন্যেই কি তুমি ওর বাহিনীতে যোগ দাওনি ?

চিমাবাঈ—ও যখন শুরু করল তখন চিন্তামনি এক মাসের। কি করে দেব ? আর সবাই যদি বন্দুক চালাতে যাই বাচ্চাগুলোর নাওয়া-খাওয়ার কি হবে বল ?

মোরোপন্ত—তার ওপর আবার স্বামী দেবতা আছে—

চিমাবাঈ—আছেই তো ! একজন বাদ গেলে তোমার মনুর বাহিনীর কোনো ক্ষতি হবে না।

[দামোদর অলিন্দ থেকে চীৎকার করে বলে—]

দামোদর—দাদা দিদিমা, তোমরা শীগ্‌গির এস দেখ, মার সঙ্গে গঙ্গাবাঈ আরও কতজন এক সঙ্গে বন্দুক চালাবে। দেখ, ওদের সবাইকে কি সুন্দর লাগছে দেখতে—শীগ্‌গির এস !

চিমাবাঈ [ওপরে যেতে যেতে] তোমার মাকে নিশ্চয়ই সবচেয়ে সুন্দর লাগছে !

[ওরা ওপরে উঠে যায়। একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক গর্জে ওঠে, তার সঙ্গে সঙ্গীত। তারই সঙ্গে কামানের গর্জন বন্দুক তলোয়ার ইত্যাদির আওয়াজ আর্তনাদ গর্বিত চীৎকার যুদ্ধের বাজনা ইত্যাদির আওয়াজ। মঞ্চের ওপরের আলো নিভে গেছে, ড্রামের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষকের কণ্ঠস্বর।]

১ম ঘোষক—ভারতে সিপাহীরা বিদ্রোহ শুরু করেছে। ব্যারাকপুরে মঙ্গল পান্ডে মেজর হিউসনকে গুলি করেছে। সর্বত্র সিপাহীরা ক্ষেপে গিয়ে ইংরেজদের মারছে। মহামান্য কোম্পানী কিছুতেই এই রকম অরাজকতা চলতে দেবেন না। যেখানে যত ইংরেজ রেজিমেন্ট আছে সবাই প্রস্তুত হোন, কোম্পানীর সকল সৈনিকদের ছুটি বাতিল করা হল—

২য় ঘোষক—বাঘী সিপাহীরা দিল্লিতে বাহাদুর শাহকে স্বাধীন সম্রাট বলে ঘোষণা করেছে। মীরাট কানপুর অযোধ্যা বিহার স্বাধীন হয়ে গেছে। যেখানে যত সিপাহী সব সিপাহী শাহকে মেনে নিন, 'অব বাহাদুর শাহী চলেগী, ইংরেজ শাহী নেই—'

[একটা দামামা বেজেই চলে, পর্দা পড়েই আবার ওঠে, রানীর প্রকোষ্ঠ। পুরুষ এবং মহিলা মিলিয়ে অনেকে আছেন।]

লছমন রাও—বিদ্রোহের আগুন ঝাঁসিতে এসে পেঁছিল।

মোরোপন্ত—ব্যাপারটা মোটেই সুবিধেজনক মনে হচ্ছে না।

রাও আপ্পা—এরকম একটা হাওয়ার দরকার ছিল। ঝাঁসির ওপর যে অন্যায় ওরা করেছে এরকম অত্যাচার সারা হিন্দুস্থানের ওপরেই চলেছে। সেইজন্যে হিন্দুস্থানের সর্বত্রই এই অসন্তোষ—

নরসিং—অনেক খবরই তো আসছে। অনেক আগে কোথায় নাকি ওরা সুরজ দোবে বলে এক সৈনিককে ফাঁসী দিয়েছিল। তখন থেকেই অসন্তোষ—

লছমন—টোটার মধ্যে যদি গরুর চর্বি আব শুয়োরের চর্বি দিয়ে থাকে তবে তার চেয়ে অন্যায় আর কি হতে পারে? আজ একশ বছর হয়ে গেল ইংরেজ এখানে এসেছে তারা কি জানে না যে হিন্দুর কাছে গরুর চর্বি আর মুসলমানের কাছে শুয়োরের চর্বি কি? তাদের ধর্মবিশ্বাসে কতখানি আঘাত লাগতে পারে?

রানী - ওরা যে আমাদের অনুভূতির কোনো দাম দেয় না তার প্রমাণ কি আমরা এখানেই কিছুদিন আগে পাইনি? ঝাঁসির বাজারে প্রকাশ্যেই কি ওরা গরু আর শুয়োরের মাংস বিক্রীর ব্যবস্থা করেনি? আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও? দাঁত দিয়ে টোটা কাটতে হবে এটা উপলক্ষ মাত্র, নানা দিনের নানা অত্যাচারে দেশেব লোক অস্থির হয়ে উঠেছিল তাই এই বিদ্রোহ।

মান্দার—একজন ফকির সেদিন এসেছিল, সে সেদিন বলছিল যে কানপুরে না কোথায় এক ইংরেজ গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল, এক বাচ্চা ছেলে গাড়ির সামনে এসে পড়ে। তার মা চীৎকার করে গাড়ী থামাতে বলে। সাহেব কর্ণপাত না করে, ছেলেটার গায়ের ওপর দিয়ে ঘোড়াশুদ্ধ গাড়ি তো নিয়ে গেলই উপরন্তু ছেলের মা আহত হল চাবুকের বাড়ি খেয়ে।

মেয়েরা—ছেলেটি মারা গেল?

মান্দার—সে তো নিশ্চয়।

আপ্পা—একটি সতের আঠার বছর বয়সের ছেলের ফাঁসি হল সেদিন, কেন জান? এক সাহেব ছেলেটির বাবার গায়ের ওপর দিয়ে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিল। ছেলেটি তা হতে দেবে না বলে সাহেবের জামা চেপে ধরেছিল।

রঘুনাথ সিং—সত্যিই তো ঠিক সময়ে সরে যেতে পারে না? অথচ কোন ইংরেজ যদি কোন ভারতীয়কে সামান্য কারণে কিংবা বিনা কারণে খুন করে তার জরিমানা হবে মাত্র এক টাকা।

রানী—এ উদাহরণ দিলে তার তো শেষ নেই। মোটকথা ওরা আমাদের ঠিক মানুষ বলে মনে করে না। অন্তত মনে করে ওরা উঁচুদরের মানুষ আর

আমরা নীচু দরের। যাক্—এখন আমাদের কর্তব্য কি?

মান্দার—তুমি কি এইরকম একটা সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলে না?

কাশীবাঈ—সাধু ফকির এরা নাকি অনেক জায়গায় জড় হয়ে বলাবলি করছে যে ১৭৫৭-র পর ১৮৫৭ এসে গেল। একশ বছর হয়ে গেল, ইংরেজকে এবার যেতেই হবে, কি সব গ্রহ নক্ষত্রের কথা বলছে।

রানী—একশ বছর হয়ে গেছে না? এ—ক—শ বছর? আর আমরা কেবল দেখছি একটার পর একটা রাজ্য ওরা নিয়ে নিচ্ছে?

মোরোপন্ত—তাহলে এই কি সময় ওদের আঘাত করার?

রানী—আগে আমাদের সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে বুঝে দেখতে হবে। গোঁয়ারের মত কিছু করাটা ঠিক হবে না। ঝাঁসির ক্যান্টনমেন্টের ব্যাপারটা আরেকবার বল তো লছমন রাও।

লছমন—ঝাঁসির বার নম্বর রেজিমেন্টের দেশী সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছে। হাবিলদার জোনা বক্স স্টার কোর্ট দখল করেছে। ক্যাপটেন স্কীন সমস্ত ইংরেজদের নিয়ে কেল্লায় আশ্রয় নিয়েছেন।

রানী—সংখ্যায় ওরা কত?

লছমন—ষাট্ সত্তর হবে।

রানী স্ত্রীলোকেরা আছে শিশুরা আছে! সিপাহীরা ক্ষেপে গিয়ে যদি খুন করতে শুরু করে তবে নারী শিশুদের রেহাই দেবে বলে মনে হয়?

রাও আপ্পা—কিছুতেই না। এতদিন ইংরেজও তো এদেশের নারী শিশুকে—

রানী ইংরেজ কি করেছে তা জানতে চাইনি, সিপাহীরা একাজ পারে কিনা—আমি তাই জানতে চাইছি।

রাওআপ্পা—পারে নিশ্চয়ই পারে।

রানী—[মোরোপন্তকে]—বাবা তাহলে তুমি এখনই স্কীন সাহেবকে গিয়ে বল। নারী এবং শিশুদের আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে। বল যে আমার প্রাণ থাকতে তাদের কোন বিপদ হবে না।

কয়েকজন—ওদের কথা ভাবছ কেন, ওরা জাহান্নমে যাক।

রানী—না, তা কিছুতেই হয় না। পুরুষরা লড়াই করে প্রাণ দিতে পারে, সে তাদের যোগ্য কাজ। কিন্তু শিশুরা—ওদের মধ্যে আমার দামোদর, চিন্তামনি। তোমাদের সকলের শিশুপুত্র কন্যারা আছে—তারা ইংরেজের ন্যায় অন্যায় কি বোঝে?

মোরোপন্ত—আমি চিঠি লিখে আনছি তুমি সই করে দিও।

[চলে যায়]

রানী—লছমন রাও, তুমি আর একটি চিঠি ঠিক করে নিয়ে এস। জব্বলপুরে মেজর আরস্কাইনকে বলতে হবে। ঝাঁসির সিপাহীরা যে বিদ্রোহ করছে

তাতে ঝাঁসির কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা বিশ্বস্ত।

মান্দার+কাশী—সে কি বাঈসাহেব, তুমি ইংরেজকে এই কথা বলবে?

রাওআপ্পা—রানী, তুমি কি ভয় পাচ্ছ?

মোতি+গঙ্গা—তাহলে তলোয়ার চালান শিখে বন্দুক চালান শিখে কি লাভ হল?

রানী—আপ্পাজী, হ্যাঁ ভয় আমি পাচ্ছি। আর সেই ভয়কে চাপা দিয়ে গোঁয়ার্তুমি দেখানোটাকে আমি ভেতরের কাপুরুষটাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলে আমি মনে করি। বুঝতে পারছ না কেন যে আজ যদি সত্যি সিপাহীরা এখানকার ইংরেজদের মারে তখন সমস্ত ইংরেজ মনে করবে না রানীই এটা করিয়েছে! এবং ওদের অতবড় সৈন্যদল, নয়া নয়া কামান বন্দুক নিয়ে এসে যখন নগরে প্রবেশ করে, যখন স্ত্রী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে হত্যা করবে তখন কি হবে? শোননি মীরাটের কাছে কেবল লোককে ভয় দেখাবার জন্য রাস্তার দুপাশের গাছে একশটা লোককে ফাঁসী দিয়েছে!—যে কাজের জন্য আমি দায়ী নই তার দায়ভাগ থেকেই আমি ওদের জানিয়ে দিতে চাই আমি এর মধ্যে নেই।

লছমন রাও—[গম্ভীর]—তোমার আদেশ আমি নিশ্চয় মনে মনে পালন করব।

রানী—ও! মন আপনার সায় দিচ্ছে না, না? এখনই কতগুলো ইংরাজ হত্যা না করতে পারলে তোমাদের ভাল লাগছে না?

মান্দার—বাঈ সাহেব, মাপ করো। কেল্লা ছেড়ে আসবার দিন চোখের জলের মধ্যে দিয়ে তুমি কি সেদিন বলোনি যে এর প্রতিশোধ তুমি নেবে, বলোনি কি যে—'আজ থেকে ইংরেজ আমার শত্রু।'

মোতি—এবং আমরাও তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এর প্রতিশোধ আমরা নেব।

হীরা—আর সেই জন্যেই কি আমরা যে কাজ নারীর নয় সেই যুদ্ধবিদ্যা—এত যত্ন করে শিখলাম।

রানী—ছিঃ ছিঃ মান্দার, মোতি, হীরা! পুরুষের কাজ শিখতে গিয়ে কি নারীর হৃদয় বিসর্জন দিতে হবে! নারী শিশুদের ওপর অত্যাচার হবে সেই কাজ সমর্থন করে তোমার শিক্ষার পরিচয় দেবে না সেই নারী শিশুদের রক্ষা করে তোমাদের শিক্ষার পরিচয় দেবে? বল, কোনটা তোমাদের কাম্য?

[সবাই চুপ করে থাকে]

রানী বল লছমনজী, ঝাঁসির নিরাপত্তা তোমাদের কাম্য না কয়েকটা ইংরেজের রক্ত দেখা?

লছমন রাও—বাঈ সাহাব, আমাকে মাপ কর। তোমার চেয়ে বয়স আমার বেশী কিন্তু তোমার হৃদয়ের কাছে আমি এখনও শিশু।

মান্দার—রানী, আমাদেরও মাপ কর। আর কখনও তোমার আদেশ তোমার

চিন্তা সম্পর্কে প্রশ্ন করব না।

লছমন—কিন্তু চিঠি নিয়ে জব্বলপুরে যাবে কে? চিঠি যদি সিপাহীদের হাতে পড়ে? পত্রবাহকের প্রাণ তো যাবেই, তারা রানীমহল আক্রমণ করবে।

রানী—ঠিক। দুজন বিশ্বাসী বুন্দেলা কিষাণের খোঁজ কর। তাদের বল দুটো ফাঁপা বাঁশের লাঠি নিতে। সেই ফাঁপা বাঁশের মধ্যে পত্র থাকবে।

লছমন—চমৎকার বুদ্ধি হয়েছে—

রানী—আর কিছু মুদ্রা তাদের দেবে, দরকার বুঝে তারা যেন ঘোড়া ভাড়া করে নেয়।

[লছমন 'যে আজ্ঞে' বলে চলে যায়। অন্য সকলেও চলে যেতে থাকে।]

[আলো কমে আসে। রানী উপরের অলিন্দে চলে যায়। পড়ন্ত রোদের আলো এসে পড়ে রানীর মুখের ওপর। রানী একা মহালক্ষ্মীর মন্দিরে, আরতির ঘণ্টা বাজে। সূর্যের আলো মিলিয়ে যায় অন্ধকারে। রানীকে ছায়ার মত লাগে। পরিচারিকা মোমবাতির সেজ এনে রেখে যায়। রানী নেমে আসে ঘুরতে ঘুরতে, আপন মনে বলে।]

রানী—আরও একটা দিন কেটে গেল। সারা হিন্দুস্থান আজ অস্থির। কেউ জানে না কাল কী হবে? সিপাহীরা জানে না কাল কী হবে। ইংরেজ জানে না কাল কি হবে আমি, আমিও জানি না কাল কী হবে!—আট বছরের মেয়ে এসেছিলাম বিঠুর থেকে ঝাঁসি। সামান্য পুরোহিতের মেয়ে রানী হবে! কত দিনের কথা! একদিন বিঠুরে নানা সাহেব হাতিতে করে যাচ্ছিলেন। আঠাশ উনত্রিশ বছরের যুবক। আমি ছোট্ট মেয়ে আব্দার ধরলাম 'আমিও চড়ব'। নানাজি বললেন—'যা যা পুরুতের মেয়েকে আর হাতী চড়তে হয় না।' রেগে সেদিন বলেছিলাম 'কপালে থাকে দশটা হাতী চড়ব'। রানী, হলাম হাতী ঘোড়া তাঞ্জাম কত কি চাপলাম, হাঃ। নানা ধুন্দুপন্থ! আমাদের দুজনেরই গর্ব চূর্ণ হয়েছে। তুমিও পেশবা হতে পারনি, আজ আমিও আর রাণী নই। দাবা খেলছে ইংরেজ। আমরা কেবল দাবার ঘুঁটি!—ও আমার ভাগ্যদেবী, বল তো ইংরেজ থাকবে না যাবে? আমার এ পথ কোথায় গিয়ে শেষ হবে? কোথায়?

[রানী হাত জোড় করে উর্ধ্বমুখী হয়। মোরোপন্ত প্রবেশ করে। রানীকে ঐ অবস্থায় দেখে কিছু বলতে পারে না। একজন স্ত্রীলোক মহালক্ষ্মীর প্রসাদ নিয়ে আসে। মোরোপন্ত প্রসাদ নিয়ে বলে—'জয় মহালক্ষ্মী'। রানী তাকায়, এসে প্রসাদ নেয়। স্ত্রীলোক চলে যায়।]

রানী—কি সংবাদ বাবা?

মোরোপন্ত—স্কীন রাজী হল না। বলল, 'এই দুঃসময় আমরা পরিজন ছাড়া হতে চাই না। তাছাড়া হাজার হলেও তোমরা ভারতীয়। বিশ্বাস কি তোমাদের।' এতক্ষণ নিশ্চয় আমাদের সাহায্যের জন্য সৈন্য পাঠান হয়ে গেছে। যা হোক রানীকে ধন্যবাদ দিও।

রানী—উঃ কি বোকা! ওরা কি বুঝতে পারছে না সারা হিন্দুস্থান বারুদ হয়ে আছে!

মোরোপন্ত—বুঝতে ঠিকই পারছে কিন্তু অহংকার ছাড়ে কি করে।

রানী—নিজের অহংকারের জন্য অতগুলো প্রাণ!

মোরোপন্ত—এখন এদেশে প্রাণ বড় সস্তা হয়ে গেছে সে কি দেশী কি বিদেশীর। যাক, ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই। ইংরেজ তোমার ওপর যে অন্যায় করেছে তারপরও তুমি ওদের জন্য যা করতে চেয়েছিলে, তোমার বিবেকের কাছে তুমি পরিষ্কার থাকলে।

[মান্দারের প্রবেশ]

মান্দার- মাপ কোর রানী, একজন লোক তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

রানী—কে, কোথা থেকে এসেছে?

মান্দার—হিন্দুস্থানীতে কথা বললে। বেশও হিন্দুস্থানীর। কিন্তু মনে হয় ইংরেজ।

রাণী—ইংরেজ? এখানে এল কী করে? প্রহরীরা কেউ দেখে ফেলেনি তো?

মান্দার—দেখেছে, কিন্তু বোধহয় বুঝতে পারেনি। মোতি সেখানে কি-কারণে যেন গিয়ে পড়ে—নিজের ভাইটাই বলে ওদের হাত থেকে অন্তঃপুরে নিয়ে এসেছে, ওকে কি এখানে নিয়ে আসবে?

রানী—নিশ্চয়। [মান্দার চলে যায়] কে? কে?

[মোতিবাঈ এর সঙ্গে মার্টিনের প্রবেশ]

মোতি—বাঈসাহাব, আমার ভাইকে আর একটু হলেই তোমার প্রহরীরা সিপাহীদের হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন আর কি! ভাগ্যে গিয়ে পড়েছিলাম! বললাম, করিস কি হতভাগারা, কবে ভাইকে চিঠি দিয়েছিলাম আসবার জন্যে। তা এতদিনে ভাইয়ের মনে পড়ল—এই বলে টানতে টানতে নিয়ে এসেছি। দেখ তো রানী, চিনতে পার?

রানী—কে?

মার্টিন—[পাগড়ী খুলে] আমি, মার্টিন রানী—

রানী—মার্টিন! আমার স্বামী মারা যাবার দিন তোমাকে শেষ দেখেছিলাম।

মার্টিন—সেদিনের কথা তুলে আর লজ্জা দেবেন না, কিন্তু আপনি জানেন না আমার বা এ্যালিসের কিছু করবার ছিল না।

রানী—না মার্টিন, প্রাণভয়ে ভীত হয়ে যে আমার কাছে এসেছে, তাকে লজ্জা

দিয়ে আমি নিজেকে বা তোমাকে ছোট করব কেন ? কিন্তু সাহেব তুমি বড় দুঃসাহসিক কাজ করেছ। তোমার হিন্দুস্থানী বেশ নিখুঁত হয়নি। তোমার হিন্দুস্থানী বোলি ঠিক নয়, তুমি যে আমার রানী মহল পর্যন্ত আসতে পেরেছ, বোধহয় একমাত্র ভগবানের দয়ায়।

মার্টিন—তাই বোধহয়, এখন আপনার দয়া চাই। আমাকে ঝাঁসি থেকে বার হবার সাহায্য আপনাকে করতেই হবে। যুদ্ধে প্রাণ দেওয়া যায় কিন্তু এরকম জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকা যায় না।

রানী—কিন্তু কোথায় যাবে ?

মার্টিন—যেখানে এখনও বিদ্রোহ শুরু হয়নি। দতিয়া কিংবা অরছা, আর যদি গোয়ালিয়র পর্যন্ত যেতে পারি—

রানী—কিন্তু কি করে তা সম্ভব ? আমার হাতে এমন কোনো ক্ষমতা নেই। সব ক্ষমতা যে তোমরা কেড়ে নিয়েছ সাহেব—

মার্টিন—তোমার ওপর যে অবিচার আমরা করেছি তার বুঝি তুলনা হয় না! সেই অন্যায়ের জন্যে আমি সমস্ত ইংরেজের হয়ে মাপ চাইছি, রানী, সিপাহীদের বেপরোয়া চীৎকার উল্লাস আমার শরীরের রক্ত হিম করে দিচ্ছে, —যদি কোনো উপায় না থাকে তবে তুমি আমাকে হত্যা কর কিন্তু ওদের হাতে আমাকে—

মান্দার—বাঈসাহাব, যদি আমি আর কাশী ওঁকে শহরের বাইরে অরছার রাস্তায় পেঁৗছে দিয়ে আসি—

রানী—কি উপায়ে ?

মান্দার—সে কথা পরে বলছি। কিন্তু তার পূর্বে সাহেবের বেশভূষা—

মোতি—গায়ের রংটা ঠিক করা দরকার। এ ভার আমি নিচ্ছি। এককালে নাটকওয়ালী ছিলাম তো ? রূপসজ্জা করা শিখেছিলাম, কিন্তু সর্বনাশ হয়েছে।—রং-এর বাক্সটাতো কেল্লার মধ্যে নাট্যশালায় পড়ে আছে। এস দেখি সাহেব, চুলো থেকে ভুষিটুসি এনে তোমাকে বুন্দেলা কিষাণ বানানো যায় কিনা—তার সঙ্গে কোনো ভৃত্যের একটা পোশাকও চুরি করতে হবে। ও আমার সাহেব ভাই, তুমি আমাকে চোর বানিয়ে ছাড়লে!

রানী—যাও মার্টিন সাহেব, বেশভূষা ঠিক করে নও, যদি বেঁচে যাও, তবে বোধহয় তোমার এই বোনের জন্যেই বাঁচবে।

মার্টিন—যদি বেঁচে যাই তবে তোমাদের এ ঋণ কোনো দিন ভুলব না আর ইংরেজের ভুলের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করতে চেষ্টা করব।

[রানীকে অভিবাদন করে মার্টিন মোতির সঙ্গে বেরিয়ে যায়।]

রানী—মান্দার কি উপায় বলছিলে ?

মান্দার—সেদিন শোননি ? যে বিদ্রোহীরা সংকেত হিসেবে চাপাটি আর পদ্মের

পাঁপড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছে অন্য অন্য বিদ্রোহীদের ?

রানী—হ্যাঁ, তাই কি ?

মান্দার—একটু আগে এক সন্ন্যাসী একটা চাপাটি আর পদ্মের পাঁপড়ি দিয়ে গেছে। তোমাকে বিদ্রোহে যোগ দিতে বলছে আর কি। আমরা যদি চাপাটি আর সেই পাঁপড়ি সঙ্গে নিয়ে যাই।

রানী—চমৎকার মান্দার ! চমৎকার বুদ্ধি ঠাউরেছ। কে বলে পুরুষের চেয়ে মেয়েরা কম ?

মোরোপন্ত—সত্যি তোমার বুদ্ধির তুলনা নেই মান্দার, সাহসেরও। কিন্তু আমরা থাকতে তুমি যদি এই রাত্রে কাশীকে নিয়ে সাহেবকে বাঁচাতে যাও, তাহলে কাল আর কারো কাছে মুখ দেখাতে পারব না। তোমার চাপাটি আর পদ্মের পাঁপড়ি আমাকে এনে দাও, আমি রঘুনাথকে নিয়ে যাচ্ছি।

[দূরে সিপাহীদের হল্লা শোনা যায় 'বাহাদুর শাহী চালু হ্যায়, ইংরেজশাহী নেই চলেগা']

রানী—মান্দার যে চল্লিশজন প্রহরী রানী মহলের প্রহরায় আছে, তাদের কেল্লায় ইংরাজ নরনারীদের রক্ষার জন্য পাঠাতে হবে। লছমন রাও থাকবেন ওদের ওপরে—

মোরোপন্ত—তাহলে রানী মহলের কি হবে ?

রানী—এতদিন ধরে তবে রানী মহলের রমণীরা কি শিখল ? যদি নিজেরা নিজেদের রক্ষা করতে না পারে ?

[দৃশ্যান্তর]

[আলো জ্বললে দেখা যায় দামোদর একটা উঁচু জায়গা থেকে দৌড়ে নেমে আসছে. কাঁদছে।]

দামোদর—মা, মা, তিনজন প্রহরী এদিকে আসছিল ঘোড়ায় করে, তাদের মেরে ফেলল। মা তুমি কোথায় ?

[মান্দার, মতি, কাশী, রাও আপ্পা, রঘুনাথ ইত্যাদির প্রবেশ। দামোদর কাশীকে জড়িয়ে ধরে।]

কাশী—এ কি হোল ? সিপাহীরা আমাদের প্রহরীদের খুন করছে কেন ?

[লছমনের প্রবেশ]

লছমন—সর্বনাশ হয়েছে। যে চল্লিশজন প্রহরী রানী পরশুদিন ইংরাজদের পাহারা দেবার জন্য পাঠিয়েছিলেন তারা বাঘী সিপাহীদের দলে যোগ দিয়েছে। আমার কোনো কথা শুনল না। তাই ক্যাপ্টেন স্কীন—পার্সেল, স্কট আর অ্যান্ড্রুজকে ভারতীয় সাজিয়ে রানীর কাছে পাঠিয়েছিল সাহায্যের জন্যে। তারা যখন এই রানী মহলের সামনে এসেছে তখন ঝরু কুমারের ছেলে অ্যান্ড্রুজকে চিনতে পেরে চীৎকার করে প্রাচীর থেকে লাফিয়ে পড়ে।

অ্যান্ড্রুজের ঘোড়া ভয় পেয়ে অ্যান্ড্রুজকে ফেলে দেয়। ঝরুর ছেলে তাকে হত্যা করে। সিপাহীরা দেখতে পেয়ে এসে আর একজনকে হত্যা করে, অপরজন পালিয়ে যায়।

দামোদর—আমি দেখেছি। উঃ কি রক্ত। হোলির দিনের মত ফিনকি দিয়ে রক্ত আকাশে উঠে যাচ্ছে।

মোতি—ভাগ্যে মার্টিন সাহেব পরশু পালিয়ে যেতে পেরেছিল। ওরা যে ঠিক করে ভারতীয় সাজতে জানে না।

লছমন—বাঈসাহেবা কোথায় ?

মান্দার—পূজার ঘরে তো ছিলেন।

[রানীর প্রবেশ, পরণে সাদা চান্দেরী। কপালে সাদা চন্দনের টিপ। এক মুহূর্ত সবাই চুপ, তারপর কলরব ওঠে। দামোদর মাকে জড়িয়ে ধরে।]

রানী—[সকলকে চুপ করতে বলে] সব শুনেছি, আর কিছু করবার রইল না। এই উন্মত্ততায় বাধা দেবার শক্তি আমার নেই। বাবা, মৃতদেহগুলো কবর দেবার ব্যবস্থা কর।

আপ্পা—একশ বছর অত্যাচারের পুঞ্জীভূত রাগ অসম্মানের বোঝা—

রানী—তাই-ই, কিন্তু ঘটনাটার গুরুত্ব বুঝতে পারছ কেউ ? রানী মহলের সামনে তারা খুন হল। ইংরেজ কি আর কখনও বিশ্বাস করবে যে আমি এর মধ্যে ছিলাম না। ঝরুর ছেলে এ কি করল !

আপ্পা—মনে আছে মাত্র দেড়মাস আগে এই ঝরুকে বাজারে দাঁড় করিয়ে অ্যান্ড্রুজ চাবুক মেরেছিল ?

[একজন প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী—সিপাহীরা কেল্লা ঘিরে ফেলেছে, ইংরেজদের আত্মসমর্পণ করতে বলছে। স্কীন সাহেব এই চিঠি বাঈসাহেবকে পাঠিয়েছে।

রানী—[চিঠি নিয়ে] আপনার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেলে আমরা আত্মসমর্পণ করতে রাজী আছি।

[সিপাহীদের চীৎকার ঃ আত্মসমর্পণ কর, বেরিয়ে এস, বাহাদুর-শাহি চালু হ্যায় ইত্যাদি।]

কয়েকজন—তাহলে কি করা ? বাকী সিপাহীরা ক্ষেপে গেছে।

রানী—এত দায়িত্ব যদি দিলে ভগবান, তবে আর একটু ক্ষমতা দিলে না কেন ?

মান্দার—তুমি ভেঙে পড়লে সব শেষ হয়ে যাবে।

রানী—না, না, ভেঙে আমি পড়িনি। আর আমি কার কাছে অভিযোগ করতে পারি এক ভগবান ছাড়া। কার কাছে আর কি চাইতে পারি ?

[মোরোপন্তের প্রবেশ]

মোরোপন্ত—স্কীন সাদা জামা দেখিয়ে সন্ধি করতে চেয়েছিলেন। বৃদ্ধ সালে

মামুদ তার সঙ্গে কথা বলে তাকে আশ্বাস দিয়েছে যে তাদের প্রাণে মারা হবে না। ওরা আত্মসমর্পণ করার পর ওদের দোকান বাগানে নিয়ে যাওয়া হবে। সেখান থেকে অরছা বা সাগরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

রানী—ওঃ, বাঁচলাম আমার ওপর থেকে একটা গুরুভার নেমে গেল। যাও যাও, তোমরা যে যার কাজে যাও। ইংরেজ বা সিপাহী কেউ আমাদের কিছু করবে না। কারণ আমরা দুপক্ষেরই মঙ্গল চাই।

[দু-একজন ছাড়া সবাই চলে যায়]

আপ্পা—দুপক্ষেরই মঙ্গল একসঙ্গে চাওয়া যায় ?

রানী—যায়। তর্কের মধ্যে যেতে চাই না। আমাকে এখন রানী মহলের প্রত্যেকটি লোককে আশ্বস্ত করতে হবে। বাবা, আরস্কাইনের কাছে আর একটা চিঠি পাঠাও, লেখ যে, সিপাহীদের কাজের সঙ্গে লক্ষ্মীবাঈ-এর কোনো সম্পর্ক নেই। তার সাথে মামুদকে লেখ তাঁর প্রতিশ্রুতি তিনি যেন অবশ্যই পালন করেন আমার অনুরোধ।

আপ্পা—বাঈসাহেব, তুমি কি স্পষ্টতঃই সিপাহীদের বিরুদ্ধে যাচ্ছ না ?

রানী—তোমরা সকলেই জান ইংরেজের চেয়ে বড় শত্রু আমার কেউ নেই। তবু আমি নিরস্ত্র ইংরেজ হত্যা সমর্থন করি না। সিপাহীরা ঝাঁসির লোক নয়, কেউ এসেছে বিহার, কেউ মুলতান—কেউ লক্ষ্ণৌ থেকে। তাদের কি ? তারা তো হত্যা করে চলে যাবে। তারপর ? ইংরেজ সৈন্যদের মুখোমুখি হবার শক্তি আমাদের আছে ?

আপ্পা—তোমার যুক্তির সামনে কিছু বলা মুস্কিল কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এটাও ঠিক হচ্ছে না।

রানী—দেখা যাক। যখন বাজী রাখতে হয় দেখি কি দান পড়ে !—নাঃ, আনন্দের খিদে পেয়ে গেছে—খাওয়াতে নিয়ে যাই।

দামোদর—আমার একদম খিদে নেই।

রানী—লছমন চিঠি লিখে নিয়ে এস। এখনি পাঠাতে হবে। তোমার খিদে পায়নি তো, আনন্দ ? আমার খিদে পেয়েছে, চল আমাকে খাইয়ে দেবে চল।
[সঙ্গীত। আলোর মিশ্রণ। ভোরের সঙ্গীতকে ছিন্ন করে দিয়ে অনেক বন্দুকের শব্দ। আর্তনাদ। মঞ্চের একদিকে আলো পড়ে, কালে খাঁ বখশীস আলী ও অন্য একজন সিপাহীকে দেখা যায়।]

কালেখাঁ—সব—সব কটাকে শেষ করেছ ?

বখশীশ—স—ব।

কালেখাঁ—গুণে দেখেছ ক'টা ?

সিপাহী—আমি দেখেছি বাচ্চাটাচ্চা মিলিয়ে ষাট পঁয়ষট্টি হবে।

বখশীশ—আমার বখশিস ?

কালেখাঁ—আরে তুমি নিজেই তো বখশিস। হবে হবে। ওঃ, এতদিনে এত অত্যাচারের একটা প্রতিশোধ নেওয়া গেল। কিন্তু এখানে আর আমাদের কি কাজ। দিল্লিতে গিয়ে সামিল হতে হবে। চল এবার দিল্লি চল।

[অনেক কণ্ঠ—চল চল দিল্লি, দিল্লি চল]

কালেখাঁ—কিন্তু দিল্লি যাবার আগে কিছু টাকা চাই তো! কোথায় পাই?

বখশীশ—রানী দেবে, রানীর কাছে শুনেছি অনেক টাকা আছে।

কালেখাঁ—ঠিক বলেছ। রানীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তোমাদের বখশিস করব। চল রানী মহলে।

বখশীশ+সিপাহী—চল রানী মহল!

[রাণী মহলের প্রকোষ্ঠ, রানী অন্য সকলে এবং কালেখাঁ, বখশীশ ইত্যাদি।]

রানী—তিন লক্ষ টাকা আমি কোথায় পাব? ভুলে যাবেন না, আমি ঝাঁসির রানী নই। আমি সামান্য বেতনভোগী নাগরিক।

কালেখাঁ—তা বললে কি হয়? কত বড় রাজবংশ আপনাদের। আপনাদের এক একটা হীরা জহরতের দামই তো!

রানী—সে সব অলংকার আমার কাছে নেই, ইংরেজের কাছে। যে কাজ আপনারা করেছেন, ওর পরিণতি কি হবে কে জানে!

কালেখাঁ—বুঝতে পারছি আমার কাজ আপনি পছন্দ করেননি, কিন্তু ইংরেজকে তাড়াতে হলে এছাড়া উপায় নেই। কেন? ইংরেজকে তাড়াতে আপনি চান না?

রানী—[কি ভাবে]—চাই নিশ্চয়ই চাই! ইংরেজ তাড়াতে গেলে আমারও তো কিছু অর্থ প্রয়োজন। কোথায় পাব বলুন!

কালেখাঁ—দেখুন রানী, আপনি টাকা না দিলে সিপাহীরা আপনাকে ভুল বুঝতে পারে। ওরা ভাববে আপনি ইংরেজের বন্ধু।

রানী—আপনি বোঝালে অবশ্য তাই বুঝবে। তবে আমি ইংরেজকে শত্রু বলেই মনে করি। এদেশে ওদের থাকাটা ধর্মত উচিত না। তাই বলে নারী শিশু—

কালেখাঁ—ওরা আমাদের দেশের ওপর যা যা করেছে তার তুলনায় এটা কিছুই না। হয়তো একদিন আপনিও বুঝতে পারবেন। থাকগে টাকা আমার দরকার—ওটা দিতে হবে। তারপর এই রাজ্য তো আপনারই হয়ে গেল। আমি বরং বাহাদুরশাহকে বলে ফরমান পাঠাবার চেষ্টা করবো।

রানী—যখন আপনি টাকা না নিয়ে ছাড়বেন না—দেওয়ানজী [লক্ষ্মণরাও বান্দা এগিয়ে আসে]

লছমন—বলুন বাঈসাহেব?

রানী—আমাদের তহবিলে কত আছে ?
লছমন—হাজার তিরিশ হবে।
রানী—দেখুন খাঁ সাহেব, আপনাকে আমি ওই তিরিশ হাজারের সঙ্গে আমার সামান্য গহনা যা আমার কাছে আছে—সব মিলিয়ে এক লাখ দিতে পারি। এতে যদি আপনার হয় ভালো না হলে—
কালেখাঁ—না হলে ?
রানী—আপনার যা অভিরুচি আপনি করবেন।

[কালে খাঁ সিপাহীদের দিকে তাকায়]

কালেখাঁ—বেশ তাই হোক।
রানী –লছমন, যাও ওদের টাকাটা দিয়ে দাও।
কালেখাঁ—ঝাঁসী লক্ষ্মীবাঈ কা—
সিপাহীদ্বয়—ঝাঁসী লক্ষ্মীবাঈ কা—

[ওরা চলে যায়। রানী অনেকক্ষণ মাথা চেপে ধরে বসে থাকে।]

রানী—বাবা—
মোরোপন্ত—বল মা—
রানী—ওদের সকলের কবর সম্পন্ন হয়েছে ?
মোরোপন্ত—হ্যাঁ, সম্পন্ন হয়েছে।

[আলো কমে গিয়ে আবার বাড়ে। দেখা যায় ওপরের অলিন্দে দামোদর দাঁড়িয়ে আছে। সিপাহীদের পদশব্দ শোনা যায়। চীৎকার করতে করতে তারা চলেছে]

[মুলুক খুদাতাল্লাহ্ কা
মুলুক বাহাদুরশাহ কা
অম্মল লক্ষ্মীবাঈ কা
ঝাঁসি লক্ষ্মীবাঈ কা
বাহাদুরশাহী চালু হ্যায়,
ইংরেজশাহী নহি চলেগী
চলো চলো দিল্লি চলো]

দামোদর—[চীৎকার করে] দাদা, দিদা মান্দারবাঈ, তোমরা সবাই দেখে যাও সিপাহীরা সব দিল্লি চলে যাচ্ছে, কত—ক—ত সিপাহী—ওরে বাপ—গোণা যাবে না [নকল করে] চল দিল্লি চল। অম্মল লক্ষ্মীবাঈ কা ঝাঁসি লক্ষ্মীবাঈ কা—
রানী—[নীচে থেকে] আঃ আনন্দ। কি হচ্ছে। এসো তুমি আমার কাছে এসো! সত্যি তুমিই আমার একমাত্র আনন্দ। বাবা, হত্যাকাণ্ডের পর আরও দুটো চিঠি পাঠিয়েছি কিন্তু কোনো উত্তর কেন এল না ?

মোরোপন্ত কি জানি কিছু বুঝতে পারছি না, এদিকে শহর একেবারে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে।

[প্রহরীর প্রবেশ]

প্রহরী—সাগর থেকে ইংরেজের দূত এসেছে।

রানী –সসম্মানে নিয়ে এস।

[ইংরেজের দেশীয় দূতের প্রবেশ এবং রানীকে অভিবাদন।]

রানী—আসন গ্রহণ করুন।

দূত আমি একজন সামান্য দূত, ঝাঁসীর রানীর সামনে বসবার ধৃষ্টতা আমার নেই।

রানী—তার অর্থ ?

দূত—অর্থ এই দুটো পত্র পড়লেই বুঝতে পারবেন।

রানী—[রানী পত্র নিয়ে পড়েন] সাগরের কমিশনার লিখছেন আরস্কাইনের ঘোষণাপত্রে সব জানতে পারবো। [ঘোষণাপত্রটি রাও আপ্পাকে দেন। রাও আপ্পা পড়তে থাকেন।]

রাও আপ্পা—সরকারী জেলা, ঝাঁসির বাসিন্দা এবং প্রজাবর্গকে জানানো হচ্ছে যে সিপাহীদের অন্যায়ের ফলে অনেক ক্ষতি হয়েছে। শক্তিশালী ক্ষমতাবান ব্রিটিশ সরকার প্রত্যেকটি বিদ্রোহী এলাকায় সহস্র সহস্র ইউরোপীয় সৈন্য পাঠাচ্ছেন। আইন শৃঙ্খলা তারাই রক্ষা করবেন। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন ব্রিটিশ শাসন পদ্ধতি অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকারের হয়ে ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ ঝাঁসি শাসন করবেন। ব্রিটিশ ফৌজ দিল্লি পুনরধিকার করেছে। বিদ্রোহীদের যেখানেই পাওয়া যাবে হত্যা করা হবে—।

ডাবলিউ সি আরস্কাইন।

রানী—(আপন মনে) বিদ্রোহীদের যেখানে পাওয়া যাবে হত্যা করা হবে ?

দূত—রানী সাহেবা তাহলে আমি যাই ? কোনো পত্র দেবেন কি ?

রানী - এ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়। আজকের রাতটা বিশ্রাম করো। কাল আমার পত্র নিয়ে যাবে। আর হ্যাঁ, তোমার এই সুখবর আনার জন্যে আমার পুত্র দামোদর তোমাকে এই মুক্তোর মালা দিয়ে পুরস্কৃত করছে।

[দামোদরের গলা থেকে মালা খুলে দূতকে দেয়। দূত চলে যায়।]

রানী—রাও আপ্পা, লছমনজী, বাবা—এই আদেশের কথা ঝাঁসির সর্বত্র প্রচার করো। এবং রানী মহলের প্রত্যেককে কেল্লায় ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বল।

দামোদর—মা আজ কি বাজী পুড়বে ?

রানী—না বাবা, দেশের এই দুর্দিনে বাজী পোড়াব না।

[গঙ্গুবাঈ, মোতিবাঈ সহ পুরনারীদের প্রবেশ, অনেকের হাতে অসি।]

গঙ্গুবাঈ—বাঈ সাহেব, আমরা একটু নৃত্যগীত করবো। তুমি বাধা দিও না।
কয়েকজন—হ্যাঁ, আমরা একটু নাচগান করবো।

[সকলে গান গায় এবং অসিতে অসিতে ঠুকে ঠুকে নাচতে থাকে।]

[বিরতি]

[কেল্লায় রানীর দরবার কক্ষ। রানী পরেছেন নীল চান্দেরীর বুটিদার আচকান। গাঢ় নীল চিপা পাজামা, মাথায় ছোট পাগড়ী। কণ্ঠে মুক্তোর মালা—হাতে তলোয়ার, কোলের কাছে দামোদর। পেছনে মান্দার ইত্যাদি অন্তঃপুরিকারা। সভাসদরা সকলে আছেন। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে দরবার শুরু হোল। পর্দা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে –]

সকলে—জয় ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈএর জয়।

রানী—এতদিন পর ঝাঁসি তার উপযুক্ত মর্যাদা ফিরে পেয়েছে। কিন্তু এখন আমাদের খুশী হয়ে বসে থাকবার সময় নেই। যদিও ঝাঁসির ন্যায়সঙ্গত আইনসঙ্গত রানী আমি, তবু তোমরা জান আমার জ্ঞাতি শত্রুরা কিভাবে এই রাজত্ব গ্রাস করতে চেয়েছিল। সেনাপতি খোস খাঁকে আমাদের অজস্র ধন্যবাদ যে তিনি নাথুরাম সদাশিব রাও এবং অরছার রানীকে ঝাঁসিতে ঢুকতে দেননি। নিতান্ত অরাজক অবস্থা থেকে ঝাঁসিতে শৃঙ্খলা আনা হয়েছে। শিল্প বাণিজ্য চালু হবার ফলে সাধারণ লোকের রুজি রোজগার হচ্ছে। আমার কেল্লার মধ্যে সৈনিকদের জন্যে সেবা প্রতিষ্ঠান চালু হয়েছে। তবে সারা হিন্দুস্থানে এখনও অরাজক অবস্থা চলছে। তাই সবরকম অবস্থার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আমার রাজ্যে হিন্দু মুসলমান উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ আপাত কোনো প্রভেদ থাকবে না। সেনা বাহিনীতে যে কোনো বর্ণের লোক যোগ দিতে পারবে। জ্ঞাতি শত্রু দমনে যে সব সৈনিক প্রাণ দিয়েছে তাদের বিধবাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। গোলাম খোস খাঁ যাঁর বীর্যের জন্য এই আক্রমণ প্রতিহত করা গেছে তাঁকে আমি আমার এই স্বর্ণালংকার সমস্ত দিয়ে পুরস্কৃত করতে চাই।

[খোস খাঁ এগিয়ে এসে পুরস্কার নেয়। সবাই বলে—'ঝাঁসির রানীর জয়।']

আমার দেওয়ান লছমন রাও বান্দেকে আমি দেওয়ান পদ থেকে প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত করলাম এবং রঘুনাথ সিংকে আমার দেওয়ান পদে নিযুক্ত করলাম। [দুজনে এগিয়ে এসে পত্র নেয়]

আর সকলে যে যেমন আছেন তেমনি থাকবেন। আর এক কথা, পওয়ারের রাজপুত সর্দারেরা জবাহর সিং দলীপ সিং গঙ্গাধর রাওএর আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। আপনাদের ওপর আমার কোনো জোর নেই। আপনারা ইচ্ছা করলে স্বচ্ছন্দে আপনাদের পুরনো রাজ্যে ফিরে যেতে পারেন।

[জবাহর সিং দলীপ কুঁয়ার এগিয়ে আসে।]

দলীপ—রানী, আমরা এতদিন ঝাঁসির নিমক খেয়েছি। তাই আমাদের আনুগত্য একমাত্র ঝাঁসির রানীর প্রতি।

জবাহর—জো নিমক খায়ো ঝাঁসি রাজ কো

তো মান লয়ি বাঙ্গকো রাজ—

আর কৈসে ছোড়ি নিমক কি বাত।

ঔর মান ভরি লা—(সকলে তারিফ করে)

রানী—নিশ্চিন্ত হলাম। আপনি তো একজন কবিও বটে। নিশ্চিন্ত হলে একদিন আপনার কবিতা শুনব।

খোসখাঁ—রানী, অনুমতি হয়তো আমি দুএকটা কথা বলি—

রানী—নিশ্চয়ই—

খোসখাঁ—রানী, তোমার অধীনে কাজ করে যুদ্ধ করে যে আনন্দ পেয়েছি এমন আর কখনও পাইনি। জানি না এ আনন্দ সৈনিকেরা আর কোথাও পায় কিনা। তুমি নারীর কুণ্ঠা ভুলে গিয়ে সাধারণের ভাল করবার জন্য হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের সঙ্গে মিশেছ। যুদ্ধের সময় আমাদের সঙ্গে কামান চালিয়েছ। তুমি মারাঠার মেয়ে কিন্তু বুন্দেলখণ্ডী কিষাণদের সঙ্গে মিশে তাদের সুখ-দুঃখের সামনাসামনি হয়েছ। তাদের খাজনা মুকুব করেছ। সৈনিকরা আহত হয়ে যখন কেল্লার সেবা-ঘরে এসেছে তুমি তাদের সেবা করেছ। আল্লাহ জীবনে তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছেন বোধহয় তোমার প্রজাদের একদিন এত সুখ হবে বলে, তাই আমরা, তোমার প্রজারা তোমাকে সামান্য রানী বলে মনে করে না, কেবল রানী বলে মানে না, তারা তোমাকে মা বলে মনে করে। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। [সকলের হর্ষধ্বনি]

রানী—তোমাদের এই বিশ্বাসে প্রীতিতে আমি অভিভূত। আমরা ঝাঁসির মানুষেরা, ধনী, গরীব উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ সবাই একসঙ্গে কাজ করে ঝাঁসির দারিদ্র্য দূর করব। একদিন সকলে বলবে হিন্দুস্থানের মধ্যমণি ঝাঁসি, আমরা ক্ষুদ্র কিন্তু ছোট নই। ক্ষুদ্র কুশ যেমন বিস্তৃত আকাশের ছায়া নিজের বক্ষে ধরতে পাবে,—আমাদের ক্ষুদ্র ঝাঁসিও একদিন সেইরকম সারা হিন্দুস্থানকে প্রতিফলিত করবে।

[সকলের হর্ষধ্বনি]

লছমন রাও—আর কারুর কিছু নিবেদন আছে ?—বেশ, তাহলে সভা ভঙ্গ হল।

[সকল লোক চলে যায়। লছমন রাও, আপ্পা মোরপন্ত আলাদাভাবে রানীর কাছে বিদায় নিতে আসে।]

রানী—এবার আমাদের কোন বাহিনী সবচেয়ে মজবুত করা দরকার বলতে পার ?

[সবাই জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়]

কি, বলতে পারবে না ?

লছমনরাও—পারব। গুপ্তচর বাহিনী।

রানী—এই জন্যেই তোমাকে আমার প্রধানমন্ত্রী করেছি বান্দামাহার!

[সবাই হেসে বিদায় নেয়]

রানী—আনন্দ, কেমন লাগল ?

দামোদর—সবাই তোমাকে খুব ভালবাসে, না মা ? [দামোদর রানীকে জড়িয়ে ধরে]

রানী—হ্যাঁ, আর তুমি ? সকলের ভালবাসা পেতে গেলে সকলকে ভালবাসতে হয়।

[মান্দারের প্রবেশ।]

মান্দার—বাঈসাহাব, গোপালবাও সিরেস্তাদার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ওর নাকি কি সব বলবার আছে।

রানী—তা দরবারে বলল না কেন ?

মান্দার—আমিও তো সেই কথা বললাম, তা এ আলাদা রকমের কথা।

রানী—আসতে বল। দামোদর, তুমি যাও কাশীবাঈএর কাছে। পোশাক বদলে পাঠ নেবার জন্য তৈরি হও।

[মান্দারের সঙ্গে গোপালের প্রবেশ, মান্দার দূরে দাঁড়ায়।]

রানী—কি ব্যাপার গোপাল।

গোপাল—আমার একটা আর্জি, না কমপ্লেন, না মানে সিকায়েত মানে অভিযোগ ছিল।

রানী—(হেসে ফেলে) বেশ তো বল!

গোপাল—দেখ রানী, আমি তোমার স্বজাতি সিরেস্তাদার, আমি ইংরেজী জানি। এই চারমাস আমি কত চিঠি ইংরেজীতে লিখেছি তোমার হয়ে ? আজ দরবারে' ভেবেছিলাম আমার জন্যেও একটা সারপ্রাইজ মানে, আশ্চর্য কিছু থাকবে!

রানী—গোপাল, স্পষ্ট করে বল।

গোপাল—মানে আমিও একটা প্রমোশন মানে পদোন্নতি পাব।

রানী—কার এমন পদোন্নতি দেখলে ?

গোপাল—কেন ? খোস খাঁ অত পুরস্কার পেল! লছমন রাও প্রধানমন্ত্রী হয়ে গেল!

রানী—গোপাল! খোস খাঁ লছমন রাও এর সঙ্গে তোমার তুলনা! ওঁদের ক্ষেত্রে ওঁরা অদ্বিতীয়।

গোপাল—আমার ক্ষেত্রটাও তুমি বিবেচনা কর। ঝাঁসিতে আর কে ইংলিশ জানে ?

রানী—গোপাল, সংযত হয়ে কথা বল। পয়সা দিলে দশটা কেরানী পাওয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে খোসখাঁ একটাই হয়।

গোপাল—কিন্তু এখনি তো তুমি এক গোপালকে ছাড়া কাউকে পাচ্ছ না!

রানী—তুমি জান না গোপাল। আমি রানী হবার পর কত বাঙালীবাবু আমার কাছে এই কাজের জন্য সংবাদ পাঠিয়েছে?

গোপাল—তারা আমার মত বিশ্বাসী হবে?

রানী (একটু থেমে) গোপাল, তুমি বিশ্বাসী তো?

গোপাল—বাঃ।

রানী—ইংরেজ তোমাকে যে মাস মাইনে দিত আমিও তাই দিচ্ছি। ইংরেজের সহযোগিতা করেছিলে বলে সিপাহীরা যখন তোমাকে নির্যাতিত করছিল আমি তোমাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি—মনে আছে?

গোপাল—রানী সাহেবা, যদি কোন অন্যায় করে থাকি মাপ কর।

রাণী—উচ্চাশা থাকা নিশ্চয়ই ভাল তবে নিজের কতটা ক্ষমতা সেটা বোঝা দরকার। তোমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিতে বলব। যাও।

[গোপাল কুর্নিশ করে চলে যায়]

রানী—মান্দার, এই গোপালের ওপর নজর রাখতে হবে।

[রানী উঠে দাঁড়ায়, আলো নেভে, মঞ্চের ওপর পাশে আলো, গোপালকে দেখা যায়।]

গোপাল—[নিজের মনে] তোমার চোখ দেখে বুঝতে পেরেছি বাবা যে তুমি আমাকে কি চোখে দেখেছ। এতদিন খাটিয়ে প্রমোশন দিলে না! বউকে বলে রেখেছি ইংলিশ ইয়ারিং দেব—এখন? অবশ্য উপরি যা পাই তাতে—উপরি কোন্ কেরানী বাবু না নেয়। বাঙালীবাবুরা উপরি নিয়ে নিয়ে শেষ বয়সে বাংলায় ফিরে ইংরেজের পায়ে তেল দিয়ে রাজা হয়ে বসছে। ইংরাজই কম কি? না হলে এক হাজার টাকা মাস মাহিনা নিয়ে বছরের শেষে ইংল্যাণ্ডে বিশহাজার টাকা পাঠাও কি করে?—বাবা, ইংরাজ শরণং গচ্ছামি। হুঁ, ইংরেজ বুদ্ধির কাছে তোদের বুদ্ধি! কেরানী বলেই তো আমার কাছে সব খবর আসে। বিলাত আরব চীন থেকে সব ইংরাজ সৈন্য তলব করে আনা হচ্ছে। বড়লাট ক্যানিং নিয়ে আসছে সব। দেবে'খন, তখন তোদের ঐ ঘনগর্জ আর কি শংকর কামান ঠেকাতে পারবে? নাঃ, অনেক চিন্তা করতে হবে। তবে গোপালের এই চিন্তা আর দূরদর্শিতা ছিল বলেই, ক'দিন আগে আরস্কাইনের কাছে একটা চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি যে, জোকান-রাগের ইংরাজ হত্যার মূলে রানী ছিল। নিমক একথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি কার নিমক আগে খেয়েছিলাম? ইংরেজের। তবে? নিমকহারামী করা কি ঠিক হবে? তাছাড়া আজ দরবারের শেষে মহামান্য ইংরেজ 'কোম্পানীর জয়' বলল না তো? এ তো বিদ্রোহ, ক্লিয়ার বিদ্রোহ, গোপালের মাথা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। [লেখার ভঙ্গীতে] মহামান্য কোম্পানী, রানী

তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে বলে সব ঠিক করেছে। ব্যস ক্লিয়ার। পুরুতের মেয়ে। আমি রানী! দেখাচ্ছি। [চলে যায়]

[মঞ্চের অপরদিকে আলো, মেজর আরস্কাইন দেশী বিদেশী অফিসার বেয়ারা ইত্যাদি।]

আরস্কাইন—রানীর সমস্ত চিঠি তাহলে ছলনা! আমাকে বোকা বানিয়ে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে? এ স্নেক ইন দি গ্রাস? এই দেখ গোপাল সিরেস্তাদারের চিঠি। তলে তলে রানীর নানা সাহেবের সঙ্গে যোগ আছে। কানপুরে ব্রিটিশ সৈন্যরা বিজয়ী যে একথা বলছে তার প্রাণদণ্ড হচ্ছে? বখশীশ আলী দিল্লি থেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে রানীর সঙ্গে যোগ দিতে আসছে। ওঃ ওঃ।

১ম ক্যাপ্টেন—কিন্তু আপনি তো বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েই রানীকে শাসনভার দিয়েছিলেন?

আরস্কাইন—এই কথাটাই ভুল। আমি শাসনভার-টার দিইনি। বুঝেছ কথাটা? কলকাতায় এখনি খবর পাঠাও। ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এখনই আমার অনেক সৈন্য আর যুদ্ধের মালমশলা চাই। এখনি টরেটক্কা চালু করে দাও। ওঃ, ভাগ্যে কিছুদিন আগে থেকে টেলিগ্রাফটা চালু হয়েছিল। কিছু একটা না করলে আমার চাকরী থাকবে না। হাঁ করে কি দেখছ, টরেটক্কা চালু কর। [একজন ছুটে বেরিয়ে যায়।] ক্যাপ্টেন ক্লার্ক!! একটা ছোটখাট বিদ্রোহ বা অমন কিছু দমন করে এখনই ফোর্টউইলিয়ামকে খবর পাঠাতে হবে।

ক্যাপ্টেন ক্লার্ক—স্যর, কিছু নেটিভকে ধরে গাছে ঝুলিয়ে দেব আবার?

আরস্কাইন—ঐ পার, নিরীহ লোকদের গাছে ঝোলাতে! নাম চাই। নাম। যে নাম ফোর্ট উইলিয়ামের খাতায় পাওয়া যাবে। [একজন কেরানী এগিয়ে আসে] কে?

কেরানী—স্যর, আমি একজন রাইটার করণিক।

আরস্কাইন—এ সময় কি চাও?

কেরানী—স্যর আমি আপনাকে সাহায্য করতে এসেছি। এখান থেকে তিন মাইল দূরে গোন্ডরাজ শঙ্কর শাহ আর তার ছেলে রঘুনাথ শাহ থাকে। শঙ্কর শাহ অবশ্য বৃদ্ধ, তবে গুপ্তচরের কথা লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু রঘুনাথ শাহ সুযোগ পেলেই—

আরস্কাইন—এরা সত্যি রাজা?

কেরানী—এককালে ছিল। ওদের জায়গা জমি সমস্তই আমরা কেড়ে নিয়েছি। মাটির ঘরে থাকে, শাকভাত খায়। ঐ রাজা খেতাবটা কেমন ভুল করে কেড়ে নেওয়া হয়নি—সবাই বলে রাজা।

আরস্কাইন—আমাদের দেশীয় রাজাদের লিস্টএর সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছ ?

কেরানী—হ্যাঁ স্যার, এরা সেই বিখ্যাত গোন্ডরাজাদের বংশধর। এদেরই কোন প্রপিতামহী হচ্ছেন রানী দুর্গাবতী—সেই যিনি বাদশাহ আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।

আরস্কাইন—ব্যস ব্যস, বাপ ছেলে দুটোকেই ধর। এমন শাস্তি ওদের দেবে যে একটা এক্সাম্পল হয়ে থাকবে।

[মঞ্চ অন্ধকার হয়। অশ্বখুরের শব্দ আলোকিত হলে দেখা যায়—ক্লার্ক আরও কয়েকজন সৈন্য।]

ক্লার্ক—এটা কি রাজা শঙ্কর শাহর বাড়ী ? রাজা শঙ্কর শাহ বেরিয়ে এস।

[অন্য সকলেই চীৎকার করতে থাকে। বৃদ্ধ শঙ্কর শাহ বেরিয়ে আসে।]

শঙ্কর—এত রাত্রে তোমরা কে ?

ক্লার্ক—তুমি রাজা শঙ্কর শাহ ?

শঙ্কর—রাজা বলে বিদ্রূপ করছ ? দেখতেই পাচ্ছ মাটির বাড়ী—

ক্লার্ক—স্টপ ইট, তোমার ছেলে কোথায় ?

শঙ্কর—ঘুমচ্ছে।

ক্লার্ক—বাবাঃ, এত চীৎকারেও ঘুমচ্ছে ? নেশা করে ? তোমরা বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছ ?

শঙ্কর—এ কথা ঠিক না।

ক্লার্ক—চুল তো সাদা হয়ে গিয়েছে। মিথ্যা কথা বলছ, পরলোকের ভয় নেই ? পরলোক মান না ?

শঙ্কর—আমাদের কোন মানা না মানার সম্মান কি তোমরা দিতে চাও সাহেব ?

ক্লার্ক—হাউ দ্য ক্যাট ইজ আউট অব দি ব্যাগ। এই, তোমরা ওর ঘর সার্চ কর। কোন কাগজপত্র পেলে নিয়ে আসবে।

[সৈনিকরা ঘরে ঢোকে। আর্তনাদ গোলমাল শোনা যায়। একটু পরে রঘুনাথ শাহকে পিছমোড়া করে বেধে নিয়ে আসে।]

১ম সৈনিক—এই যে ক্যাপ্টেন, বালিশের নীচে এই বইটা পাওয়া গেছে—

ক্লার্ক—কি লেখা আছে পড়।

১ম সৈনিক—আমি ঠিক পড়তে পারব না। মানে এটা দেব ভাষায় লেখা।

২য় সৈনিক—আমি পারি স্যার। আমার বাড়িতে ও চর্চা একটু ছিল।

ক্লার্ক—দেখ এর মধ্যে বিদ্রোহীরা কি সংকেত দিয়েছে।

শঙ্কর—ওটা চণ্ডী। অনেক হাজার বছর আগে লেখা হয়েছে। ওতে বিদ্রোহীদের সংকেত কি করে থাকবে ?

ক্লার্ক—ইউ শাট আপ। পড়।

২য় সৈনিক—এই যে স্যার পাওয়া গেছে। এখানে লেখা আছে, "হে শত্রু

সংহারিকা, তুমি শংকরের প্রতি প্রসন্ন হও। নিধন কর তোমার শত্রুকে"।

ক্লার্ক—কি, এবার কি বলবে রাজা শঙ্কর ?

রঘুনাথ—মূর্খ ! ওটা চন্ডীর শ্লোক।

ক্লার্ক—কি ? আমাকে মূর্খ বলা ! [ঘুসি মারে] চল জব্বলপুরে, যখন ফাঁসিতে ঝুলবে—

শঙ্কর—আমাকে তোমরা হত্যা করতে পারবে না। আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবে আরো মানুষ।

ক্লার্ক—চুপ করো। বক্তৃতা করতে হবে না চল।

[মঞ্চ অন্ধকার হয়]

[আবার আলো জ্বলে। আরস্কাইন বসে আছে। ক্লার্ক সামনে দাঁড়িয়ে।]

আরস্কাইন—একটা কাজের মত কাজ করেছ। শংকর শাহ আর ওর ছেলেকে কামানের মুখে বেঁধে কামান দেগে উড়িয়ে দাও। দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যাক। শেয়াল শকুনি খাক।

ক্লার্ক—এই ধরনের মৃত্যুকে এরা খুব ভয় করে। সৎকার না হলে আত্মা চিরদিন অশান্তিতে ঘুরে বেড়াবে তো।

আরস্কাইন—ঢ্যাঁড়রা পিটিয়ে দাও—নগরবাসী এই শাস্তি দেখবে, ওর পরিজনদের বাধ্য করবে এই শাস্তি দেখতে।

ক্লার্ক—আচ্ছা স্যার।

[স্যালুট করে বেরিয়ে যায়। কামানের গর্জন। আর্তনাদ। মঞ্চের অপর পাশে আলো পড়ে। সভাসদবৃন্দ সহ রানী।]

রানী—তারপর ?

চর—তারপর শঙ্কর শাহর স্ত্রী রঘুনাথ শাহর স্ত্রী পরিজন সবাই অজ্ঞান হয়ে যায়। কয়েক খন্ড মাংস তাদের হাতে দিয়ে বলা হয় সৎকার করতে।

[মেয়েরা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে]

রানী—এরকম নারকীয় অমানুষিক ঘটনার কথা এর আগে আমি শুনিনি। আমাদের ওরা মানুষ বলে মনে করে না ! লছমনজী রঘুনাথ তাঁতিয়া টোপী আর নানা সাহেবের চিঠির উত্তর দাও—আমি বিদ্রোহিণী।

[দ্বিতীয় চরের প্রবেশ]

গোপালকে আসতে বল।

বল চর, কি সংবাদ ?

২য় চর—বিখ্যাত ইংরেজ সেনাপতি হিউরোজ ভুপালের দিক থেকে ঝাঁসির দিকে এগিয়ে আসছে। পথে রামগড় দুর্গ জয় করেছে।

লছমন—সে দুর্গ তো অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল, তিন হাজার সৈন্য, একবছরের রসদ।

রানী—বিদ্রোহীদের নেতা ?

লছমন—কামদার খাঁ, ওয়াদিল খাঁ, কিষেণ রাম—

চর—তাঁদের বন্দী করার পর ফাঁসী দেওয়া হয়েছে। ফাজিল খাঁ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে বীনা নদী পার হয়ে কোথায় চলে গেছেন। রামগড়ের সমস্ত গোলা বারুদ রসদ ইংরেজের হাতে।

রানী—রসদ গোলা ওরা পুড়িয়ে দিতে পারল না।

চর—সে সময় ওরা পায়নি। ওদের অস্ত্র অনেক নতুন ধরনের। আমাদের পুরনো বন্দুক, কামান, সেই অস্ত্রের সঙ্গে পেরে উঠছে না। তাছাড়া দেশীয় লোকেরা তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করতে ভালবাসে।

রানী—গ্রামের লোকেদের কি মনোভাব ?

চর—তারা তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করেছে। যে যা পারে —দা কাটারি বর্শা এমনকি পাথর দিয়ে ইংরেজকে প্রতিহত করবার চেষ্টা করেছে। কোনো রসদ ইংরেজ পায়নি। তাই—

রানী—তাই ?

চর—গ্রাম দখলের পর ইংরেজ গ্রামবাসীদের যাকে পাচ্ছে তাকেই রাস্তার পাশের গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসী দিচ্ছে।

[দরবারের সমস্ত লোক হায় হায় করে ওঠে।]

রানী—বানপুরের রাজা ঠাকুর মর্দন সিং কোথায় ?

২য় চর—আমি সেই কথা বলব বলেই অপেক্ষা করছি মা। বারোদিয়া ছেড়ে তিনি পালাতে বাধ্য হয়েছেন।

রানী—সে কি ? বারোদিয়াতে তো উনি ওনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন।

চর—প্রচণ্ড লড়াইএর পর রাজা মর্দন সিং এর কাঁধে গুলি লেগে তিনি জখম হন। তখন কিছু আফগান সৈন্য রাজাকে বলে যে আমরা মৃত্যুপণ করে লড়ে ইংরেজের দৃষ্টি আমাদের ওপর রাখছি। সেই সুযোগে আপনি বাকি সৈন্য এবং গ্রামবাসীদের নিয়ে পালিয়ে যান। প্রথমে রাজা রাজী হননি। তখন আফগান সর্দার বলে এইভাবে বোকার মতো সকলে মরে তো লাভ নেই। আপনি পালিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় ঘাঁটি করুন। এ পালানোয় লজ্জা নেই। তারপর দুজনে দুজনকে আলিঙ্গন করে বিদায় নিলেন।

[৩য় চরের প্রবেশ]

৩য় চর—[কুর্ণিশ করে] জব্বলপুর থেকে মাদ্রাজ সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক হুইটলক হিউরোজের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঝাঁসির দিকে রওনা হচ্ছেন।

[চতুর্থ চরের প্রবেশ]

৪র্থ চর—[কুর্নিশ করে] ফোর্ট উইলিয়ম থেকে সর্বাধিনায়ক ক্যামবেল একমাস আগে মধ্য ভারতের দিকে রওনা হয়ে গিয়েছেন। [স্তব্ধতা]

রানী—লছমন রাও, এতদিন ইংরেজের প্রতিনিধি হিসাবে ছিলাম। আজ এই মুহূর্তে আমি নিজেকে ঝাঁসির স্বাধীন রানী হিসাবে ঘোষণা করছি। এই মুহূর্তে প্রাসাদের চূড়া থেকে ঝাঁসির নিশানের সঙ্গে যে ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে তা নামিয়ে ফেল, সেখানে কেবল ঝাঁসির নাগারা আর চামর আঁকা পতাকা উড়বে

মান্দার+কাশী—এ কাজটা আমাদের দাও।

মোতি+গঙ্গা—রানী, আমরা করবো।

রাণী—বেশ, এই মুহূর্তেই কাজ সম্পন্ন কর। [চারজন নারী চলে যায়] আমার রাজ্যের সর্বত্র প্রচার কর স্বাধীন ঝাঁসিকে রক্ষা করতে প্রত্যেক বৃত্তির লোকের সাহায্য চাই। গ্রামবাসীদের অস্ত্র শিক্ষা দেওয়া শুরু কর। সভাভঙ্গ হল কেবল মন্ত্রীরা এবং সেনাপতিরা থাকবেন। দেওয়ান রঘুনাথ আপনিও থাকুন। গোপাল কোথায়? একটা চিঠি লিখতে হবে।

[দ্বারীর প্রবেশ]

দ্বারী—গোপাল পালিয়েছে। তার বিছানায় একটা বালিশ চাদর চাপা দেওয়া ছিল।

রানী—এ আমি জানতাম। খুদাবক্স এখনি সৈন্য পাঠাও যদি তাকে ধরা যায়।

[অন্য সকলে বেরিয়ে যায়]

রানী—মানচিত্র আছে?

খোস খাঁ—আমার জেবে সবসময় একটা মানচিত্র থাকে।

রানী—খুলে ধরুন। আসুন এইবার আমরা বিচার করি আক্রমণ করব অথবা আক্রমণ প্রতিহত করব।

[একটুক্ষণ সবাই মিলে দেখে]

ওরা দক্ষিণ দিক থেকে আসবে। এদিকের কৃষকদের যত শস্য, গরু, মহিষ, ঘোড়া, ভেড়া, সামান্য কিছু তাদের ব্যবহারের জন্য রেখে সমস্ত নগরের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে।

জবাহর—রাস্তার দুপাশের বড় বড় গাছ কেটে ফেলতে হবে। যাতে ওরা ইচ্ছামাত্রই কিষানদের ধরে গাছে ঝোলাতে না পারে।

রানী—ঠিক। আর যখন কাছে আসবে তখন সমস্ত শস্য ক্ষেত জ্বালিয়ে, পুকুর এবং কূপের জল বিষাক্ত করে দিতে হবে।

খুদাবক্স— ক্ষুধায় রুটি আর তৃষ্ণায় জল যেন ওরা না পায়।

রানী—ঝাঁসি নগরীতে যত জলাশয় আছে ওরা অবরোধ করলে আমাদের জলের অভাব হবে না কি বল?

মোরোপন্ত—না হবে না।

রানী—আমাদের আটটা দরওয়াজা আছে না?

খোস খাঁ—হ্যাঁ, অরছা, দতিয়া, সাইয়ার, ভাণ্ডীর

আপ্পা—লছমী, খণ্ডেরা, ওনাও এবং সাগর।

রানী—খোস খাঁ, আপনি ভার নিন কোন্ দরওয়াজায় কাকে রাখবেন। কত পরিমাণ সৈন্য, কামান কাকে দেবেন। আপনার ওপর ভার দিলাম সেনা সন্নিহিত করবার।

খোস খাঁ—এখনি যদি আমরা ঠিক করে ফেলি ক্ষতি কি?

[আলো কমে যায়, সকলে আলোচনা করতে যাবে আবার আলো বেড়ে যায়]

রানী—উত্তম হয়েছে। দক্ষিণে সাগরে দরওয়াজায় তাহলে আপনি খুদাবক্সকে নিয়ে থাকছেন। আমি আমার সৈন্য নিয়ে প্রত্যেক দরওয়াজাতে খবর নিচ্ছি। ভাল, কিন্তু এখনি সৈনিকদের এবং নাগরিকদের মধ্যে প্রচার আরম্ভ করে দিন। আর কোন নাগরিক যদি ভীত হয়ে নগর ছেড়ে যেতে চায় তাহলে তাদের যেতে দেবেন। না হলে কার্যকালে এর বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

খোস খাঁ—তাহলে রানী সাহেবা আমরা বিদায় হই।

[সকলে অভিবাদন করে বিদায় নেয়। রানী হাতে তালি বাজায়। দুজন নারী প্রবেশ করে]

রানী—মান্দার, কাশী, মোতি কোথায়?

[বলতে বলতেই মান্দার কাশী ইত্যাদি প্রবেশ করে।]

মান্দার—ইউনান জ্যাক নামানো হয়ে গেছে। এখন কেবল ঝাঁসির পতাকা উড়ছে।

কাশী—হ্যাঁ, উত্তরের হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে।

মোতি—লাল রঙের মধ্যে সোনার নাগারা আর চামর। কি সুন্দর দেখাচ্ছে। আমরা কতক্ষণ ধরে দেখলাম। তারপর সবাই একসঙ্গে বললাম—

সবাই—ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর জয়।

রানী—তোমাদের দেখে আমার হিংসে হয়। এই দুর্দিনে একটা পতাকা নামিয়ে আরেকটা পতাকার দিকে তাকিয়ে তোমরা কেমন খুশী হয়ে গেলে।

মোতি—বল কি বাঈসাহেব, ইংরেজের পতাকা নেমে গেল খুশী হব না! ওটা যে আমার কি চক্ষুশূল ছিল।

মান্দার—বল আমাদের ডাকছিলে কেন?

রানী—হ্যাঁ, অনেক কাজের সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যাও শিখেছ তার পরীক্ষা তো সামনে। তার সঙ্গে তোমাদের আর একটা কাজ শিখতে হবে।

সবাই—কি কাজ?

রানী—রাজমিস্ত্রীর কাজ।

সবাই—রাজমিস্ত্রী?

রানী—হ্যাঁ, আমাদের এই নগরী প্রাকার দিয়ে ঘেরা। ইংরেজ যদি এই নগরী

আক্রমণ করে তাহলে দিনের বেলা প্রাকারের যে অংশ কামানের গোলাতে ভাঙবে রাতের অন্ধকারে তোমাদের আবার সেই প্রাচীর গড়ে তুলতে হবে। বুন্দেলখণ্ডী চাষার মেয়েদের তোমাদের সঙ্গে নাও।

মান্দার —কাল থেকেই শুরু করব। কিন্তু এখন চল একবার দেখবে না? তোমার পতাকা, কেমন তোমারই মত একলা দাঁড়িয়ে আছে।

[রানী চলে যেতে যায়। হঠাৎ থেমে বলে]

বাইরে এত লোক সবাই ওপরের দিকে তাকিয়ে আছে?

[বাইরে আওয়াজ। 'স্বাধীন ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর জয়'—আলো নেভে। মঞ্চে অন্যপাশে আলো সেখানে হিউরোজ, হুইটলক, হ্যামিলটন, এ্যালিস ইত্যাদিকে দেখা যায়।]

হিউরোজ - এ্যালিস, তাহলে তুমি যা বলছো এইবার আমাকে সত্যিকারের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে।

এ্যালিস—কালো গ্রানাইট দিয়ে তৈরী এই ঝাঁসির দুর্গ। কেল্লার উপরে চারটে স্কোয়ার জায়গায় চারটে কামান রাখার জায়গা।

হিউরোজ—এবং সেখানে দুটো দুটো করে কামান আছে?

এ্যালিস—হ্যাঁ।

হ্যামিলটন—অবশ্য তুমি গড়াকোটা, মাদিনপুর, নারদপাশ যেভাবে দখল করেছ ঝাঁসি দখল করা তোমার পক্ষে এমন কিছু শক্ত কাজ নয়।

হিউরোজ—আমি কেবল ভয় করি এদেশের এই গরমকালটাকে।

হুইটলক—মার্চ মাসেই কেমন গরম দেখেছ?

হিউরোজ—তখন শীতকাল ছিল তো, ওগুলো দখল করা শক্ত হয়নি। তবে বোধন দৌয়া আর ঠাকুর মর্দন সিং কি যুদ্ধটাই করল। নামগুলো ঠিক উচ্চারণ করেছি তো?

এ্যালিস—একদম ঠিক। এদের নামগুলো উচ্চারণ করা এতো মুস্কিল হয়, তবে যোদ্ধা বটে।

হ্যামিলটন—এটাই বুঝতে হবে এদের অস্ত্র আধুনিক নয়। কামান চালাতে পারে ভাল কিন্তু বন্দুকের চেয়ে তলোয়ারটা পছন্দ করে বেশী। গেরিলা যুদ্ধে অবিশ্বাস্য রকমের কৌশল, কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে ওরা আমাদের কাছে দাঁড়াতে পারে না। তবু যে ওরা অবিশ্বাস্য রকমের প্রতিরোধ করে তার কারণ ওদের মনোবল। অদ্ভুত মনোবল।

এ্যালিস—আর ইংরেজের প্রতি ওদের অসম্ভব ঘৃণা।

হিউরোজ - এটা খুবই স্বাভাবিক। সমুদ্রপার থেকে এসে আমরা সব দখল করব আর ওরা বাধা পর্যন্ত দেবে না—তাহলে তো ওদের মানুষই বলা যেত না,

সিবাস্তপোল থেকে এসে গরু ভেড়ার সঙ্গে লড়াই ? নাঃ পোষাত না।

[সবাই হাসে]

হ্যামিলটন—গভর্নর ক্যানিং বলেছেন ঝাঁসি জয়ের উপরে ইংরেজের ভাগ্য এবং সম্মান দুটোই নির্ভর করছে। জয়ের সম্ভাবনায় যদি এতটুকু সন্দেহ থাকে তাহলে বরং ঝাঁসি আক্রমণ না করাই ভাল, বরং চিরখারীতে তাঁতিয়া টোপিকে পরাজিত করা ভাল। আমি জানিয়ে দিয়েছি এতো ভয় পাবার কিছু নেই।

হিউরোজ—বম্বে থেকে দু ব্যাটালিয়ন সৈন্য আর রসদ পাঠাতে বলেছি। আশা করছি দু-একদিনের মধ্যে এসে পড়বে। এলেই আক্রমণ শুরু করব।

এ্যালিস—এখানকার চারপাশের গ্রামে কিছুই নেই। একটা ছাগল পর্যন্ত চরতে দেখলাম না।

হ্যামিলটন—চরের মুখে খবর পেয়েছি রানী সব নিয়ে নগরের মধ্যে জমা করেছে।

এ্যালিস—অত্যন্ত বুদ্ধিমতী রমণী।

হ্যামিলটন—তুমি তো ওঁকে বহুদিন থেকে জান। এখানে তো ছিলে বহুদিন।

এ্যালিস—হ্যাঁ বহুদিন ছিলাম। যখন ঝাঁসি ছেড়ে চলে যাই তখনও রানী নিতান্তই বালিকা। আমি রানীকে যতটা জানি বুদ্ধিমতী, তেজস্বী, সন্দেহ নেই। কিন্তু নিষ্ঠুর বলে ভাবতে পারি না। তাই ঝাঁসির হত্যা-কাণ্ডের সঙ্গে রানীর যোগ আছে এখনও আমার বিশ্বাস হয় না।

হিউরোজ—রানীর সৈন্যসংখ্যা কত ?

এ্যালিস—[একটা কাগজ বের করে] আফগান পাঠান আর বিলায়েতী সৈন্য মিলিয়ে দশহাজার। বুন্দেলখণ্ডীদের নিয়ে গঠিত দেড় হাজার। তাছাড়া আছে কয়েক শো নারী সৈন্য।

হিউরোজ— নারী সৈন্য ? আশ্চর্য ! বিশ বছর বয়স থেকে যুদ্ধ করতে করতে আজ সাঁইত্রিশ বছর বয়স হল নারীদের সঙ্গে কখনো যুদ্ধ করতে হয়নি। সত্যি বলছ ? একটা নারী বাহিনী আছে ?

এ্যালিস—রানী নিজে একজন সুশিক্ষিত যোদ্ধা এটা তো ঠিক। তবে আর কিছু নারী যুদ্ধবিদ্যা শিখবে এতে এত আশ্চর্য হওয়ার কি আছে ?

[একজন চরের প্রবেশ]

চর—ব্রিগেডিয়ার স্টুয়ার্ট চান্দেরী দুর্গ দখল করেছেন। পশ্চিম দিক থেকে উনি ঝাঁসির দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

[সকলে—হিপ্ হিপ্ হুররা]

হিউরোজ—ব্যস, আর আমার কোনো চিন্তা নেই। পরশু ঝাঁসি আক্রমণ করব। আর দুদিনের মধ্যে ঝাঁসির কেল্লার ওপর ইউনিয়ন জ্যাক উড়বে।

হ্যামিলটন—তুমি বড্ড বেশী আশাবাদী ! দুদিনের মধ্যে উড়বে ;

হিউরোজ—আমরা সৈনিকরা আশাবাদী কেননা যখন আমাদের আশা থাকে না তখন আমরাও থাকি না।

হুইটলক—মনে আছে তো ক্যানিং এর নির্দেশ? রানীকে জীবন্ত ধরতে হবে। কমিশন বসিয়ে বিচার করে তবে শাস্তি দিতে হবে।

হিউরোজ—আমি নিজেও তো তাই চাই। তাকে একবার দেখতে চাই। বুঝতে চাই। এতো সাহস এক সামান্য স্ত্রীলোকের আসে কোথা থেকে। সৈন্যদের জানানো হোক পরশু প্রত্যুষে আমরা ঝাঁসি আক্রমণ করছি। আর তার কয়েক-দিনের মধ্যে গভর্ণর জেনারেল ক্যানিং আশ্বস্ত হবেন যে ইংরেজের সম্মান, কোম্পানীর সম্মান এই ভারতে এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয়নি। গড্ সেভ দ্য কুইন।

সকলে—গড্ সেভ্ দ্য কুইন।

[মঞ্চে আলো কমে আসে। বিউগল ইত্যাদি বেজে ওঠে। গড্ সেভ দ্য কিং গানটি শোনা যায়। মঞ্চের অপর পার্শ্বে আলো পড়ে। কামান গর্জনের মধ্যে রানীকে দেখা যায় দূরবীন হাতে। মান্দারের প্রবেশ।]

মান্দার—তাঁতিয়া টোপী খবর পাঠিয়েছে।

রানী—তাহলে আমার চিঠি ঠিকসময়েই পেয়েছিল। কই উত্তর দেখি।

মান্দার—চিঠি নেই, চর মুখে জানিয়েছেন যে তোমার চিঠি তিনি নানা সাহেবকে পাঠিয়েছেন। তাঁর অনুমতি পেলেই তিনি তোমার সাহায্যে আসবেন।

রানী—হায়, এতদিনে আমাদের যে—। ইংরেজের সব নতুন ধরনের অস্ত্র, আমাদের সাহস কর্মদক্ষতা ও কৌশল দিয়ে কতক্ষণ আটকাবো? এখন মনে হচ্ছে উনি যদি একটু কম প্রভুভক্ত হতেন।

মান্দার—উনি নানা সাহেবের বেতনভোগী সেনাপতি। নিজে সিদ্ধান্ত নেবেন কি করে।

রানী—দেখা যাক আমার ভাগ্য কোথায় আমাকে নিয়ে যায়। সবচেয়ে বড় ভরসা ওই খোস খাঁ। ওঁর জন্যেই ইংরেজ কিছুতেই সাগর দরোজার ত্রি-সীমানায় আসতে পারছে না। কি অপূর্ব কৌশলে আর নিশানায় যে উনি কামান দাগেন। অনেকে যেমন পাশা খেলতে বসে মুখে ছক্কা পাঞ্জা বলে আর তাই পড়ে তেমনি উনি ওদের যে সৈন্য বাহিনী যে ছাউনীর নাম করে গোলা ছুঁড়ছেন মুখের কথা ফুরতে না ফুরতে তার ওপর গিয়ে গোলা পড়ছে। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। মোতি ওখানে নিজে যেচে গোলা যোগানদারের কাজ নিয়েছে।

মান্দার—তোমার রাজমিস্ত্রী মেয়েরাও পুরুষদের সঙ্গে রাতের অন্ধকারে কালো কম্বলে নিজেদের ঢেকে অপূর্ব নৈপুণ্যে ভাঙা প্রাচীর মেরামত করছে।

রানী—কিন্তু এই নাও, দূরবীন দিয়ে দেখ লছমীতাল হ্রদের দক্ষিণে উঁচা টিলার ওপরে হিউরোজ তার সৈন্য সমাবেশ করেছে। জায়গাটা বোধহয় খোস খাঁ

বা খুদাবক্সের কামানের পাল্লায় পড়ে না। আর জোকেনবাগের দিকে দেখ আর একদল সৈন্য এসে গেছে। খুব দক্ষ আর বুদ্ধিমান সেনাপতি এই হিউরোজ। আমি ওকে সাবাশ না দিয়ে পারছি না। মান্দার আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে। যাই খোস খাঁকে এই সংবাদ দিয়ে আসি।

মান্দার—সারাদিন তুমি কিছু খাওনি।

রানী—যখন গোলন্দাজদের জন্যে খাবার পাঠাবে আমার খৈ আর গুড়ও তাদের সঙ্গে দিয়ে দিও।

[ছুটে রানী বেরিয়ে যায়। চিমা বাঈ-এর প্রবেশ।]

চিমা—মান্দার, আমি আর পারছি না। প্রতিনিয়ত এই কামান গর্জন আর মানুষের মৃত্যুসংবাদ আমাকে পাগল করে দিচ্ছে। আমার শিশুপুত্র চিন্তামণি চমকে চমকে উঠছে। এই পাঁচদিন আমি যে কি করে কাটিয়েছি—

মান্দার—শিশুপুত্র তোমার কি একলারই আছে এই নগরে? এই নগরের অন্য সকলে কি বধির?

চিমা—না, না, সেজন্যে নয়। প্রথম দুদিন তবু আমার স্বামীকে একবারের জন্য হলেও দেখতে পেয়েছিলাম—তারপর আর তার সঙ্গে আমার দেখাও হয়নি।

মান্দার—অন্য অনেকের স্বামীদের সঙ্গে তাঁদের স্ত্রীদের দেখা হচ্ছে না।

চিমা—তা নয়। আমার, আমার খুব দরকার ছিল।

মান্দার—বাঈ সাহেব তো আগেই বলেছিল যাদের ভয় আছে তারা যেন নগরী ছেড়ে চলে যায়।

চিমা—না, না, ভয়ের কথা নয়। আমাব স্বামীকে একটা কথা বলা নিতান্ত দরকার—তাকে একটু খবর দিতে পার? একবারের জন্য কোথায় আমি তার দেখা পাই?

মান্দার—বেশ, আমি দেখছি তাঁকে খবর দেওয়া যায় নাকি—

চিমা—ওঃ, ভগবান নিশ্চয় তোমার ভাল করবেন।

[চিমাবাঈ চলে যায়। প্রচণ্ড জোরে কামানের আওয়াজ, চীৎকার, মোতির প্রবেশ, কালিমাখা চেহারা।]

মোতি—মান্দার, বাঈসাহেব কোথায়?

মান্দার—তিনি তো তোমাদের ওদিকেই গেছেন।

মোতি—ওঃ, আব আমি তাকে খুঁজে ফিরছি—

মান্দার—তুমি খোস খাঁর ওখানে গোলা যোগানের কাজ করছিলে না?

মোতি—হ্যাঁ। একটা কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজন। জানি না—বাঈ সাহেবের সঙ্গে আর দেখা হবে কি না—

মান্দার—কেন? একথা বলছ কেন? তুমিও কি ভয় পেয়েছ?

মোতি—ভয় ? না ভয় না। মান্দার গোলার যোগান দিতে দিতে আমি ইংরেজের যে যুদ্ধ কৌশল দেখছি, তাতে মনে হচ্ছে—হার আমাদের নিশ্চিত।

মান্দার মোতি !

মোতি—মান্দার, আমি ভয় জানি না, ভয়কে কি করে বিসর্জন দিতে হয় তা আমি শিখেছি বাঈসাহেবের কাছে। কিন্তু মান্দার, আমার মনে হচ্ছে নিয়তি যেন ইংরেজের সঙ্গে ধূমকেতুর মত এগিয়ে আসছে।

মান্দার—একটু আগে রানীর মুখে শুনেছি খোস খাঁ অপূর্ব কৌশলে যুদ্ধ করছেন। শত্রু ধ্বংস করছেন।

মোতি—হ্যাঁ এখনও করছেন। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে থেকে তিনি পাগলের মত প্রত্যেকটি কামানের নাম ধরে চীৎকার করে উঠছেন। যে কামান ওঁর কাছে নেই—সেই কামানকেও ডাকছেন—কখনও বলছেন নলদার, কখনও কড়ক বিজলী, কখনও ভবানীশংকর, সমুদ্রগর্জন। আমার কেমন ওঁকে অপ্রকৃতিস্থ লাগছে। যেন উনি বুঝতে পেরেছেন—

মান্দার—এই কথা বলবার জন্য তুমি ওঁর কাছ থেকে চলে এলে ?

মোতি—না, অশ্বপৃষ্ঠে এসেছি—আমি এখনই ফিরে যাব। খোস খাঁ তাঁর প্রিয় শিষ্য খুদাবক্সকে নিজের কাছে ডেকে এনেছেন—যুদ্ধক্ষেত্রের কথা কিছু তো বলা যায় না বোন। রানীসাহেবের দেখা পেলাম না—তাই তোমাকেই একটা কথা বলে যাই মান্দার। যদি যুদ্ধক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হয় তবে—

মান্দার—তবে ? বল মোতি—তবে ?

মোতি— যদি খুদাবক্সেরও মৃত্যু হয়—এছাড়া আর অন্য কোন পরিণতি নেই আমাদের ভাগ্যে মান্দার, কারণ খোস খাঁ খুদাবক্স কেউ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে শেখেননি—নিয়তি যদি আমাদের ডেকেই নেন তবে খুদাবক্সের কবরের পাশে আমার কবর স্থির করো ভগ্নী।

মান্দার—মোতি, একটা দিনের জন্যেও তো তুমি বুঝতে দাওনি—

মোতি—বাঈ সাহেবার শিষ্যা যে আমি। যদি মরি বাঈ সাহেবকে বোল মোতির এই শেষ ইচ্ছা—আর সময় নেই। বোধহয় তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

[মান্দারকে জড়িয়ে ধরে তারপর ছুটে বেরিয়ে যায়।]

মান্দার - মোতি। নাটকওয়ালী মোতি। নেচে গেয়ে বেশ তো জীবন কাটিয়ে দিতে পারতে—কেন বাঈসাহেবকে ভালবাসলে ? কেন ঝাঁসিকে ভালবাসলে —আমার চোখে জল আসছে কেন ? আমি কি মোতিকে ভালবেসে ফেলেছি ? অথবা খুদাবক্সকে ও ভালবাসে বলে আমার চোখে জল আসছে।

[কামানের গর্জন। আলো নেভে। মঞ্চের অপর পাশে আলো। একটা উঁচু জায়গায় হিউরোজ এ্যালিস দাঁড়িয়ে হাতে দূরবীন।]

হিউরোজ—ঝাঁসির পতনে এত সময় লাগবে আমি ভাবিনি। এ্যালিস, দেখ ঐ

যে প্রৌঢ় আফগান গোলন্দাজ কি অপূর্ব কৌশলে কামান চালাচ্ছে—মাঝে মাঝে আমার বিভ্রম হচ্ছে। দেখেছ, কয়েকজন নারী তাদের গোলার যোগান দিচ্ছে। এ দৃশ্য আমি আমার এতদিনের যুদ্ধ জীবনে কখনও দেখিনি। যে দেশে নারীদের এত সাহস এত দেশপ্রেম, সে দেশের ভয় কি?

এ্যালিস—আমি ঝাঁসিতে বহুদিন ছিলাম। কি জানি এইসব নারীদের কাউকে কাউকে হয়তো দেখেও থাকব। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষের বেশে পুরুষের পাশে এদের এমনভাবে দেখব ভাবিনি।

[প্রচণ্ড জোরে কাছেই একটি কামান গর্জে ওঠে। দুজনে ছুটে আরও উঁচু জায়গায় যায়।]

হিউরোজ—আঃ, ধোঁয়ায় দেখা যাচ্ছে না -কোনো একজনের পতন হয়েছে—কিন্তু কে?

এ্যালিস—সেই প্রৌঢ় গোলন্দাজ পড়ে গেছে। মৃত্যু অবধারিত, ওর জায়গায় এসে বসেছে এক তরুণ আফগান। কি ক্ষিপ্র গতিতে কামান দাগলো।

[কাছেই শব্দ]

ঐ দেখ দূরে আমাদের দুজন হাবিলদার পড়ল।

হিউরোজ—ঐ দেখ কি ক্ষিপ্র গতিতে এক তরুণী গোলার যোগান দিচ্ছে। তার পেছনে দেখ আরও সাতজন তরুণী একে অপরের হাত থেকে গোলা নিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে—এ্যালিস যদি এই গোলন্দাজকেও ঘায়েল করতে পারা যায়।

[আবার প্রচণ্ড জোরে কামানের শব্দ]

ভগবান, তুমি আছ। দেখ ঐ তরুণ গোলন্দাজ মৃত্যুর বুকে ঢুলে পড়ছে। এ্যালিস, এই দক্ষিণের বুরুজ যদি কাবু করতে পারি—জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

এ্যালিস—দেখ কমাণ্ডার, কামান চালনা করছে সেই নারী যে এতক্ষণ গোলার যোগান দিচ্ছিল।

হিউরোজ—তাই তো! নারীও কি—এ্যালিস এ সব সত্যি সত্যি ঘটছে তো না আমি নাটক দেখছি! যখন সিবাস্তিপোলে আদেশ পেলাম আমাকে ভারতবর্ষে আসতে হবে তখন আমি অনুতাপ করছিলাম—রেচেড গরমের দেশে আমাকে আসতে হল বলে। আজ গভর্নর ক্যানিংকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এদেশে আসতে পেরেছি বলে। নাহলে এই অভূতপূর্ব দৃশ্য আমার দেখা হত না।

[গোলাগুলির আওয়াজ হতে থাকে। একজন চরের প্রবেশ। স্যালুট করে দাঁড়ায়]

চর—চিরখারি থেকে তাঁতিয়া টোপী তার বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে বেতিয়া নদীর ধারে ঝাঁসির উত্তরে এসে পৌঁছেছেন।

এ্যালিস+হিউরোজ—কি!!

[আলো নেভে। মঞ্চের অপরদিকে আলো পরে। রানী মান্দার ও কাশীবাঈ]

রানী—নাটকওয়ালী বড় জবর নাটক খেলে গেল না? মোতি যেদিন প্রথম তরবারি ধরল তখন কি আমরা জানতাম ওর এই পরিণতি হবে?

মান্দার—বাঈ সাহাব, তুমি এত বিচলিত হলে চলবে কেন?

রানী—খোস খাঁ খুদাবক্স আফগান থেকে এসেছিল। মোতি মুলতান কিংবা লক্ষ্ণৌ! ঝাঁসির ভাগ্যের সঙ্গে নিজেদের ভাগ্য কেমন করে জড়িয়ে নিল। তারপর একদিনে কেমন করে,—আমাকে ধোঁকা দিয়ে চলে গেল—

[কাশী রানীকে ছেড়ে পিছনে চলে যায়, তারপর চীৎকার করে ওঠে।]

কাশী- বাঈসাহাব, বেতয়ার উত্তরে জঙ্গলে আগুন জ্বলছে।

[রানী মান্দার ছুটে যায়।]

রানী—মান্দার, কাশী, আমি নিশ্চিত তাঁতিয়া টোপী আমাদের সংকেত জানাচ্ছেন।

মান্দার—ঠিক, তুমি যে বলেছিলে আগুন জ্বালিয়ে সংকেত দিলে চর আসবার আগে জানতে পারবে!

রানী—জয়মহালক্ষ্মী! আর একবার চেষ্টা করতে দাও।

মান্দার—আর একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ? ইংরেজ শিবির এত নীরব কেন?

রানী—তাই তো! মান্দার কাশী—শোক তাপ ভুলে আমাদের কালকের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

[চরের প্রবেশ]

চর—তাঁতিয়া টোপী রানীর সাহায্যে এগিয়ে আসছে জানতে পেরে হিউরোজ ঝাঁসির অবরোধ-এর ভার স্টুয়ার্ট হুইটলক সেনাপতিদের ওপর দিয়ে নিজে বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাঁতিয়া টোপীকে প্রতিহত করতে রওনা হয়ে গেছেন।

[চরের প্রস্থান]

রানী—ওঃ, তাঁতিয়া যদি আর একদিন আগে আসত! কিংবা ওরা তিনজন যদি আর একদিন বেঁচে থাকত!

[মোরপন্ত জবাহর সিং লালাভাই বক্সি লছমন বান্দার প্রবেশ]

শুনেছ খবর তোমরা?

মোরপন্ত—হ্যাঁ, আর একবার সুযোগ এসেছে।

রানী—সৈন্যদের মধ্যে তাঁতিয়ার কথা প্রচার কর। রাজকোষ থেকে অর্থ নিয়ে তাদের দাও যাতে তারা দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ করতে পারে।

[যুদ্ধের বাজনা কামানের গর্জন। হ্রেষা ধ্বনি। আলো একবার নিভেই আবার জ্বলে ওঠে। সেই পাত্রপাত্রীরাই আছে অবস্থান বদলেছে।]

জবাহর সিং—তাঁতিয়া পরাজিত হল? পালিয়ে গেল?

মোরপন্ত—শুধু তাই নয়। তার রসদ অস্ত্র অশ্ব সমস্ত ইংরেজের হাতে পড়েছে।
লালাভাও—তার বাইশ হাজার সৈন্যের অধিকাংশই ইংরেজের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছে। বিজয়গর্বে হিউরোজ ঝাঁসিতে ফিরে আসছে!
রানী—ইংরাজের কত সৈন্য নিহত হয়েছে?
মোরপন্ত—একশতর বেশী না। তার মধ্যে দুজন ক্যাপ্টেন আছে। ক্যাপ্টেন নেভিল হিউরোজের খুব প্রিয় পাত্র ছিল। (স্তব্ধতা)
রানী—এইবার?
লালাভাও—এইবার মরণপণ করে যুদ্ধ করতে হবে।
জবাহর—এতদিনও তো তাই করছি।
লালাভাও—এবারে করতে হবে পরাজিত হব জেনে।
মোরপন্ত—ঝাঁসির কেল্লাতে আবার ইউনিয়ন জ্যাক উড়বে জেনে।
লালাভাও—এবারে সেনাপতি কে হবে ঠিক করে দাও রানী।
জবাহর—হ্যাঁ, ঠিক করে দাও।
লছমন—আমার মনে হয় রানীর নিজেরই সেনাপতি হওয়া উচিত। কারণ বিচক্ষণতায় এখন আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।
সকলে—বেশ তাই হোক।
রানী—বেশ। বাবা, তুমি আর লছমনজি দক্ষিণ আর পূর্বের দরজার ভার নাও। জবাহর সিং তুমি আর দলীপ সিং তোমাদের সমস্ত সৈন্য নিয়ে এঁদের সঙ্গে থাকবে। আমি আমার বাহিনী নিয়ে যখন যেখানে যেমন প্রয়োজন হবে যাব। আর নগরের মূল্যবান জিনিস রসদ বাকি অস্ত্র কেল্লার মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। লালাভাও, তোমাকে আমি এর ভার দিলাম,—সঙ্গে হীরা ঝলকারীকেও নিও। সৈন্য আর নাগরিকরা নিশ্চয়ই মুষড়ে পড়েছে। চল আমাদের তাদের কাছে গিয়ে কিছু বলা দরকার। তাদের মধ্যে আশার সঞ্চার করা দরকার।

[সবাই চলে যেতে চায়]

মান্দার—বাঈসাহাব, মোরপন্তজি কি একটু সময়ের জন্য এখানে থাকতে পারেন? চিমাবাঈ দুদিন ধরে তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী।
রানী—বেশ। বাবা, তুমি মায়ের সঙ্গে কথা শেষ করে এস। কিন্তু মান্দার, তুমি এস আমার পাশে থাকবে।
[সবাই চলে যায়। মোরপন্ত একলা, চিমাবাঈ-এর প্রবেশ। দুজনে দুজনের দিকে একটু তাকিয়ে থাকে। তারপর চিমাবাঈ দৌড়ে এসে মোরপন্তর পা জড়িয়ে ধরে।]
মোরপন্ত—[তুলে ধরে] কেন, আমাকে খুঁজছিলে কেন?
চিমা—কেন এমন হোল? [কাঁদতে থাকে]

মোরপন্ত—ছিঃ, এমন করে কাঁদছ কেন ? বিপদ কি তোমার একলার ?

চিমা—সবাই আমাকে কেবল এই কথা বলছে, আমার চোখে জল এসে যাচ্ছে। এটা যেন আমার কত বড় অন্যায় ! কি করব ? ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে, তোমার চিন্তামনির মৃত্যুকল্পনায় আমার তালু শুকিয়ে উঠে চোখ দিয়ে আপনা থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমি কি করব ?

মোরপন্ত—তুমি তোমার মনটাকে এতটুকু একটা কেন্দ্রে এনে ফেলেছ। নিজের স্বামী নিজের শিশুপুত্র ছাড়া আর কারো কথা ভাবতে পারছ না ! বলো, কি চাও তুমি ?

চিমা—আমি তোমাদের কথা সব শুনেছি। জেতার আশা যখন নেই কেন আমাদের শিশুপুত্রের মুখ চেয়ে আমরা এখান থেকে চলে যাব না ?

মোরপন্ত—চিমা ! একথা তুমি আমার সামনে উচ্চারণ করতে পারলে ?

চিমা—হ্যাঁ পারলাম। তুমি আমার স্বামী। আমাব পুত্রকে তুমি ছাড়া কে রক্ষা করবে ?

মোরপন্ত—সত্যি চলে যেতে চাও চিমা ? বেশ তবে যাও। চিন্তামনিকে যেমন করে পার রক্ষা কর। কাকে সঙ্গে নেবে ? কেউ রাজী আছে ?

চিমা—তোমার সেই ভ্রাতৃবধু কাকুবাঈ। সেও এখানে আর থাকতে চায় না।

মোরপন্ত—বেশ তাই যাও। বিশ্বাসী ভৃত্যদের দিয়ে ব্যবস্থা করিয়ে নাও। মনুর বিয়ে দিয়ে বিঠুর ছেড়ে ঝাঁসি এলাম। মহারাজ গঙ্গাধরের ইচ্ছায় তোমার ভাগ্য আমার ভাগ্যের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিল। আজ সেটা ছিন্ন হবার সময় এল।

চিমা—আমি তো তোমাকেও সঙ্গে আসতে বলছি।

মোরপন্ত—কিন্তু মনু ?

চিমা—সে তার স্বামীর ঝাঁসি ছেড়ে যাবে না কিন্তু—

মোরপন্ত—না চিমা, আর একটা কথাও নয়। মনু তো তোমার সন্তান নয়। তোমার সখী। আজ থেকে তোমার পথ আর আমার পথ আলাদা হল। চিন্তামনির জন্য তার মা বাবা দুজনের স্নেহই আছে। তার মা যোগ্য তাই আমার ছেলের ভার তার মাকে দিলাম। মা মরা মেয়ে মনু তার স্বামী হারিয়েছে, একমাত্র সন্তান হারিয়েছে। রাজ্য হারাতে বসেছে। সে অন্তত জানুক, তার বাবা তাকে ত্যাগ করেনি। আমি ওকে পৃথিবীতে এনেছিলাম —এই বিপদে ওকে ছেড়ে যাই কি করে বল ?—যাও, আর দেরী কর না। চাঁদ উঠবার আগেই বেরিয়ে পড়। তোমার মঙ্গল হোক।

[চিমা মোরপন্তকে প্রণাম করে চলে যায়। আলো নিভে যায়। মঞ্চের অপর পাশে আলো। রানী আর মান্দারকে দেখা যায়, আরো অনেক লোক, তাদের ছায়ার মত মনে হয়]

রানী—আমার নাগরিকবৃন্দ তোমরা এতদিন এই নগরে অবরুদ্ধ থেকে অনেক সহ্য করেছ। তাঁতিয়া টোপী যখন আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন আমরা খুবই আশান্বিত হয়েছিলাম। কিন্তু তাঁতিয়া টোপী পরাজিত হলেন। ঝাঁসির ভাগ্য নিয়ে আজ চারবছর ধরে যে খেলা চলছে তা অদ্ভুত এবং চমকপ্রদ। কালকের যুদ্ধে তার পরিসমাপ্তি হবে। কে বলতে পারে আমরা যদি আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে রুখে দাঁড়াই ভাগ্যের চাকাটা ঘুরে যেতে পারে। বিদেশীরা আমাদের নিয়ে গরু ভেড়ার মত ব্যবহার করবে এ যদি আমরা না চাই তাহলে আমাদের প্রত্যেকের প্রতিজ্ঞা করতে হবে বিনা প্রতিরোধে আমরা বিদেশীদের হাতে একহাত জমিও ছেড়ে দেব না। আমাদের সম্পদ আমরা ইংল্যাণ্ডে নিয়ে যেতে দেব না। এদেশ আমাদের। আর আমার সিপাহীরা সর্দাররা, জীবনে আমি কাউকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিইনি। বারবার ভাগ্য বিপর্যয় না হলে আমরা এতদিন ইংরাজকে যমুনা পার করে দিয়ে আসতাম। আমার ঝাঁসির দেশপ্রেমিক সিপাহীরা, পেশবার সৈন্য এসে আমাদের জিতিয়ে দেবে এ ভরসায় তো আমরা ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে নামিনি। যদি সত্যি আমরা আমাদেব দেশকে ভালবাসি তবে নিজেদের আমাদের হিম্মতের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। ঝাঁসি আমাদের মা। আজ প্রাণভয়ে মাকে আমরা ইংরেজের হাতে দিতে পারি না। মায়ের বেইজ্জত আমরা দেখতে পারি কি?

[সকলে—না, না, কিছুতেই না]

প্রথম যেদিন ইংরেজ আমাকে ঝাঁসির সিংহাসনচ্যুত করবার ফরমান নিয়ে এসেছিল, সেদিন আমার ভেতর থেকে ঝাঁসির লক্ষ্মী বলে ছিল—'মেরী ঝাঁসি নেই দুঙ্গী'—আজ ঝাঁসির লক্ষ্মী তোমাদের বলতে বলছেন—

জবাহর সিং—হামারা ঝাঁসি নেহী দেঙ্গে।

সকলে—হামারা ঝাঁসি নেহী দেঙ্গে।

রানী—এইবার যাও। নিজের নিজের কর্তব্য করার জন্য প্রস্তুত হও। মনে থাকে যেন একহাত জমিও আমরা ছাড়ব না।

[সকলে কলরব করতে করতে প্রস্থান করে।]

[চরের প্রবেশ]

চর—ইংরেজ সৈন্য ভেতবে ঢুকে পড়েছে।

রানী + মান্দার—কি করে?

চর—প্রহরীদের অন্যমনস্কতার সুযোগে ইংরেজের চর সাগর দরজা খুলে দিয়েছে।

[২য় চরের প্রবেশ]

২য় চর—রানী, পূর্বদিকের পাঁচিলে মই লাগিয়ে ইংরেজ সৈন্য দলে দলে প্রবেশ করছে।

রানী—সে কি ? এ কি করে সম্ভব হলো ?

লালাভাও—[প্রবেশ] রানী আর এক মুহূর্ত সময় নেই। আমরা যে যার সৈন্য নিয়ে ইংরেজ প্রতিহত করতে চললাম।

[সকলে চলে যায়, ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। অস্ত্রের ঝনঝনা ইত্যাদি।]

রানী—মান্দার চলো, ভীত নাগরিকবৃন্দকে তাদের নারী শিশুদের কেল্লার মধ্যে পাঠিয়ে দিতে বলি। মান্দার, শীঘ্র চলো। কেল্লার সমস্ত দরোজা বন্ধ করে দিতে বলো।

[অন্যদিকে আলো পড়ে। দুজন ইংরেজ সহ হিউরোজ।]

হিউরোজ—পারা গেছে। চারদিনের বদলে দশদিন লেগেছে। কিন্তু পারা গেছে। শোন এবার যেমন করে হোক কেল্লায় ঢুকতে হবে। তার জন্যে সব কিছু করতে হবে। যারা বাধা দেবে, নির্বিচারে তাদের হত্যা করবে। কেবলমাত্র রানী লক্ষ্মীবাঈকে জীবন্ত ধরতে হবে। কালকের মধ্যে কেল্লায় ঢুকতেই হবে। কেল্লার মধ্যে জলাশয় ধ্বংস করার চেষ্টা করো।

[চারদিকে আর্তনাদের মধ্যে শোনা যায় 'হমারা ঝাঁসি নেহী দেঙ্গে।' আলো নেভে। অন্যদিকে আলো। মোরোপন্ত টানতে টানতে রানীকে নিয়ে প্রবেশ করে। দুজনের হাতেই খোলা তলোয়ার।]

মোরোপন্ত—এইভাবে আত্মহত্যায় কোন লাভ আছে ?

রানী—আমাকে ছেড়ে দাও। আমার প্রজাদের ওরা নির্বিচারে হত্যা করছে। ওদের পাশে গিয়ে আমাকে দাঁড়াতে দাও।

মোরোপন্ত—মনু, তোকে জীবন্ত ধরে দিতে পারলে ইংরেজ পুরস্কার ঘোষণা করেছে।

রানী—আমাকে জীবন্ত কেউ কখনো ধরতে পারবে না। আমাকে আর একবার যেতে দাও।

মোরোপন্ত—এইভাবে মেরে কোনো লাভ নেই মনু।

রানী—বাবা, আর আমার লাভ নেই আর আমার লোকশান নেই। ওদেরই হাত দিয়ে ভগবান আমার মৃত্যুর পরোয়ানা পাঠিয়েছেন।

মোরোপন্ত—না, তোকে এই দুর্গ ছেড়ে পালাতে হবে।

রানী—পালাবো ? সকলকে রেখে ?

মোরোপন্ত—হ্যাঁ, আমরা মরণপণ করে যুদ্ধ করে ওদের ঠেকিয়ে রাখবো। ইতিমধ্যে তুই তোর বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে, দামোদরকে নিয়ে ভান্ডীর দরোজা দিয়ে চলে যা। দুর্গে প্রবেশ করে ওরা যেন তোকে না পায়।

[মান্দার, কাশী সবাই দামোদরকে নিয়ে আসে। রানী তলোয়ার ফেলে দামোদরকে জড়িয়ে ধরে।]

রানী—তোকে পুত্র করেছিলাম রাজা করবো বলে। আজ বুঝি তোর প্রাণটাই বাঁচে

না। নিজের বাবা মার কাছে থাকলে তোর প্রাণের ভয়টা তো থাকত না। বাবা, সেদিন আমরা সবাই কেন এর সর্বনাশ করলাম।

মোরোপন্ত—মনু, ও তোর ছেলে। ওকে রক্ষা তোকে করতেই হবে। কাল্পীর পথে তাঁতীয়া টোপী গেছে। তুইও যা। আবার শক্তি সংগ্রহ করে তুই ওদের সঙ্গে যোগ দিয়ে আর একবার চেষ্টা কর।

রানী—[একটু তাকিয়ে থাকে] ঠিক, যতক্ষণ দেহের মধ্যে প্রাণ আছে আশার অপচয় করা ঠিক না। মান্দার, কাশী, দুর্গ ছেড়ে যাবার জন্য এখনি প্রস্তুত হও। যত পারো স্বর্ণমুদ্রা এবং তোমাদের আর আমার প্রত্যেকের গহনা লুকিয়ে নেবার ব্যবস্থা করো। [সবাই চলে যায়] বাবা, আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না বলে তুমি বিঠুর থেকে এখানে এসেছিলে, তাই না? আজ আবার আমার জন্যই হয়তো তোমাকে—

মোরোপন্ত—একদিন তো মরতেই হবে। বাবা, মার কর্মের দায়ভাগ পুত্রকন্যাকে বহন করতে হয়। পুত্রকন্যারটা পিতামাতাকে। তা না হলে সম্পর্ক কিসের? আর তোমার কর্মের দায়ভাগ গ্রহণ করার জন্য আমি গর্বিত। একদিন দেশবাসী বলবে, তুমি দেশের স্বাধীনতার জন্য কি করেছিলে। পেছনটা ঝেড়ে ফেল। সামনের দিকে তাকাও। আবার শুরু করো।

মান্দার—[প্রবেশ করে] সব প্রস্তুত।

[রানী বাবাকে প্রণাম করে। মোরোপন্ত তাকে জড়িয়ে ধরে। রানী ছুটে বেরিয়ে যায়। একলা মোরোপন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। লালাভাও-এর প্রবেশ।]

লালাভাও—ভাণ্ডীর দরোজা পার হয়ে রানী তার অনুচরদের সাথে ঝাঁসীর বাইরে চলে গেছেন।

মোরোপন্ত—সঙ্গে কে কে আছে?

লালাভাও—চারশো সওয়ার। তার মধ্যে আছেন গুল মুহাম্মদ, রঘুনাথ সিং, রামচন্দ্র রাও আর নারী বাহিনীর অনেকে।

মোরোপন্ত—মহালক্ষ্মী, ওরা যেন ঠিকভাবে নিরাপদ জায়গায় পেঁছিতে পারে। চল যতক্ষণ পারা যায় যুদ্ধ করতে হবে। হত্যালীলা বন্ধ করতে পারবো না, কিন্তু হত্যা করে যতটা প্রতিশোধ নেওয়া যায়।

[আলো নেভে। ধীরে ধীরে যুদ্ধের আওয়াজ কমে যায়। করুণ সুরে সঙ্গীত বেজে চলে। ব্রিটিশ শিবির। হিউরোজ, এ্যালিস, ক্যামবেল, স্টুয়ার্ট এবং আরো অনেকে।]

ক্যামবেল—তাহলে হিউরোজ তুমি চললে? সেই মার্চ মাস থেকে যতগুলো জায়গায় বিদ্রোহ তুমি দমন করলে, এ ছুটি তোমার অবশ্যই পাওনা। যাও, কিছুদিন পুণাতে কাটাও। ক্লাব, ইংলিশ মিউজিক, ঠাণ্ডা পানীয়, মহাবালেশ্বরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় এই ভ্যাপসা গরমের হাত থেকে তো বাঁচবে।

হিউরোজ—আমার ডাক্তারও বলেছে এই গরমে এইরকম চললে আমার মৃত্যু অবধারিত ছিল, একটাই আফশোস্ রানীকে জীবন্ত ধরে ক্যানিংকে আশ্বস্ত করতে পারলাম না।

ক্যামবেল—আমার মনে হয় না মধ্যভারতে বিদ্রোহীরা আর কিছু করতে পারবে। যেভাবে কাল্পীর যুদ্ধে তুমি ওদের ছত্রভঙ্গ করেছো।

এ্যালিস—আর যদি কিছু করবার চেষ্টা করতো গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পাওয়াই যেত।

স্টুয়ার্ট—ঝাঁসির পর কুঁচ, কুঁচের পর কাল্পীতে পরাজিত হবার পর রানী আর কিছু করতে পারবে না।

হিউরোজ—চেষ্টায় থাকো। ধরতে পারলে প্রচুর পুরস্কার পাবে।

এ্যালিস—আর আমাদের খাতার রেকর্ডটাও পরিষ্কার থাকবে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে সম্মান বাড়বে।

হিউরোজ—ওঃ, যখন শুনলাম আমাদের প্রহরীদের চোখের সামনে দিয়ে রানী চারশো অনুচর নিয়ে পালিয়েছে সেদিন মনে হয়েছিল কামান ঘুরিয়ে নিজেদের সব কটাকে শেষ করি।

ক্যামবেল -তুমি ওই যে 'বিজন' মানে নির্বিচারে হত্যার আদেশ দিয়েছিলে ওটা উপযুক্ত কাজই হয়েছিল।

স্টুয়ার্ট—মনে আছে হঠাৎ অশ্বপৃষ্ঠে এক রমণী এসে বলল, আমি ঝাঁসির রানী, এই নির্বিচারে হত্যা আর সহ্য করতে পারছি না, আমাকে গ্রেফতার করো।

হিউরোজ—ভাগ্যিস গোপাল সেরেস্তাদার ছিল। না হলে ওকে এ্যারেস্ট করার পর লজ্জায় মুখ দেখানো যেত না। কি যেন নাম ?

এ্যালিস—হীরা ঝলকারী।

হিউরোজ—ওকে পাগল বলে ছেড়ে দিয়েছিলাম না? হত্যা করতে করতেও একসময় মানুষ ক্লান্ত বোধ করে তো।

এ্যালিস—এই দুর্ধর্ষ গরমের মধ্যে যে এতগুলো দুর্গ দখল করা যাবে ভাবা যায়নি।

ক্যামবেল—ভারতীয় নেতাদের স্বভাবও আমাদের অনুকূলে ছিল! এত ছোট ব্যাপার নিয়ে ওদের মধ্যে মতান্তর হয়। শুনেছি কাল্পীর যুদ্ধে নানাসাহেবের ভাইপো রাও সাহেব একবার রানীকে সর্বসেনাধক্ষ্য হতে বলেছে আবার নিজেই সর্বসেনাধক্ষ্য হচ্ছে।

এ্যালিস—এমনিতে জাতটা সহিষ্ণু কিন্তু পরস্পরকে ওরা সহ্য করতে পারে না। না হলে কাল্পীর পতন ঘটানো অসম্ভব হতো।

হিউরোজ—এই তাঁতিয়া টোপীকেও বুঝতে পারি না। অতো বড় যোদ্ধা,

বেতোয়াতে ও যদি সাহস করে এগিয়ে আসতো তাহলে আমি কি করতাম জানি না। ও আমার ডানদিকের সৈন্যদের আঘাত করতে চাচ্ছিল। যেই ওকে মাঝখানে আঘাত করলাম, ব্যস পালিয়ে গেল।

স্টুয়ার্ট—কুঁচের যুদ্ধেও তাই করল। কামান-টামান ফেলে কাল্পীর দিকে রওনা হল।

হিউরোজ—রানী সর্বসেনাধক্ষ্য, তাকে না জানিয়েই চলে গেল। আশ্চর্য। ওদের এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং-এর অভাব আমাদের বড় কাজে লেগেছে। সত্যি বলতে কি কাল্পীর যুদ্ধে আমার যে অতো আত্মবিশ্বাস ছিল সেটা এই কারণে। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল ওরা এরকম ভুল করবেই, যুদ্ধক্ষেত্রে যদি সত্যি কাউকে ভয় করতে হয় তবে সে রানী।

স্টুয়ার্ট—আমি তোমার সঙ্গে একমত। কাল্পীর যুদ্ধে ঠিক সময়ে আমার পাশে তুমি এসে না পড়লে ওই রমণীর হাতে আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত ছিল।

ক্যামবেল—আর আমাদের খাতায় চিরকালের জন্য লেখা হয়ে থাকতো লেফটে-ন্যান্ট স্টুয়ার্ট একজন রমণীর তলোয়ারে হত হয়েছিলেন।

স্টুয়ার্ট—সে কলঙ্ক থেকে তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ হিউরোজ।

হিউরোজ—ওঃ, সে দৃশ্য ভোলা যাবে না জীবনে।

ক্যামবেল—বলো, বলো, যাকে তুমি একমাত্র যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেছিলে তার কথা একটু শুনি।

হিউরোজ—এর আগে তিনদিক থেকে এই রকম আক্রমণের সম্মুখীন হইনি। যখন সামনে যাচ্ছি হঠাৎ আমার বাঁদিক থেকে আক্রমণ শুরু হল। ওরা যে জঙ্গলে পাহাড়ে লুকিয়ে এতোদূরে এসে গেছে সে সংবাদ পাইনি। তখনি ভাবলাম তাহলে মোক্ষম আঘাত আসছে ডানদিক থেকে। স্টুয়ার্টকে বললাম সোজা ডানদিকে আক্রমণ চালাও। তখনও আমি জানি না ডানদিকের জঙ্গলে স্বয়ং রানী তাঁর বাহিনী নিয়ে ছিলেন। বলতে গেলে অল্প একটু পরেই স্টুয়ার্ট আমার সাহায্য চেয়ে পাঠাল। ততক্ষণে আমি আমার বাঁদিকে শত্রু বান্দার নবাবকে পিছু হটতে বাধ্য করেছি। স্টুয়ার্টের আহ্বানে এডওয়ার্ডস্-এর ওপর এদিকের ভার দিয়ে আমার উষ্ট্র বাহিনী নিয়ে চলে এলাম স্টুয়ার্টের সাহায্যে।

স্টুয়ার্ট—সেই সময় আমার ঘোড়া হত হয়েছে। রানীর আক্রমণের মুখে আমার সৈন্য পিছু হটতে শুরু করেছে।

এ্যালিস—তোমার ঘোড়া নেই, তাহলে তুমি ছিলে কোথায়?

স্টুয়ার্ট—রাইট অন দি গ্রাউন্ড।

সকলে—বলো কি?

হিউরোজ—ওখান থেকেই স্টুয়ার্ট চীৎকার করে সৈন্য পরিচালনা করছে। বোঝ।

আমি সামনে তাকিয়ে দেখি পাঠান সোলজারের সাজে স্টুয়ার্টের মাত্র কয়েক গজ দূরে স্বয়ং রানী। একেবারে যমের মত ছুটে আসছে ঘোড়ার ওপরে। নীলরঙের পাজামা আচকান। মাথার পাগড়ী পড়ে গেছে। লোহার শিরস্ত্রাণ ঝকমক করছে। গলায় বহুমূল্য মুক্তোর মালা। হাতে খোলা তরবারি। মুহূর্তের জন্য আমি সব ভুলে গেলাম। গোপাল সেরেস্তাদার তো বলেছিল রানী নীল রং পছন্দ করে। তাহলে এই রানী। মনে হোল না, এ প্রাণ বন্দুক চালিয়ে নষ্ট করা যায় না। মনে হোল একে জীবন্ত ধরতে হবে। এমন সময় রানী 'হর হর মহাদেও' বলে চীৎকার করতেই শয়ে শয়ে ভারতীয় সৈন্যরা বেরিয়ে আসতে লাগল। আমাদের দিকের ভারতীয় সৈন্যরা অভিভূত হয়ে গেল। সম্বিত পেয়ে বললাম, গুলি করো। এগিয়ে চলো, মনে হল লক্ষ্য হাতের মধ্যে। রানীকে বন্দী করা যাবে। কিন্তু প্রায় দুশো আফগান সৈন্য ঘোড়া ছুটিয়ে এসে রানীকে আড়াল করে ফেললো। নিজেরা প্রাণ দিয়ে রানীকে পালাবার সুযোগ করে দিল।

স্টুয়ার্ট—জয়ের পর পথে এক নারী সৈনিকের মৃতদেহ দেখে আমরা ভেবেছিলাম এই বুঝি রানী। ভাগ্যে এ্যালিস সঙ্গে ছিল।

এ্যালিস—হ্যাঁ. আমি তো ঝাঁসিতে বহুকাল ছিলাম। ওই রমণীকে আমি চিনতাম।

সকলে—তাই না কি ? কি করে ? বলো বলো শুনি।

এ্যালিস—রাজা গঙ্গাধর রাও-এর কেল্লার ভেতরে এক নাট্যশালা ছিল। তোমরা তো পরে দেখেছ হিউরোজ। ওখানে নৃত্যগীত অভিনয় হোত। আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকতো, ওই রমণী একজন নর্তকী ছিল। নাম গঙ্গাবাঈ।

হিউরোজ—নর্তকী থেকে সৈনিক।

ক্যামবেল—এতো সব সম্পদ থাকা সত্ত্বেও এরা পরাজিত হল ?

হিউরোজ—ওই যে বললে একটুতেই এদের মধ্যে কলহ হয়। না হলে কাল্পীর যুদ্ধেও রাও সাহেব তাঁর অতোবড় সৈন্যবাহিনী নিয়ে হঠাৎ চলে গেলেন কেন ?

ক্যামবেল—কোনো মনোবিজ্ঞানী এসে কোনোদিন এদের চারিত্রিক বিশ্লেষণ করবে। তবে এদের এই ধরনের চারিত্রিক গুণাবলীর জন্য আপাতত আমাদের সমস্যার সমাধান হয়েছে।

হিউরোজ—আমি অন্তত কিছুদিন আরাম করতে পারবো।

[বেয়ারার প্রবেশ। একটি খাম দেয়। হিউরোজ খুলে দেখে।]

হিউরোজ [চীৎকার করে]—এ কি ? কি করে সম্ভব !

সকলে—কি ব্যাপার ?

হিউরোজ—ফোর্ট উইলিয়াম থেকে টেলিগ্রাম, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া জানিয়েছে

রানী, তাঁতিয়া টোপী, রাও সাহেব, বান্দার নবাব সকলে একসঙ্গে হয়ে গোয়ালিয়র দখল করতে চলেছে। ক্যানিং লিখছেন এ যদি কার্যকর হয় তবে আমাকে পাততাড়ি গুটিয়ে ইংল্যাড পালাতে হবে। [স্তব্ধতা]

[একজন হাবিলদারের প্রবেশ]

হাবিলদার—আমরা প্রস্তুত আপনারা আসুন।

হিউরোজ—কোথায় ?

হাবিলদা—ওই যে বলেছিলাম, আপনাকে একটা মনোজ্ঞ বিদায় অভিনন্দন আমরা দিতে চাই।

হিউরোজ—ড্যাম ইট! সবাইকে বলো যুদ্ধ সজ্জায় প্রস্তুত হতে। কালই আমাদের গোয়ালিয়রের পথে রওনা হতে হবে। ওঃ, দ্যাট ইম্‌পসিবল্‌ ওম্যান।

[আলো নিভে যায়। মঞ্চের অপর পার্শ্বে আলো পড়ে। দূরে অনেক লোক গান করছে। বাজী পুড়ছে। রানী মান্দার কাশীবাঈ শংকর সিং দামোদরকে দেখা যায়।]

দামোদর—মা, তুমি যে বলেছিলে দুর্দিনে বাজী পোড়াতে নেই। ওরা অত বাজী পোড়াচ্ছে, তবে কি দুর্দিনের শেষ হয়েছে ?

রানী—ওরা মূর্খ, তাই ওরা বাজী পোড়াছে।

[গুল মুহম্মদের প্রবেশ]

গুলমুহম্মদ—তুমি এখানে তোমার এই ছোট ঘরে! আনন্দ উৎসবে যাবে না ?

রঘুনাথ—আনন্দ উৎসব না শ্রাদ্ধ উৎসব ?

গুলমহম্মদ—গিয়ে দেখ রাওসাহেব মাথায় হীরে দেওয়া পাগড়ী পরেছেন। হেসে হেসে সকলকে বলছেন, আমি পেশবা। আমি গোয়ালিয়রকে হিন্দুরাজ্য ঘোষণা করলাম। তাঁতিয়া টোপী মহামূল্য মুক্তার মালা পরে সেনাপতি হয়েছেন।

রানী—গুলমুহম্মদ, ঝাঁসি থেকে কুঁচ, কুঁচ থেকে কাল্পী, এদের আমি অনেক দেখেছি। নাঃ, আর কিছু করবার নেই। মূর্খ মূর্খ! ঠিক হয়েছিল গোয়ালিয়র দখল করেই এখানকার সৈন্যদের বকেয়া মাইনে চুকিয়ে দিয়ে আমাদের সেনাদল ভারী করে অবিলম্বে দক্ষিণ ভারত জয় করে আমরা দাক্ষিণাত্যকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করব। গোয়ালিয়র দখলের পর এই ঐশ্বর্য হাতে পেয়ে এরা সব ভুলে গেল ?

রঘুনাথ—প্রত্যেক জায়গায় ইংরেজের কাছে হেরে হেরে বড্ড পরিশ্রম হয়েছে তো —তাই একটু আরাম একটু বিশ্রাম চাই!

মান্দার—এদিকে যম যে এগিয়ে আসছে সে খেয়াল আছে ?

[বাঙ্গলার নবাবের প্রবেশ]

রানী—আসুন নবাব সাহেব।

নবাব—আপনাকে বলবার আর কিছু নেই। প্রত্যেকবার আপনি উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে সাহস দিয়ে আমাদের জয়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। আর প্রত্যেকবার আমাদের অদূরদর্শিতার জন্য তা সফল হয়নি।

রানী—মনে আছে নবাব সাহেব, এই সেদিন গোয়ালিয়রের অদূরে গোপালপুরে যখন আমরা মিলিত হলাম আপনারা তখন বিভ্রান্ত।

নবাব—তখন আপনিই গোয়ালিয়র আক্রমণ করে দুর্গ দখল করবার পরামর্শ দেন।

রানী—আমার কাছে সংবাদ ছিল গোয়ালিয়রের সমস্ত সৈন্য স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছিল। সিন্ধিয়ার ইংরেজ তোষণে তারা লজ্জাবোধ করছিল। তারা ভাবছিল হিন্দুস্থান যখন স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে তখন তারা ব্রিটিশ পদাবনত থাকবে কেন? আমার কথা শুনে আপনারা গোয়ালিয়র আক্রমণ করলেন। এবং কত সহজে গোয়ালিয়র দখল করা গেল। যখন সমস্ত সৈন্য স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত, যুদ্ধের জন্য যখন তাদের রক্ত ফুটছে, তখন তাদের বসিয়ে রেখে আমোদ-প্রমোদে কাল কাটানো হচ্ছে। এখন স্বয়ং ভগবানও এদের রক্ষা করতে পারবে না।

নবাব—কাল্পীর পরাজয়ের পর মাত্র দশদিনের মধ্যে গোয়ালিয়রের দুর্গ দখল করেছিল। ভাগ্য সত্যি সুপ্রসন্ন ছিল।

রানী—অথচ এই সুপ্রসন্ন ভাগ্যকে অবহেলায় আমরা অপ্রসন্ন করে তুলছি। এর পরিণাম সহজেই অনুমান করা যায়। আমাদের মত ইংরেজরও তো গুপ্তচর আছে!

নবাব—নানা সাহেব নিজে না এসে কেন যে তাঁর এই ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে পাঠালেন!

রানী—তাঁর ওদিকে হয়তো কোনো বড় পরিকল্পনা আছে।

নবাব—রাজা ঠাকুর মর্দনসিং এবং শাহারানপুরের রাজার কোনো খবর নেই। মনে হয় যুদ্ধে তাঁরা প্রাণ দিয়েছেন।

রানী—সেটাই সম্ভব। আজ ক' মাসের যুদ্ধে এই যে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ দিল। সে কথা কি ওঁদের একবারও মনে পড়ছে না?

[হঠাৎ সমস্ত আনন্দ উৎসব থেমে যায়।]

রানী+নবাব—কি হল?

[কয়েকজন ছুটে বেরিয়ে যায়। রঘুনাথ সিং এসে বলে—]

রঘুনাথ—যা ভাবা গিয়েছিল তাই হয়েছে, ইংরেজ প্রচুর সৈন্য নিয়ে গোয়ালিয়রের দিকে আসছে।

রানী—যাক্। সর্বনাশ সম্পূর্ণ হোল।

[রাওসাহেব তাঁতিয়া টোপীর প্রবেশ]

তাঁতিয়া—[সসঙ্কোচে] রানী, সংবাদ নিশ্চয়ই পেয়েছ ?

রানী—কি সংবাদ ?

রাও সাহেব—সেই হিউরোজ তিন ভাগে সৈন্য সাজিয়ে তিন দিক থেকে গোয়ালিয়র আক্রমণ করতে আসছে।

রানী—তুমি গোয়ালিয়রের পেশবা, তোমার যা অভিরুচি করবে।

তাঁতিয়া—রানী, এই দুঃসময়ে তুমি এই ব্যবহার করলে আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবে।

রানী—আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্ন ছিল নাকি ? ছিল ?

নবাব—রাও সাহেব, গোস্তাকি মাপ করবেন। আপনারা কি মনে করে সমস্ত অভিযান বন্ধ রেখে উৎসব শুরু করলেন ?

রাওসাহেব—এটা ঠিক উৎসব না। আমরা পুণ্যাহর যজ্ঞ করছিলাম। ভাবলাম এত ঐশ্বর্য যখন হাতে এসে পড়ল—ব্রাহ্মণভোজন করালে আমাদের ভাল হবে।

রানী—তাহলে আরও কিছুদিন যাগযজ্ঞ করো, আরো ভাল হবে।

তাঁতিয়া—রানী, আমাদের আর লজ্জা দিও না। একটা কিছু উপায় বলো।

গুলমুহাম্মদ—গোপালপুরে আমাদের যে কথা হয়েছিল তাতে কি এই ঠিক হয়নি যে কোন কাজ ঠিক করার হলে সকলে মিলে করব ?

রাওসাহেব—এটা তো কাজ না, যজ্ঞ করা, ব্রাহ্মণভোজন।

রানী—তাহলে যে ক'দিন ইংরেজ না আসে আরও যজ্ঞ কর, ব্রাহ্মণভোজন করাও, আরও পুণ্য হবে।

নবাব—রাওসাহেব, গোয়ালিয়র আমরা হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে দখল করেছিলাম, অথচ আপনি—

রাওসাহেব—আমি অত্যন্ত লজ্জিত। আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।

রানী এই দশদিন সময় তোমরা যদি নষ্ট না করতে! এত বড় রাজ্য তোমাদের হাতে এল, তাঁতিয়া, তুমি তো সেনাপতি, তোমার কি কোনো পরিকল্পনা ছিল না, কিছু ভাবনা ?

তাঁতিয়া—না। ঐটেই তো আমার দোষ!

নবাব—অথচ আপনি একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, ইংরেজ আপনাকে ভয় করে।

গুলমুহাম্মদ—কুঁচ কাল্পী গোয়ালিয়র সর্বত্র সাধারণ মানুষ আমাদের যেভাবে সাহায্য করেছে, তাদের মর্যাদা আমরা কতটুকু দিলাম ?

রঘুনাথ—রাওসাহেব, কাল্পীতে আপনার সমস্ত সৈন্য নিয়ে যদি হঠাৎ চলে না যেতেন তবে হয়তো কাল্পীর ভাগ্য আজ অন্যরকম হোত।

রাওসাহেব—আমি তো বলছি আমার ভুল হয়েছিল।

রানী—তোমরা আমার সম্মানীয়। বেশী বলা আমার ঠিক নয়। কিন্তু একটা কথা, যখন তোমরা এইরকম কাজ কর তখন তোমাদের কি একবারও তাদের কথা মনে পড়ে না যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে? বন্দী হয়েছে? মনে পড়ে না সেইসব সাধারণ গ্রামবাসীর কথা যারা তোমাদের কথা শুনে, তোমরা স্বাধীনতা দেবে এই কথায় বিশ্বাস করে—রসদ লুকিয়ে রেখেছে, ইংরেজকে দেয়নি? কূপের জল বিষাক্ত করে রেখেছে যাতে পিপাসায় ইংরেজ জল না পায়—তারপর পথের ধারের গাছে ফাঁসীর দড়ি গলায় পড়েছে? কি মর্যাদা দিয়েছ তাদের বিশ্বাসের?

রাওসাহেব—তোমাকে মিনতি করছি, আর একবার সকলে মিলে ইংরেজের বিরুদ্ধে দাঁড়াই—একটা সুযোগ দাও। তুমি সর্বসেনাধ্যক্ষ হও।

রানী—কাল্পীতেও তুমি আমাকে ভার দিয়েছিলে, তারপর হঠাৎই কেড়ে নিয়ে সৈন্যাধ্যক্ষ হয়েছিলে। কি জানি, আমি স্ত্রীলোক বলে তোমার বোধহয় ভেতরে কোন বাধা আছে!

তাঁতিয়া—[পাগড়ী খুলে] এই আমাব পাগড়ী আমি তোমার সম্মুখে রাখছি। সকলের সামনে প্রতিজ্ঞা করছি, মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাব না, তুমি আমাদের নেতৃত্ব দাও।

রাওসাহেব—বল রানী, কিছু বল!

রানী—বেশ, আমি কর্তৃত্ব-ভার নিলাম।

নবাব—রানীর জয় হোক।

রানী—স্বাধীন ভারতের জয় হোক।

সকলে—স্বাধীন ভারতের জয় হোক। আমরা ভারতকে স্বাধীন করব।

[দৃশ্যান্তর। সঙ্গীত]

কাশী—দামোদর, ঘুমোতে যাচ্ছ না কেন?

দামোদর—যদি বেশী ঘুমিয়ে পড়ি আর মা যদি যুদ্ধে চলে যান!

কাশী—আমি তোমাকে ডেকে দেব।

দামোদর—আমার ঘুম পাচ্ছে না।

দামোদর—কাশীবাঈ, এই যুদ্ধ শেষ যুদ্ধ?

কাশী—হ্যাঁ বাবা।

দামোদর—এরপর মা আর যুদ্ধে যাবেন না তো?

কাশী—তা কি বলা যায়? তবে মনে হয়, এ যুদ্ধে আমরা জিতলে ইংরেজ আর যুদ্ধ করবে না, তোমার মাকে ওরা রানী করতে বাধ্য হবে।

দামোদর—আর যদি মা হেরে যায়?

কাশী—ও কথা বলতে নেই।

[শঙ্করের প্রবেশ]

শঙ্কর—এ কি শুনছি কাশীবাঈ! মা নাকি আমাকে যুদ্ধ করতে দেবে না!

তোমাকেও না—আর—

কাশী—আমাকে তো উনি অনেক সময়েই যুদ্ধ করতে দেন না দামোদরের জন্য।

[গম্ভীরের প্রবেশ]

গম্ভীর—মা আমাকেও যুদ্ধে যেতে বারণ করছে, বললে, অন্য কাজ তোমাকে দেব। কিছু বুঝতে পারছি না।

শঙ্কর—কাশীবাঈ, তুমি আমার হয়ে একটু বলো না। সবাই যুদ্ধে যাবে আর আমি মেয়েদের মত ঘরে বসে—

কাশী—চুপ কর! কথার অভ্যাসে মুখ দিয়ে কথা বেরিয়ে যায়, না? ঝাঁসির লোক হয়ে একথা বলতে লজ্জা করে না?

শঙ্কর—ভুল হয়ে গেছে। মোতিবাঈ, গঙ্গাবাঈ তো এই যুদ্ধ করতে করতেই মরল। কাল্পীতে গঙ্গাবাঈ রাস্তায় পড়ে গেল, বাঈসাহাব উঠিয়ে নিজের ঘোড়াতে নিতে গেল, গঙ্গা বলল, আমাকে নিলে তোমার ঘোড়া ভারী হবে, ইংরেজ তোমাকে বন্দী করতে চায়,ভুলে গেছ? তুমি যাও।

[রানী প্রবেশ করে। সঙ্গে মান্দার ইত্যাদি। রানীর পরনে গোয়ালিয়র সৈন্যের যুদ্ধের বেশ। সাদা চেপা পাজামা, লালকুর্তা। মাথায় সাদা পাগড়ী। গলায় মুক্তার মালা]

শঙ্কর—[রানীর পায়ের কাছে বসে] মা, আমি যুদ্ধে যাব। কুঁচে কাল্পীতে সর্বত্র আমি তোমার পাশে যুদ্ধ করেছি—আজ কেন তা থেকে আমাকে বঞ্চিত করবে!

রানী—[সস্নেহে তাকে তুলে ধরে] শঙ্কর, যুদ্ধের উত্তেজনায় প্রাণ দেয়া তো অনেক সহজ। আরও কঠিন কাজ তোমাকে দেব। কাশী, তোমরা সবাই মন দিয়ে শোন। আজকের যুদ্ধ চরম পরিণতির যুদ্ধ। এই যুদ্ধে আমার জীবিত ফেরবার আশা নেই, কারণ ইংরেজ আমাকে জীবিত ধরতে চায় আমার বিচার করে ফাঁসী দিতে। আর আমি তা কিছুতেই হতে দেব না। ইংরেজের বিচার যে প্রহসন তা তো তোমরা সকলেই জান। তাই কাশী, শঙ্কর, গম্ভীর, রামচন্দ্র, গণপত—তোমাদের অনুরোধ করছি তোমরা আমার পুত্র দামোদরের ভার নাও। আমার টাকাপয়সা গয়নার পেটি সমস্ত বুঝে নাও। কাশী, রামচন্দ্র—এতটুকু বিপদ দেখলেই তোমরা দামোদরকে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় চলে যাবে। যেমন করে হোক দামোদরকে রক্ষা করবে। আমার পুত্র শিশু হলেও ইংরাজ ওকে ছেড়ে দেবে না। কথা দাও।

সবাই—কথা দিলাম।

রানী—আঃ, বড় নিশ্চিন্ত হলাম। আনন্দ! [দামোদর কাছে আসে] সত্যি তুমি আমার আনন্দ। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমার মুখ মনে পড়ে যেত, আমি দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ করতাম—ফিরে এসে কখন তোমাকে দেখব এই কথা

ভাবতাম। যখন থেকে তুমি ঝাঁসীতে এসেছ—তারপর অনেক বড় হয়েছ। অনেক কিছু দেখেছ, তাই না? তুমি এদের কাছে থাকবে। তুমি ভাল আছ নিরাপদে আছ জানলে আমি ভাল করে যুদ্ধ করতে পারব। বল তুমি এদের কাছে ভাল করে থাকবে, এদের কথা শুনবে? বল?

দামোদর—হ্যাঁ শুনব। কিন্তু তুমি আর একবার আসবে বল?

রানী—যদি পারি আসব। কাশী যাও, দামোদরকে নিয়ে তোমরা নিজেরাও প্রস্তুত হও।

[সবাই ভেতরে যায়]

রানী—মান্দার, আজ যুদ্ধে যাবার আগে আনন্দের জন্যে আমার মন কেমন করছে যে! যুদ্ধই আমার কাছে প্রধান ছিল, আজ উদ্দেশ্যহীন সমর। জয়লাভের জন্য নয়, রাজ্যলাভের জন্য নয়, কোন ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবার জন্য নয়। কিসের জন্য এই যুদ্ধ, মান্দার?

মান্দার—আত্মহত্যা করবার জন্য বাঈসাহেব।

রানী—ঠিক। মান্দার একটা কথা দাও, যদি আমি আহত হই, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবার শক্তি না থাকে তবে, তোমার ক্ষমতা থাকলে তুমি আমাকে হত্যা করবে!

মান্দার—বাঈসাহেব!!

রানী—ইংরেজের হাতে আমার দেহ যেন না পড়ে। প্রাণ থাক আর নাই থাক।

মান্দার—আমার দেহে প্রাণ থাকলে শক্তি থাকলে ইংরেজের হাতে তোমার দেহ পড়বে না।

রানী—রঘুনাথ সিংদেরও এই নির্দেশই দিয়েছি। আজ একসঙ্গে কত কথা মনে পড়ছে, মান্দার। বিঠুর থেকে ঝাঁসীতে আসা। আমার বিয়ে। জানো, পুরোহিত বিয়ের সময় গাঁটছড়া ঢিলে করে বেঁধেছিল। আমি রাগ করে বলেছিলাম, ঢিলে করে বাঁধছ কেন? মহারাজ এই নিয়ে কতদিন আমাকে ঠাট্টা করতেন! সত্যি, বড় শক্ত গাঁট পড়েছিল। ঝাঁসী ছেড়ে কোথায় কোথায় ঘুরলাম, ঝাঁসী আমাকে ছাড়ল না। মান্দার, আঠার বছর বয়সে বিধবা হয়েছিলাম, হিন্দু বিধবার আচরণ কিছুই পালন করিনি—সে ওই ঝাঁসীরই জন্যে। ভগবান যদি থাকেন তবে নিশ্চয়ই আমাকে মাপ করবেন। যখন আমার ছেলে হল, আমার এত আনন্দ হয়েছিল মান্দার, জীবনে কখনও আর এতো আনন্দ হয়নি। ছেলের দিকে তাকিয়ে আমার সারাশরীরে শিহরণ হোত। এতো ভালবেসেছিলাম ছেলেকে! জানি না কি পাপ করেছিলাম, মাত্র তিনমাস বয়সে সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল। মহারাজ যখন দত্তক নেওয়া ঠিক করলেন, মনে হোল, আমার দামোদর বুঝি অভিমান করছে! মহারাজ বললেন, আনন্দর নাম রাখবেন দামোদর। আমি কিছু বললাম না, কিন্তু

ওকে দামোদর বলে ডাকতে পারলাম না। রক্তক দেবার দিন ওকে বলেছিলাম, "তুমি আমাকে ভালোবাসবে তো?" ও বলেছিল, "হ্যাঁ।" ছোট্ট একটা 'হ্যাঁ, তারপর বুঝেছিলাম, সত্যিই ও আমাকে ভালবাসে। তারপর মান্দার কবে যে ও আমার পুত্রের চেয়েও আমার কাছে প্রিয় হয়ে উঠলো!

মান্দার—সে তো আমরাও বুঝতে পারি বাঈসাহেব। তা নাহলে ঐরকমভাবে ঘোড়ার সঙ্গে ওকে বেঁধে নিয়ে তুমি পালাতে পারতে না। প্রাসাদে হোক গাছতলায় হোক অশ্বপৃষ্ঠে হোক, এক যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া ওকে তুমি একদণ্ড কাছছাড়া করোনি।

রানী—[ম্লান হেসে] বাবা আমাকে ছেড়ে কেন বিঠুরে থাকতে পারেননি আজ বুঝতে পারছি। মাকে তো আমার মনে পড়ে না, বাবাই আমার কাছে সব ছিলেন, ওঃ, আজ যদি একবার তাঁকে দেখতে পেতাম! [মান্দার হঠাৎ কেঁদে ওঠে] মান্দার, কাঁদছ কেন? কোন সংবাদ পেয়েছো মান্দার? বাবা নেই, না? বলো মান্দার!

মান্দার—জোকনবাগে ইংরেজরা তাঁকে আর লালাবক্সীকে ফাঁসি দিয়েছে।

রানী—কি করে জানলে? আমাকে বলনি কেন?

মান্দার—গতকাল আমি জানতে পেরেছি। তোমরা তখন সৈন্যদের কুচকাওয়াজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলে। তবে আমি তোমাকে বলতেও চাইনি—তুমিও তো মানুষ, কত আঘাত সইতে পারবে!

রানী—হ্যাঁ, আমি মানুষ বলেই তো আমার জানার দরকার। ভ্রম হোক, মায়া হোক, কল্পনা তো করতে পারবো—আজ মরে গেলে ছোট মেয়ে হয়ে বাবার কাছে চলে যাবো।

[তাঁতিয়া টোপী, বান্দার, নবাব, রাওসাহেব ইত্যাদির প্রবেশ]

রানী—সবাই প্রস্তুত?

তাঁতিয়া—হ্যাঁ রানী।

রানী—তিন দিকেই সৈন্য সাজিয়ে দিয়েছো?

তাঁতিয়া—হ্যাঁ রানী।

নবাব—তাহলে কি এবার যাত্রা শুরু করবো?

রানী—হ্যাঁ নিশ্চয়।

রাওসাহেব—রানী, মনে কোনো চিন্তা রেখো না, এবার রাওসাহেব মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে থাকবে।

তাঁতিয়া—আমারও সেই কথা।

নবাব—যাবার আগে আসুন রাওসাহেব, একবার কোলাকুলি করে নিই।

[পুরুষরা কোলাকুলি করে, রানীকে কুর্নিশ করে চলে যায়]

রানী—রঘুনাথ সিং, আমার নতুন ঘোড়া নিয়ে এসেছো?

রঘুনাথ—হ্যাঁ, ওই দেখুন আঙিনায় ঘোড়া প্রস্তুত।

রানী—আজ আমার ঘোড়া রাজরত্ন থাকলে ভাল হোত। কিন্তু ক'দিন কুচকাওয়াজে সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে! সহিসকে বলো, তাকে ভাল করে দানাপানি দেয় যেন।

[রানী যেতে গিয়ে একটু থামে]

মান্দার—আনন্দকে দেখবে রানী?

রানী—না, থাক। দেখ মান্দার, শুকতারাটা কেমন জ্বলজ্বল করে জ্বলছে!

[চলে যায়]

[ভারতীয় নাগরার সঙ্গে ইংরেজদের বিউগল্ বেজে উঠলো। অস্ত্রের ঝনঝনা, হ্রেষারব, কামানের শব্দ। ইংরেজী ও হিন্দীতে আদেশ করবার শব্দ হিউরোজকে দেখা যায়। হাতে দুরবীন, পাশে একজন ক্যাপ্টেন।]

হিউরোজ—ক্যাপ্টেন, রানীকে—সেই নীলবসনাকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না কেন?

ক্যাপ্টেন—[দুরবীন দিয়ে দেখে] নাঃ, আমিও যেন দেখতে পাচ্ছি না! যুদ্ধক্ষেত্রে আসেননি?

হিউরোজ—যদি ইতিমধ্যে মারা না গিয়ে থাকেন তবে নিশ্চয় এসেছেন। নিজের সৈন্য নিয়ে অপেক্ষা করছেন। বিদ্যুতের মত কোথাও থেকে লাফিয়ে পড়বেন।

ক্যাপ্টেন—কমাণ্ডার, ওই দিকে দেখুন। পশ্চিমে দুই যুবক বালকই বলা যায়—তরবারি নিয়ে কি অদ্ভুতভাবে যুদ্ধ করছে!

হিউরোজ—এতদিন পরে বালকেরাও যোগ দিল নাকি? ওখানে কে আছে?

ক্যাপ্টেন—লেফটেন্যাণ্ট্ রেইলী আর ক্যাপ্টেন হিনীজ আছেন।

হিউরোজ—কিন্তু যাকে খুঁজছি তাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? আশা করি জীবিত ধরবার কথাটা সকলের মনে আছে?

ক্যাপ্টেন—[উত্তেজিত ভাবে] সেই বালকের একটির বুকে গুলি লাগল। পড়ে গেছে ঘোড়া থেকে। কমাণ্ডার, অপর বালকটি আশ্চর্য কৌশলের সঙ্গে সঙ্গীর হত্যাকারীকে হত্যা করল!

হিউরোজ—সে ইংরেজ?

ক্যাপ্টেন—হ্যাঁ। বালকটির গলায় মুক্তার মালা ঝলমল করছে। এই, আমাদের অপর এক সৈন্য বালকটির মাথায় তরবারির আঘাত করল। মাথা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। বালকটি অপূর্ব কৌশলে ঘোড়া ঘুরিয়ে নালার মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। সেই ইংরেজ সৈন্য গুলি করল। জানি না বালকের গায়ে লেগেছে কিনা! কমাণ্ডার, কোন বালকের এমন রণকৌশল না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না!

হিউরোজ—কি বললে, গলায় মুক্তার মালা ?
ক্যাপ্টেন—দূরবীনে অবশ্য ভাল বোঝা যায় না, তবু আমার মনে হোল—
হিউরোজ—আর মনে হোল বালকের এমন রণকৌশল তুমি দেখনি !
ক্যাপ্টেন—হ্যাঁ, কমান্ডার।
হিউরোজ—তাহলে ওই—ওই রানী, আর আমি অন্যদিকে খুঁজে মরছি। শিগগির ওই সৈনিককে ধরে আন যে রানীকে আঘাত করেছিল।
ক্যাপ্টেন—কমান্ডার, আমি যাচ্ছি। কিন্তু তাকে পাওয়া কি সহজ হবে ?
হিউরোজ—[চীৎকার করে] তুমি যাও !

[মঞ্চ অন্ধকার। সঙ্গীতে বিষাদের সুর। গুলাম মুহম্মদ, রঘুনাথ সিং এবং আরও কয়েকজন মিলে রানীকে ধরে নিয়ে আসে। রানীর সারা গা রক্তাক্ত। গুলাম কাঁদছে শিশুর মত। অপরদিক থেকে কাশী, রামচন্দ্র, দামোদর ইত্যাদির প্রবেশ]

রানী—গুলাম, শিশুর মত কাঁদছ কেন ?
গুলাম—আমি দূরে থেকে দেখেছিলাম, কিন্তু সময়মত কাছে যেতে পারলাম না।
রঘুনাথ—কিন্তু মান্দারের বুকে গুলি লাগতেই আমার মাথায় যেন আগুন জ্বলে গেল। আমি পাগলের মত শত্রুসৈন্য ধ্বংস করতে লাগলাম। হঠাৎ ফিরে দেখি তোমার ঘোড়া তোমাকে নিয়ে নালা পেরিয়ে যাচ্ছে। একটা গুলি ছুটে এসে লাগল তোমার বাঁদিকে। তুমি ঘোড়ার ওপর পড়ে গেলে। তখন আমি—
রানী—[থেমে থেমে বলে] জানো, যে ইংরেজ সৈনিক আমাকে আঘাত করেছিল সে ভেবেছিল আমি বালক। মান্দার পড়ে গেল, বলল, বাঈসাহেব চললাম। আমার আবাল্য সহচরী, আমার সুখ-দুঃখের সাথী—আমি ওর হত্যাকারীকে হত্যা করলাম। তখন ওরা মুক্তার মালা দেখে চেঁচিয়ে উঠল—"এই ছোকরা, কোথা থেকে এই মালা পেলি ? চুরি করেছিস ?"—ও ভেবেছিল, ও আমাকে হত্যা করে এই মালাটা নেবে।
কাশী—উঃ, খুব বেশী রক্ত পড়ছে !

[রানীর দিকে এগিয়ে যায়]

রাণী—থাক, আর কিছুর দরকার নেই। আনন্দ ! [আনন্দ মা বলে কাঁদতে কাঁদতে এসে জড়িয়ে ধরে] আয় আয়, আরও কাছে আয়। বলেছিলাম যদি পারি নিশ্চয় আসবো—এসেছি ! আঃ, বড় তেষ্টা।

[কাশী জল নিয়ে আসে]

আনন্দ, আমাকে জল খাইয়ে দে। ওঃ কোমরবন্ধটা বড় চেপে ধরেছে, মান্দার। ওঃ, না কাশী—এটা একটু ঢিলে করে দাও। নাগরাটা পায়ে বড় লাগছে।

[গুলাম মুহম্মদ জুতো খুলে দেয়। কাশী কোমরবন্ধ খুলে দেয়]
আঃ, এই মালাটা গলা থেকে খুলে নাও। পথে তোমাদের লাগবে।
রঘুনাথ, গণপত—আমার দেহ যেন ইংরেজের হাতে না পড়ে। পারো তো
জ্বালিয়ে দিও।

দামোদর—মা, মা, না, না—[কাঁদতে থাকে]

রানী—কেঁদো না,আনন্দ। ওই দেখ সূর্য অস্ত যাচ্ছে। মনে পড়ে, প্রাসাদ-
শিখরে দাঁড়িয়ে আমরা কতবার সূর্যাস্ত দেখেছি! সুখে-দুঃখে আমাকে
মনে কোর—আর ভয় কখনও পেও না।

[কথা জড়িয়ে আসে]

দামোদর—মা মা, তুমি মরে যেও না। মা, মাগো—

[মঞ্চ অল্পক্ষণের জন্য অন্ধকার হয়েই আবার আলোকিত হয়ে ওঠে। সামনের
দিকে দেখা যায় গুলাম মুহম্মদ নামাজের ভঙ্গীতে বসে প্রার্থনা করছে।
রঘুনাথ, কাশী, দামোদর হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনের পর্দায়
দেখা যায় চিতার লেলিহান শিখা। দৃশ্যান্তর। মঞ্চের অন্যপাশে আলো।]

হিউরোজ—এ্যালিস, সত্যিসত্যিই এবারে বলা যায় বিদ্রোহ দমন হোল।
সত্যি বলতে কি এ্যালিস, রানীর মৃত্যুতে আমি খুশী হয়েছি।

এ্যালিস—হঠাৎ মত পরিবর্তন কেন?

হিউরোজ—ওই মহান রমণীর কমিশন বসিয়ে বিচার করে ফাঁসি হলে আমি
দুঃখিত হতাম। ওর মত বীরের শেষ সজ্জা যুদ্ধক্ষেত্রই হওয়া উচিত।

এ্যালিস—রানীর সম্পর্কে তোমার রিপোর্টে কি লিখেছ? এমনি কৌতূহলে
জিজ্ঞাসা করছি।

হিউরোজ—লিখেছি, নারী হলেও তিনি ছিলেন বিদ্রোহীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ
সামরিক নেত্রী। বিদ্রোহীদের মধ্যে একমাত্র পুরুষমানুষ।

[আলো নেভে। সামনের একটা পর্দা ওদের ঢেকে দেয়। গান ভেসে
আসে—পাথর মিট্টিসে……। দেখা যায় সেই মেয়েটি ও বুন্দেলখণ্ডী
কিষাণ বসে আছে]

কিষাণ—বাঙ্গালী বাঈ, রানীর কবরে দুটো ফুল চড়াবে না?

মেয়েটি—হ্যাঁ নিশ্চয়, মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়!

কিষাণ—ঝাঁসীতে যখন যাবে, জ্যোৎস্নারাতে কেল্লার ছাতের দিকে তাকিও,
দেখবে রানী এসে দাঁড়িয়েছেন বিষণ্ণ মুখে—ঝাঁসী দেখছেন।